ধর্ম্ম-জীবন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

১৯০০ সালে

কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে

প্রদত্ত উপদেশাবলী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক

১০৭ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা-প্রেসে,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০১।

মূল্য ৸০ আনা।

ধর্ম্ম-জীবন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক

১৯০০ সালে

কলিকাতাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে

প্রদত্ত উপদেশাবলী।

ষষ্ঠ খণ্ড।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী কর্ত্তৃক

১০৭ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫।১২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, মণিকা-প্রেসে,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ লাহা দ্বারা মুদ্রিত।

১৯০১।

মূল্য ।৹ আনা।

সূচীপত্র।

ধর্ম্ম-জীবন।

বিনয় ও শ্রদ্ধা।

বল দেখি মানুষ কখন আপনাকে একাকী বোধ করে? আমি বলি প্রথমতঃ গভীর সুখে মানুষ একাকী হয়। যে সুখটা সমুদয় চিত্তকে আপ্লুত করে, হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করে, মর্ম্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে, সে সময়ের জন্য আর সমুদয় অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষাকে তিরোহিত করে, সে সুখে মানুষকে একাকী করে; অর্থাৎ তাহার অগ্রে কে, বা পশ্চাতে কে, বা পার্শ্বে কে, তাহার পদ বা গৌরব কি, তাহার ক্ষমতা বা প্রভুত্ব কি, এ সমুদয় ভুলাইয়া দেয়; অদ্ভুত তন্ময়তার আবেশে তাহাকে আচ্ছন্ন করে; তাহার মনকে যেন গ্রাস করে, মগ্ন করে ও পরিব্যাপ্ত করে!—ইহাকেই বলে সুখের একাকিত্ব। একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। আপনাকে কল্পনার সাহায্যে পঞ্চাশ বা ষাট বৎসর পুর্ব্বে লইয়া যাও; কল্পনার বলে একখানি ছবি চিত্রিত কর; মনে কর ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পতি প্রিন্স কনসর্ট আলবার্ট বহুদিন বিদেশে ভ্রমণে যাপন করিয়া, ইংলণ্ডে স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যার সন্নিধানে ফিরিয়া আসিয়াছেন; এবং ভিক্টোরিয়া ধাবিত হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন পাশের মধ্যে পড়িয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তে কি দেখিতেছ? তখন ভিক্টোরিয়া একাকী কি না? অর্থাৎ তখন কি তাঁর ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডের প্রজা, রাজমুকুট বা রাজগৌরব, কিছু মনে আসে? সেই গভীর প্রেমের উদ্বেলিত মুহূর্ত্তে, সেই পতিপত্নীর সম্মিলন-ক্ষেত্রে, এলবার্ট ও ভিক্টোরিয়া অথবা ঐ অরণ্যবাসী সাঁওতাল ও তাহার পত্নীতে প্রভেদ কি? কেবল যে সম্মিলনের ব্যাপারটাতে প্রভেদ নাই, তাহা নহে। ভিক্টোরিয়ার হৃদয়-নিহিত ভাবেও প্রভেদ নাই, প্রভেদ থাকিলে হৃদয়ে প্রেম নাই, এবং পতি-সমাগমে মনে আনন্দ নাই। কেহ হয় ত বলিতে পারেন, ভিক্টোরিয়ার ঐ আনন্দের মধ্যে একাকিত্ব কৈ? এখানেও ত দুই জন, আর একজনের সত্তা-

তেইজন্ত এই আনন্দ। নিগূঢ় ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, দ্বিত্ব-জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আনন্দের প্রকৃত সান্দ্রতা হয় না। ঐ একজন আর এই আমি একজন, এরূপ উৎকট দ্বিত্বজ্ঞান ঘনীভূত প্রেমের বিরোধী। প্রেমের স্বধর্ম্ম একীভূত করা; এক অপরে মিশিলে, পশিলে, ডুবিলে ও তাহার সহিত একীভূত হইলেই, সান্দ্রানন্দ উথলিত হয়। ঐ সান্দ্রানন্দের মুহূর্ত্তে রাজ্যেশ্বরী রাণী, শ্রীসম্পদ্, রাজগৌরব, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রভুত্ব সমুদয় ভুলিয়া, একাকিনী। সে সমুদয় একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির অঙ্গের বস্ত্রের ন্যায় খসিয়া পড়ে, তিনি জানিতেও পারেন না। রাজ্যেশ্বরীর দৃষ্টান্ত এই জন্য দিলাম যে সান্দ্রানন্দের একাকিত্ব ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

যেমন হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলনের সুখে মানবাত্মা সকল ভুলিয়া যায়, তেমনি জ্ঞানিগণ গভীর জ্ঞানালোচনাতে যখন তন্মনস্ক হন এবং তজ্জনিত সুখে তাঁহাদের চিত্তকে আপ্লুত করে, তখনও তাঁহারা একাকী হন। বাহ্যজগতের শ্রী-সম্পদ্ পদগৌরব ভুলিয়া যান। এক পুরাতন দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রাচীন ইতিহাসে এরূপ কথিত আছে যে রোমানগণ একবার সিসিলি দ্বীপস্থ সাইরেকিউজ নগর আক্রমণ করে। তখন সে নগরে আর্কিমিডিস নামে এক মহাজ্ঞানী বাস করিতেন। সে সময়ে তিনি বিজ্ঞান-কৌশলের দ্বারা নগর রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। রোমীয় সেনাপতি বলিয়া দিয়াছিলেন, নগর-বাসীদিগের মধ্যে যে বশ্যতা স্বীকার না করিবে তাহাকেই হত্যা করিবে, কেবল আর্কিমিডিসকে হত্যা করিবে না। এই জন্য রোমীয় সৈন্যগণ অগ্রে প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পরে তাহাকে হত্যা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা আর্কিমিডিসের নিকট উপস্থিত। তিনি তখন অঙ্ক শাস্ত্রের একটি কঠিন সমস্যা লইয়া ব্যস্ত আছেন; নানা প্রকার অঙ্কপাত করিয়া একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছেন। শত সহস্র ব্যক্তির প্রাণ যাইতেছে; নগর রক্তস্রোতে ভাসিতেছে; চারিদিকে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে; সংগ্রামের ধ্বনিতে গগন ফাটিতেছে; সে সব দিকে তাঁহার চিত্ত নাই; তাঁহার চিত্ত ঐ সমস্যার আনন্দে নিমগ্ন। রোমীয় সৈনিক আসিয়া নিষ্কোষিত অসি তাঁহার উপরে ধারণ পূর্ব্বক কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কে? তুমি কে? তোমার নাম কি?" আর্কিমিডিস বিরক্তি-সূচকস্বরে বলিলেন, "স্থির হও, আর একটু বাকি আছে।" এই উত্তর শুনিয়াই

অজ্ঞ সৈনিক তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিল। দেখ জ্ঞানানন্দের কেমন একাকিত্ব বিধানের শক্তি।

কেবল যে গভীর সুখেই মানুষকে একাকী করে তাহা নহে, গভীর দুঃখেও একাকী করে। কিছুদিন হইল আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছি যে, রুসিয়ার সম্রাটের বংশধর ও সমগ্র সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজকুমার হঠাৎ গতাসু হইয়াছেন। ইহার পরেই শুনিলাম সম্রাট সাম্রাজ্যভার হস্তান্তরে ন্যস্ত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইতে চাহিতেছেন। ইহার ভিতরের কথা কি আমরা বুঝিতে পারি না? গভীর শোকের মুহূর্ত্তে মানুষের সম্পদ ঐশ্বর্য্য, পদ-গৌরব এ সকল কি মনে থাকে? পুত্রবিয়োগে গরীবের মা ধুলায় পড়িয়া কাঁদে, রুসিয়া সাম্রাজ্যেশ্বরী কি তেমনি কাঁদে না? গভীর শোকে মানুষকে একাকী করিয়া দেয়; বিষয় বিভব ভুলাইয়া দেয়; গর্ব্বিত মস্তককে ধুলায় ধূসর করিয়া দেয়।

গভীর শোকের ন্যায় অপরাপর মানসিক ক্লেশেরও একাকী করিবার শক্তি আছে; কেবল তাহাও নহে; শারীরিক ব্যাধিতেও মানুষকে অনেক সময়ে একাকী করিয়া থাকে। যিনি দারুণ শূল বেদনাতে ছট ফট করিতেছেন, তিনি দরিদ্রের জীর্ণ কন্থাতে না শুইয়া, দুগ্ধফেননিভ শয্যাতে শুইয়া আছেন, ইহাতে তাঁহার কি পরিতোষ? তিনি কি সেই ছটফটানির মুহূর্ত্তে আপনার শ্রীসম্পদ ভুলিয়া যান না? আপনাকে কি একাকী ও অসহায় মনে করেন না? বরং এ কথা কি সত্য নয় যে, সেই মুহূর্ত্তে যদি তাঁহার শ্রীসম্পদের কথা দৈবাৎ স্মরণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত বিরক্ত ও উত্যক্ত হইয়া বলে,—"দূর হোক্ বিষয় বিভব, ও ছাই থাকিয়া আমার কি? এখন যে প্রাণ যায়।"

শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশের ন্যায় পাপবোধ ও আধ্যাত্মিক অভাববোধেও আত্মাকে একাকী করিয়া দেয়। মানুষ আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি সামর্থ্য সমুদয় ভুলিয়া যায়। বরং যদি এ সকল স্মরণ হয়, তাহা হইলে মন অবজ্ঞার সহিত এ সকলকে উপেক্ষা করিতে থাকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার-ত্যাগে উন্মুখ হইয়া স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদি তুমি ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা কর, আমাকে বল আমি তাহা তোমাকে দিব; তখন মৈত্রেয়ী উত্তর করিলেন,—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।

যদ্দ্বারা আমি পরিত্রাণ লাভ করিতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ধন সম্পদকে তিনি উপেক্ষা করিলেন। ভগবদ্গীতাতে দেখি, অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিতে দাঁড়াইয়া যখন পাপ-ভয়ে ভীত হইলেন, তখন কৃষ্ণকে বলিলেন,—

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥

হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে স্বজনকে হত্যা করিয়া কল্যাণ দেখিতেছি না, আমি জয় চাই না, আমি রাজসম্পদ ও তৎসংক্রান্ত সমুদয় সুখের প্রত্যাশা রাখি না।

আত্মার সদ্গতির সহিত তুলনায়, জয়শ্রী, বা রাজ্যসম্পদ্ তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইল।

আমরা কি নিজ নিজ অন্তরে অনেকবার অনুভব করি নাই, যে যখনি আমাদের চিত্ত স্বকৃত কোনও দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে, তখন আমরা ঘোর একাকী হইয়া পড়ি; বহু জনাকীর্ণ নগর বিজন অরণ্য সমান মনে হয়; বোধ হয় যেন ঘোরারণ্য মধ্যে একাকী কাঁদিতেছি, কেহ কোথাও নাই। বরং ইহা কি তখন প্রত্যক্ষ করি নাই যে, নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা যত অধিক, এবং যে অপরাধটী হইয়াছে সেটী যত ক্ষুদ্র, যাতনাটা তত অধিক হয়। মন অধীর হইয়া বলিতে থাকে, হায়, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা থাকিয়া কি হইল? আমি ত এই একটি ক্ষুদ্র প্রলোভনকেও অতিক্রম করিতে পারিলাম না।

কেবল যে স্বকৃত দুষ্কৃতির চিন্তাতেই মানুষকে ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা নহে, নিজের সম্মুখস্থ আদর্শের সহিত আপনাকে তুলনা করিয়া যে হীনতা অনুভব করিতে থাকে, তাহাতেও আত্মাকে একাকী করে। বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, সমুদয় ভুলাইয়া দেয়। যদি বা ঐ সকল স্মরণ হয়, মন বলিতে থাকে— "আমার বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতার মুখে ছাই, আমি কি মানুষ!"

এই যে আত্মার নিজের হীনতা-বোধের মুহূর্ত্তের একাকিত্ব, এই যে আপনাকে দুর্ব্বল জানিয়া তাহার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়া, ইহাকে বলে দীনতা বা বিনয়। দীনাত্মাতে এক প্রকার শৈশব-সুলভ সরলতা আছে, যাহা অতীব স্পৃহণীয়।

জ্ঞানাভিমান বা বিদ্যাভিমান বা বুদ্ধির অভিমান সেখানে নাই। সে চিত্ত আপনাকে আপনি হীন জানিয়া সর্ব্বদাই নত। প্রকৃত দীনতার দৃষ্টান্ত সকল ভক্তসম্প্রদায়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ। রূপ সনাতন দুই ভাই, উচ্চ রাজকীয় পদ ত্যাগ করিয়া দীনের দীন হইয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস ধনীর সন্তান, রাজবিভব পায়ে ঠেলিয়া, কুকুরের ন্যায় পাত কুড়াইয়া খাইতে লজ্জা বোধ করিতেন না।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে সেণ্টপলের দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। পল নিজের বিদ্যা ও সম্ভ্রমে স্বীয় সম্প্রদায় মধ্যে এরূপ উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি তরুণবয়স্ক তখন সমাজপতিগণ তাঁহাকে সমুদয় খ্রীষ্টীয় নরনারীকে ধৃত করিবার অধিকার পত্র দিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলে য়িহুদী শাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া জানিতেন। কেবল য়িহুদী শাস্ত্রে নহে, তিনি তৎকাল প্রচলিত গ্রীক বিদ্যাতে এরূপ অগ্রসর ছিলেন যে, যে রোমান রাজপুরুষগণ য়িহুদীদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ফেষ্টস্ (Festus) বিচারালয়ের মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার অতিরিক্ত বিদ্যা থাকাতে তুমি পাগল হইয়াছ।" ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে। যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতাতে এত অগ্রগণ্য ছিলেন, সেই পলকে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি এই সকলকে অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—আমি যদি পাপী নই, তবে পাপী কে? "হায় রে! হতভাগ্য আমি! কে আমাকে এই পাপময় মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে।" এত যাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, যোগ্যতা, মানুষ তাঁহাকে শৃগাল কুকুরের ন্যায় সহর হইতে সহরে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, চোর ডাকাতের ন্যায় হাতে দড়ি দিয়াছে, নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিয়াছে, তিনি অম্লানচিত্তে সকলই সহিয়াছেন। এই খানেই সেণ্টপল, এইখানেই বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্মদাতা, এইখানেই এই লোকটীর মহত্ত্ব। এই জন্যই পলকে ভালবাসি, তাঁহার কথা যখন শুনি, তখন মনে হয়, উত্থান পতনে আন্দোলিত একটা হৃদয় তদ্রূপ আর এক হৃদয়ের সহিত কথা কহিতেছে।

যে আধ্যাত্মিক অবস্থার এক পৃষ্ঠের নাম দীনতা বা বিনয় তাহার অপর পৃষ্ঠের নাম শ্রদ্ধা। পতি পত্নীর মধ্যে যে সম্বন্ধ, বিনয় শ্রদ্ধার মধ্যে সেই সম্বন্ধ।

যেখানে বিনয় সেইখানেই শ্রদ্ধা। তোমার ঘাড়টা যদি বুদ্ধির অভিমানে বা বিদ্যার অভিমানে বা ধর্ম্মের অভিমানে উঁচু হইয়াই রহিল, তবে আর আমার কথা শুনিবে কি? জগতে কি ভাল লোক নাই, ভাল কথা নাই? ঢের আছে, কিন্তু কার জন্য আছে? বিনয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যই আছে।

বিনয় শ্রদ্ধাতে মানব-চরিত্রে দুইটী গুণ প্রধানরূপে পোষণ করে। প্রথম গুণ উন্মুখতা অর্থাৎ ইহাতে মানবচিত্তকে উপদেশ পাইবার জন্য, সাধুতাকে আদর করিবার জন্য, সাধু দৃষ্টান্তের দ্বারা উপকৃত হইবার জন্য উন্মুখ করে। তাড়িতের যেমন সঞ্চালক আছে, এই উন্মুখভাবও তেমনি সাধুতার সঞ্চালক। ইহাকে অবলম্বন করিয়া এক হৃদয়ের সাধুতা অপর হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। বিনয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির উপদেশ ও উপদেষ্টার অভাব কখনই হয় না। স্পঞ্জ যেমন চারিদিকের জল শুষিয়া লয়, তেমনি তাঁহার মন চারিদিক হইতে উপদেশ শুষিয়া লইতে থাকে। প্রত্যেক দিন প্রাতে সংবাদ পত্র তাঁহার জন্য উপদেশ সকল বহন করিয়া আনে। ধর্ম্মগ্রন্থ ও সাধু চরিত্রের ত কথাই নাই, সংবাদ-পত্রের কয়েকটী পংক্তিতে কোনও সাধুজনের উক্তি বা কোনও সদনুষ্ঠানের বিবরণ পাঠ করিয়া, তাঁহার চিত্ত আনন্দ-রসে প্লাবিত হয়, মন উন্নত হয়, এবং সাধুতার আকাঙ্ক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এমন কি অসাধু ব্যক্তিদিগের অসাধুতাও তাঁহার সাধুতা-প্রবৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে। এই সকল পথ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত গুণসম্পন্ন হইতে হইবে, অসাধুতা হইতে তিনি এই উপদেশই প্রাপ্ত হন। এরূপ ব্যক্তির নিকট কোনও ভাল কথা ছোট কথা নহে, কোনও উৎকৃষ্ট বিষয় লঘুভাবে উড়াইবার জিনিষ নহে।

উন্মুখ-ভাবহীন ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার গর্ব্বিত চিত্ত কোনও স্থানে উপদেশ পাইবার মত কিছু দেখে না। সাধুচরিত্রের কীর্ত্তন করিয়া সকলে আহা আহা করে, তাহার মন গোপনে গোপনে বলে "কৈ আমি ত এমন কিছু দেখি না যাহাতে এতটা আহা আহা করা যায়।" সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করিয়া লোকে গদগদ হয়, তাহার পড়িতে বা শুনিতে ধৈর্য্য থাকে না। সে উপাসনা মন্দিরে যায়, অন্যে উপকৃত হয়, তাহার মন বলে "ও ত পুরাতন কথা, ঢের শুনেছি।" এইরূপে বিনয় শ্রদ্ধার অভাবে সর্ব্বত্রই সে বঞ্চিত হয়। অপরাপর ব্যাধি অপেক্ষা এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই আপনাদিগকে

নীরোগ মনে করে এবং যদি কেহ তাহাদিগের ব্যাধি দেখাইয়া দিতে চায়, তবে তাহা সহ্য করিতে পারে না।

বিনয় শ্রদ্ধা যেমন উন্মুখ ভাব আনিয়া দেয়, তেমনি মানব-চরিত্রে আর একটি গুণকে উদিত করে। তাহা ষট্‌পদবৃত্তি। ষট্‌পদবৃত্তি কাহাকে বলে তাহা একটু ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক। ভাগবতে একস্থানে আছে :—

"অণুভ্যশ্চ মহদ্‌ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
অসারাৎ সারমাদত্তে পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ।"

ষটপদ বা ভ্রমর যেমন পুষ্পের অসার ভাগ পরিহার করিয়া সারভাগ যে মধু তাহাকেই গ্রহণ করে, তেমনি ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল শাস্ত্রের অসার ভাগ হইতে সারকেই সংকলন করেন।"

হংস নীরকে ফেলিয়া ক্ষীরকেই গ্রহণ করে, ভ্রমর বিষকে বর্জ্জন করিয়া অমৃতকেই আহরণ করে। ইহার ঠিক বিপরীত বৃত্তি আছে, তাহা মক্ষিকা-বৃত্তি। তোমার সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোথায় ক্ষত স্থানটী আছে, মক্ষিকা তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবে ও তাহাতেই বসিবে। মানব-সংসারেও দুই চরিত্রের লোক দেখি, কেহ বা মক্ষিকার ন্যায়, কেবল ক্ষতই অন্বেষণ করে, অপরের গুণভাগ ভুলিয়া দোষভাগ দেখিতে ও কীর্ত্তন করিতে সুখ পায়, সর্ব্বদা পর দোষের চর্চ্চাতেই থাকে। আর কেহ বা ষটপদের ন্যায় দোষকে ভুলিয়া গুণই দেখে, অপরের গুণের চিন্তাতে সুখী হয়, অপরের গুণের আলোচনাই ভাল বাসে এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হয়। যদি আমাকে কেহ দুই কথায় সাধুর লক্ষণ দিতে বলেন, তবে আমি বলি যিনি মানুষের দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক দেখিতে পান, তিনিই সাধু। যে সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজন জগতে বিশেষভাবে সাধুনামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁহাদের বিশেষত্ব এই, যেখানে অপরে শুষ্ক বালুকাময় মরু দেখিয়াছে, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, তাহার মধ্যে সুশীতল বারির উৎস লুকাইয়া আছে; যেখানে অন্যে পাপের দুর্গন্ধময় পঙ্কিল হ্রদ দেখিয়াছে, তাঁহারা সেখানে দেখিয়াছেন নবজীবনের আশা। মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অসীম আশাশীলতা ছিল; এই জন্যই তাঁহারা মানব প্রকৃতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এমন কি মানুষ নিজে আপনাতে যে জিনিসটুকু দেখিতে পায় নাই, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন

ও সেইটুকুকেই সমুচিত শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে উঁচু করিয়া তুলিয়াছেন। একজন কুলটা নারী যীশুর চরণ প্রক্ষালন করিতে আসিলে, তাঁহার শিষ্যেরা বাধা দিল, যীশু বলিলেন, "আহা, বাধা দিও না, উহার প্রেম ও ব্যাকুলতাই উহাকে উদ্ধার করিবে"; সে নারী ভাবিল "তবে ত আমারও উদ্ধার আছে" অমনি তাহার মনে আশা জাগিল, সেই সঙ্গে নবজীবনও জাগিল। এই গুণগ্রাহিতাই সাধুদিগের প্রধান লক্ষণ। মানুষ ষট্পদবৃত্তিসম্পন্ন হইবে কি মক্ষিকাবৃত্তিসম্পন্ন হইবে, তাহার অনেকটা অভ্যাসের উপরে নির্ভর করে। যদি মানুষ এমন স্থানে বা এমন সঙ্গে বাস করে, যেখানে পরের দোষের সমালোচনাই অধিক হয়, তবে তাহার অন্তরের বিনয় শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া যায়। যে গৃহের অভিভাবকগণ অসাবধানতা বশতঃ বালক বালিকাদিগের সমক্ষে তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র ব্যক্তিদিগের দোষের সমালোচনা করেন, ও সর্ব্বদা পরচর্চ্চাতে প্রবৃত্ত থাকেন, সে গৃহের বালক বালিকারা বিনয়-শ্রদ্ধাহীন, পরছিদ্রান্বেষী ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠে।

বিনয় শ্রদ্ধাহীন চরিত্রে গভীরতা থাকে না, বিনয়-শ্রদ্ধাহীন হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জন্মে না। এই জন্য সকল দেশের ঈশ্বর-প্রেমিকগণ বার বার বলিয়াছেন, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের দ্বারে দীনতা। যে প্রাণের ব্যাকুলতাতে আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, পদ, গৌরব, ক্ষমতা, যোগ্যতা সমুদয়কে তুচ্ছ মনে করে না, ধর্ম্মরাজ্য তাহার জন্য নহে। সদুপদেশ, সাধুচরিত্র, সৎপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গ কিছুই তাহার হৃদয়ে কাজ করে না। আমরা একবার স্বীয় স্বীয় হৃদয় পরীক্ষা করি। আমাদের অন্তরে কি প্রকৃত ব্যাকুলতা আছে? তাহা হইলে দীনতাও থাকিত, তাহা হইলে পরচর্চ্চা অপেক্ষা আত্মপরীক্ষাতে অধিক সময় দিতাম, এবং ভগবৎকৃপার প্রার্থী হইয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বদা পড়িয়া থাকিতাম।

আশা আনন্দ ও বল।

সময়ে সময়ে একটা কথা বড়ই মনে হয়। সে কথাটা এই—মনে কর, একজন একটী উদ্যান করিয়াছেন, নানা দেশ হইতে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফলের গাছ আনিয়া তাহাতে রোপণ করিয়াছেন; কিন্তু বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, একটী ফলের মুখ দেখিতে পাইতেছেন না। মাটীতে কিরূপ দোষ আছে, অথবা বৃক্ষের মূলে কিরূপ কীট লাগে, যে জন্য বৃক্ষগুলি ভাল করিয়া বাড়ে না; এবং যদিও বা প্রাণে প্রাণে বাঁচিয়া থাকে, তাহাতে ফল ধরে না। ইহা দেখিলে সকলে কি বলেন? সকলেই কি বলেন না, মাটী খুঁড়িয়া দেখ, মূলে কি দোষ আছে, নূতন মাটী লাগাও, ভাল করিয়া সার দেও, যে বৃক্ষে কিছু হইবে না, যাহাতে সাংঘাতিক রোগ লাগিয়াছে, তাহাকে উৎপাটন করিয়া ফেল, নূতন বৃক্ষ বসাও, তবে উদ্যান ভাল হইবে। সেইরূপ যদি দেখিতে পাই, একটী ধর্ম্মসমাজ রহিয়াছে, নরনারী নিয়মিতরূপে উপাসনাতে আসিতেছে, যাইতেছে, বাহিরে দেখিতে সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে, অথচ জীবনে কোনও পরিবর্ত্তন নাই, চরিত্রে কোনও সুফল দেখা যাইতেছে না, তাহারা সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা হইতে জীবনের সংগ্রাম মধ্যে যে কোনও সহায়তা পাইতেছে এরূপ মনে হয় না; বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, তাহাদের কোনও মানুষ যে গড়িয়া উঠিতেছে, ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা লাভ করিতেছে, বিশ্বাস, বৈরাগ্য, সেবাতে অগ্রসর হইতেছে, সাধুতার গুণে মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে, এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে সকলে কি বলিবেন? সকলেই কি বলিবেন না যে, সে সমাজের লোকেরা সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে না। অথবা মাটীর মধ্যে কোনও দোষ আছে, জীবন-তরুর মূলে নিশ্চয় কোনও কীট লাগিয়াছে, যাহাতে সুফল ফলিতেছে না। বাগানের বৃক্ষটী যে বাড়িতেছে না বা যথাসময়ে ফল দিতেছে না, তাহা জল বায়ুর দোষে নয়, আলোক ও উত্তাপের অভাবজাত নয়, জল বায়ু আলোক উত্তাপ ত রহিয়াছে, যাহার গুণে অপর উদ্যানের বৃক্ষ সকল বাড়িতেছে, তবে

তাহা ঐ মূলস্থিত কীটের দোষ। জীবন-তরুর মূলে সে কীট কি? তাহা সকলে চিন্তা করুন, বিশেষতঃ সাধুভক্তিহীন সমালোচনাপ্রিয় ব্যক্তিগণ চিন্তা করুন।

এখানে কি এমন কেহ নাই, যিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, সত্যস্বরূপের অর্চ্চনা করিয়া, ঈশ্বরের সন্নিধানে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তিনি কিছু পাইয়াছেন; আপনার জীবনে কিছু সুফল দেখিয়াছেন? আমি ত সে সাক্ষ্য দিতে পারি। আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আমি নিরাশ, বিষাদপূর্ণ ও দুর্ব্বল-হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; তিনি আশা, আনন্দ ও বল বিধান করিয়াছেন।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনটী শব্দের প্রতি প্রণিধান কর। আরও কিছু ভাঙ্গিয়া বলিতেছি। আমি প্রার্থনার দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াই আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়াছি। আমি যে অবস্থাতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, সে অবস্থার বিষয়ে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তখন আমার মন গভীর নিরাশা, ঘনবিষাদ ও শোচনীয় দুর্ব্বলতাতে পূর্ণ ছিল। এ জীবনে কখনও যে ঈশ্বরের সত্তাতে সন্দিহান হইয়াছি এরূপ স্মরণ হয় না; কিন্তু তিনি যে মানবাত্মার সঙ্গী ও সহায়, ইহা পূর্ব্বে অনুভব করিতাম না। সে জন্য নিজ দুর্ব্বলতার দ্বারা অভিভূত হইতাম। তখন মনে করিতাম, আমার পরিত্রাতা কেহ কোথাও নাই; এবং বোধ হয় মনে মনে একটু অহমিকাও ছিল যে, আমার পরিত্রাতা আমি স্বয়ং। অপরে যাহা করিয়াছে তাহা কেন আমি পারিব না, আমি স্বীয় বলেই উঠিব, স্বীয় শক্তিতেই দাঁড়াইব, স্বীয় চেষ্টাতেই সাধুতার শ্রেষ্ঠপদবী লাভ করিব। কিন্তু বিধাতার মঙ্গলবিধানে এমন দিন আসিল যখন আমার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা ও আমার প্রবৃত্তিকুল সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। বুঝিলাম আপনি আপনার রক্ষক ও উদ্ধারকর্ত্তা নই। আর একজন আছেন, যাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে হইবে। তখন ঘোর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে প্রার্থনাপরায়ণ হইলাম। বলিলাম এত দিন ত বুঝি নাই যে তোমার করুণা চাহিতে হইবে; তোমার উপরে নির্ভর করিতে হইবে; এখন তাহা বুঝিয়াছি, এখন তুমি আমাকে তোলো, নতুবা আমি ডুবিতেছি। আমার সে প্রার্থনা

কি বিফলে গেল ? আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—না। দেখিলাম যেখানে ছিল নিরাশা, সেখানে আসিল আশা; যেখানে ছিল বিষাদ, সেখানে আসিল আনন্দ; যেখানে ছিল দুর্ব্বলতা, সেখানে আসিল বল। যেমন কোকিলের ডাক শুনিলে ও সুমন্দ মলয়ানিলের আলিঙ্গন পাইলে সকলে মনে করে, এইবার আমের মুকুল ফুটিবে, তেমনি আমি এমন কিছু শুনিলাম, এমন কিছু সংস্পর্শ পাইলাম, যাহাতে মনে হইল, এইবার এ পাপী বাঁচিবে। তাঁহার করুণার বাতাস গায়ে লাগিয়া বহুদিনের বিষাদ চলিয়া গেল; আশার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার নিরাপদ ভাব মনে আসিল। ঝড়ে পড়িয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পাখী কুলায়ে পৌঁছিলে যেমন ভাবে, আমি বাঁচিলাম, আন্দোলিত সাগর-তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে আরোহিগণ যেমন অনুভব করে যে আর বিপদ নাই, তেমনি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া মনে হইল জীবনের বন্দরে পৌঁছিয়াছি। কেবল যে আনন্দ হইল, তাহা নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নব বলও পাইলাম। যে ব্যক্তি স্রোতোমুখে দণ্ডায়মান তৃণের ন্যায় লোকভয়ে কাঁপিতেছিল, সেই সিংহের ন্যায় বিক্রমে সত্যপথে দণ্ডায়মান হইল।

এ সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নয়, যে এই নবজীবন লাভ করিবার পর আমার পক্ষে পরীক্ষা বা প্রলোভন আসে নাই, অথবা আর আমার পদস্খলন হয় নাই, বা আমাকে অনুতপ্তচিত্তে ঈশ্বরচরণে কাঁদিতে হয় নাই, বরং এ কথা বলিতে পারি, আমাকে নিজ প্রবৃত্তিকুলের সহিত যেরূপ সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে এবং সে সংগ্রামে কখন কখনও পরাজিত হইয়াছি ও সে জন্য অশ্রুজল ফেলিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রার্থনাতে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, সে বিশ্বাস একদিনের জন্যও হারাই নাই, এবং যে দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার চরণ ধরিয়াছিলাম, সে মুষ্টি এক দিনের জন্যও শিথিল করি নাই।

আশা, আনন্দ ও বল —সকলে হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ তিনটী হৃদয়ে জাগিতেছে কি না ? বিশেষতঃ মহোৎসবের মহামেলার পর জাগিতেছে কি না ? ইহার ভিতরে একটু নিগূঢ় কথা আছে। সেটী এই,—যেমন আমাদের প্রত্যেকের দৈহিক জীবন অনন্ত গগনব্যাপী বায়ু মণ্ডলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বিধৃত, সেই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা পরিপুষ্ট, তেমনি আমাদের

প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক জীবন এক পূর্ণ সত্তার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা দ্বারাই বিধৃত, তাঁহার শক্তির দ্বারাই পরিপুষ্ট। তিনি আমাদিগের আত্মার সহিত মিশিয়া রহিয়াছেন, একীভূত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং ধর্ম্মজীবন আর কিছুই নহে, আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাবের প্রকাশ মাত্র, তাঁহার শক্তির বহিরাবির্ভাব মাত্র। তবে আর ধর্ম্মজীবনের জন্য ভাবনা কি, তুমি আপনাকে তাঁহার সঙ্গে একীভূত কর,—সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ কর,—তিনি তোমাকে তুলিবেন, গড়িবেন, কাজে লাগাইবেন।

ধর্ম্মজীবনের যে আশা, তাহা এই জন্য যে, তিনি ধর্ম্মাবহ, ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য; ধর্ম্মজীবনের যে আনন্দ তাহা এই জন্য যে, যে জীবন অনন্ত শক্তির ক্রোড়ে শায়িত, তাহার জন্য ভাবনা কি? এই ভাবেই ঋষিরা বলিয়াছেন,—

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই অনন্ত সত্তার আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না।

ধর্ম্মজীবনের শক্তির কারণ এই যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক বল তোমার নহে, তাহা সেই পরম পুরুষের সহিত যোগ হইতে উৎপন্ন; তুমি তাঁহার প্রকাশের যন্ত্র মাত্র। ঐ যে সূক্ষ্ম লোহার তারটি দেখিতেছ, যাহা একজন বলবান পুরুষে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাহাকে থর থর কাঁপাইতেছে, অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, ওশক্তি ওতারের নয়, ওশক্তি তাড়িতের; ব্যাটারিটীর সহিত যোগ না থাকিলে ও তারটীতে কোনও শক্তিই দেখিতে না; তেমনি আমাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতেছ, তোমাতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি জাগিতেছে, তাহা আমার নহে, তোমারও নহে, তাহা সেই শক্তির পারাবার হইতে আসিতেছে। জড়জগতে যে শক্তির অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিতেছ, যে শক্তি অশনির আঘাতে গিরিশৃঙ্গ বিদারণ করিতেছে, যে শক্তি ঘনকষাঘাতে সাগরতরঙ্গে নৃত্য তুলিয়া অট্ট হাস্য হাসিতেছে, যে শক্তি মেদিনীর কুক্ষিতে থাকিয়া তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপাইতেছে, যে শক্তি দাবানলে প্রজ্বলিত জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে, সে শক্তি কি কেবল জড়েই আবদ্ধ? ইহা স্থূলদর্শী লোকের কথা, জড়বাদীর মহা ভ্রম। ভক্তিভাজন ঋষিগণ আমাদিগকে শিখাইয়াছেন,—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ।

যে তেজোময় অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্যামি পুরুষ আকাশে, সেই তেজোময় অমৃতময়, সর্ব্বান্তর্যামি পুরুষ আত্মাতে।

যিনি জড়ে তিনিই চেতনে। জড় যদি যন্ত্ররূপে তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করে তবে চেতন আত্মা কি তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করিতে পারে না? বিশ্বাস কর ধর্ম্মজীবনের যা কিছু শক্তি তাঁহারই শক্তি; তুমি যন্ত্র মাত্র। তুমি কেবল এই দেখ যাহাতে তাঁর সঙ্গে যোগটা বিচ্ছিন্ন না হয়।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে যোগটা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়, ইহা বলিলে চলিবে না, তাঁহার সঙ্গে যোগ কাহাকে বলে এবং কিরূপেই বা তাহা বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাও বলিয়া দিতে হইবে। এ বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি, যে ব্যক্তি আপনার কিছু না দেখিয়া, আপনার কিছু না রাখিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে ধর্ম্মকেই অন্বেষণ করিতেছে, এবং ঈশ্বরে অকপট প্রীতি স্থাপন করিয়াছে, সেই তাঁহার সহিত যুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে সর্ব্বান্তঃকরণে অন্বেষণ না করিয়া, আপনার কিছু দেখিতেছে বা রাখিতেছে সেই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে।

ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সে মানুষের আর ভ্রমপ্রমাদ হইবে না, বা তাহার পদস্খলন হইবে না; বা সে স্বীয় প্রকৃতির সমুদয় দুর্ব্বলতাকে একেবারে অতিক্রম করিবে। কিন্তু তাহার অর্থ এই যে, সেরূপ আত্মা সর্ব্বোপরি তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তিনিই তাহার গতিকে চরমে ফিরাইয়া লইবেন।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনটীরই গতি গড়িবার দিকে। যার আশা আছে তার বিশ্বাস আছে, যার আনন্দ আছে, তার প্রেম আছে, যার বল আছে তার বৃদ্ধি আছে। বিশ্বাস ও প্রেমে বর্দ্ধিত হওয়ার নামই ধর্ম্মজীবনের উন্নতি। সাধুদের জীবনের আর কোন্ গূঢ় কথা আছে? তাঁহারা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় ধর্ম্মকে দেখিয়াছিলেন এবং হৃদয়ের সমগ্র প্রীতি তাহাতে স্থাপন করিয়াছিলেন, এই ত ভিতরকার কথা। ঐ বিশ্বাস ঐ প্রেমই আসল, ধর্ম্মজীবনের আর সকল লক্ষণ ইহা হইতেই প্রসূত হয়। ঐ বিশ্বাস ঐ প্রেমেই আত্মাকে

স্বাধীনতা দেয়। মৎস্ত জলে গিয়া, পক্ষী আকাশে উড়িয়া যেমন ভাবে, আমি স্বাধীন, এই ত আমার স্থান, ঐ বিশ্বাস ও প্রেমের গুণেই আত্মা ঈশ্বরকে লাভ করিয়া অনুভব করে, এই ত আমার স্থান। এ অবস্থাতে ধর্ম্ম আর সাধনের বা শাসনের বিষয় থাকে না। ধর্ম্ম হয় আত্মার নিশ্বাস প্রশ্বাস, আত্মার আহার বিহার, শয়ন উপবেশন, আত্মার বলবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য। ধর্ম্মকে এই ভাবে পাওয়াই আসল পাওয়া, আর যত পাওয়া, তার নকল মাত্র।

উপসংহারে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, যদি দেখা যায় বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, একটী বিশেষ বাগানের গাছে ফল ফলিতেছে না, তাহা হইলে কি ভাবিতে হইবে? ভাবিতে হইবে যে মূলে কীট লাগিয়াছে। তেমনি যদি দেখা যায় যে, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, এক ব্যক্তি ধর্ম্মসমাজে বাস করিতেছে, উপাসনা মন্দিরে যাতায়াত করিতেছে, বাহিরে দেখিতে সত্য স্বরূপের অর্চ্চনা করিতেছে, অথচ আশা, আনন্দ ও বল বাড়িতেছে না; হৃদয়ে বিশ্বাস ও প্রেম জাগিতেছে না, তাহা হইলে ভাবিতে হইবে যে, তাহার জীবন-তরুর মূলে কীট লাগিয়াছে। হয় কোনও গূঢ় আসক্তি তাহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে, না হয় কোনও ধর্ম্মবিরোধী ভাব তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সে হয়ত ধর্ম্মাভিমানে স্ফীত হইতেছে, অথবা কোনও ব্যক্তি বা দলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে, অথবা সেই দুরারোগ্য ব্যাধি, যাহাকে সাধু-ভক্তিহীন সমালোচনাপ্রিয়তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা তাহার অন্তরাত্মাকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে। উৎকট ব্যক্তিত্বের ঊর্য়া তাহার মনে ভক্তিকে জন্মিতে দিতেছে না।

আশা, আনন্দ ও বল এই তিনের দ্বারা ধর্ম্মজীবনের উন্নতির বিচার করিতে হইবে। তাঁহাতে আশা, তাঁহাতে আনন্দ ও তাঁহাতেই শক্তি, ইহা যাঁহার হইয়াছে, তিনি অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধাম দেখিয়াছেন। সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম না দেখিলে, ধর্ম্ম নিরাপদভূমিতে দণ্ডায়মান হয় না।

সামঞ্জস্যের ধর্ম্ম।

এ কথা এ স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ের যুগধর্ম্মে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবের সমাবেশ চাই। চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, যে সেই যুগধর্ম্মে কেবল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবের সমাবেশ করিলে চলিবে না; আরও অনেকগুলি পরস্পর বিসম্বাদী ভাবের সমাবেশের প্রয়োজন। তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম জগতের ধর্ম্ম সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নীতিপ্রধান ও অপর কতকগুলি ভাবপ্রধান। নীতিপ্রধান ধর্ম্মের মধ্যে য়িহুদী ধর্ম্মের ও তৎপ্রসূত খ্রীষ্টধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই উভয় ধর্ম্মের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা নীতিমূলক। য়িহুদী ধর্ম্মের আদি পুরুষ মূষা ঈশ্বরের নিকট যে দশাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নীতিমূলক। ইহার প্রধান প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের উপদেশ নীতিমূলক। ইহাদের যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের মধ্যে একজন Isaiah তিনি ঈশ্বরের বাণীরূপে বলিতেছেন—"Wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil; learn to do well; seek judgement; relieve the oppressed; judge the fatherless; plead for the widow; come now and let us reason together saith the Lord"—অর্থাৎ ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা আপনাদের পাপ-মলা ধৌত করিয়া পরিষ্কার হও,আমার দৃষ্টি হইতে তোমাদের পাপাচরণকে অন্তর্হিত কর, পাপ করিও না, সদনুষ্ঠান শিক্ষা কর, ন্যায় বিচার অন্বেষণ কর, অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য কর, পিতৃহীনদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ কর, বিধবাদিগের পক্ষাবলম্বন কর, তদনন্তর আমার সন্নিধানে এস, আমি তোমাদের কথা শুনিব। Isiahর ন্যায় অপরাপর ধর্ম্মোপদেষ্টারাও স্বদেশবাসীদিগের চিত্তকে অনুষ্ঠানপ্রধান ধর্ম্মের দিক হইতে নীতি-প্রধান ধর্ম্মের দিকে বার বার আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

য়িহুদীধর্ম্মের অনুষ্ঠান-বহুলতা, নিয়মাধিক্য ও কঠোর নীতিপরায়ণতার মধ্যে প্রেম ও আত্ম-সমর্পণের ধর্ম্মপ্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম মহাবিপ্লব সাধন করিয়াছেন। যীশুর প্রধান শিষ্য সেণ্টপল গ্যালেসিয়াবাসীদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার এক স্থানে বলিতেছেন ;—"But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance"—অর্থাৎ মানব-হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য করিলে নিম্নলিখিত কতকগুলি ফল উৎপন্ন হয়—প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য্য, নিরীহতা, দাক্ষিণ্য, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচার। Isaiahর প্রদর্শিত ধর্ম্মের আদর্শ ও খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের প্রদর্শিত আদর্শে যে কত প্রভেদ তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন। তাহা হইলেও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নীতিপ্রধানতা চির-প্রসিদ্ধ। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ অপেক্ষা মানবে মানবে যে সম্বন্ধ তাহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিস্ফুট করিয়াছেন ; সে বিষয়ে ইহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যীশু তাঁহার উপদেশের মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছেন—"Therefore if thou bring thy gift to the altar, and thou rememberest that thy brother hath aught against thee ; leave there thy gift before the altar, and go thy way, first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift,"—অর্থাৎ তুমি যখন তোমার নৈবেদ্য সামগ্রী পূজার বেদীর সন্নিধানে আনিয়াছ, তখন যদি স্মরণ কর, যে কোনও মানুষের কোনও প্রকারে অনিষ্ট করিয়াছ, তাহা হইলে সেই নৈবেদ্য ঐ পূজার বেদীতে রাখিয়াই গমন কর, অগ্রে গিয়া সেই মানুষের সহিত বিবাদ ভঞ্জন কর, তৎপরে ঈশ্বর-চরণে নৈবেদ্য আনিও।"—এই উপদেশের অর্থ এই যে, মানবে ও ঈশ্বরে যে সম্বন্ধ, তাহা মানবে মানবে সম্বন্ধের উপরে স্থাপিত,—অর্থাৎ ধর্ম্ম নীতিমূলক।

য়ীহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নীতিপ্রধান ভাব এক দিকে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা বা ভাবপ্রধানতা অপর দিকে। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস সকলের শ্রেষ্ঠ উপদেশ এই,—যে আত্মা আসক্তি-হীন হইয়া সমুদয় অনিত্য বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া নিত্য বস্তু যে পরমাত্মা তাঁহাতে স্থিতি করিবে, ইহার নাম মুক্তি।

উপনিষদ বলিয়াছেন,—

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনং॥

অর্থাৎ হৃদয়ের সমুদয় আসক্তি-পাশ যখন ছিন্ন হয়, তখন মানব মুক্তি লাভ করে, সংক্ষেপে ধর্ম্মের এই অনুশাসন। আসক্তি ছেদনই মুক্তির পথ। আসক্তি আত্মার মধ্যে, মানবে মানবে সম্বন্ধের মধ্যে নহে; সুতরাং উন্নত হিন্দুধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র আত্মমধ্যে। আধ্যাত্মিকতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

এই আধ্যাত্মিকতা এতদ্দেশীয় বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবুকতার আকার ধারণ করিয়াছে। ভাববিশেষের চরিতার্থতাকেই তাঁহারা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করেন; এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া ব্যবহারিক নীতির প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন।

যুগধর্ম্মে এই উভয়েরই সমাবেশ চাই; ভাবুকতা ও নীতি উভয়েরই সংমিশ্রণ চাই; নীতিহীন ভাবুকতা ও ভাবুকতাহীন নীতি উভয়ই বর্জ্জন করা চাই। বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মে এই উভয়েরই সমাবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, যুগধর্ম্মে আর দুইটী পরস্পর-বিসম্বাদী ভাবের সমাবেশ আবশ্যক, তাহা সাধুভক্তি ও স্বাধীনতা। বাস্তবিক সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে কোনও বিরোধ নাই; অথচ ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দেখি, ইহাদের মধ্যে যেন এক প্রকার বিবাদ দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে অতিরিক্ত সাধুভক্তি স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের গতি অবরুদ্ধ করিয়া মানুষকে অসহায় ও পরমুখাপেক্ষী করিয়াছে; অপর দিকে স্বাধীনতা উৎকট ব্যক্তিত্বের আকার ধারণ করিয়া হৃদয়কে সাধুভক্তিহীন ও ধর্ম্মভাবশূন্য করিয়াছে। অনেকের মতে সাধুভক্তির অর্থ, কঠিন শৃঙ্খলে আত্মার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে অসহায় করা; আবার কাহার কাহারও নিকটে চিন্তার স্বাধীনতার অর্থ, সমালোচনার শাণিত ছুরিকা দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্যের সমুদয় পবিত্র বিষয়ের ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করা। এই উভয়ের মধ্যস্থলে একটী পথ আছে, তাহাতে আপনাকে না হারাইয়া সাধুভক্তিতে নত হওয়া যায়; বরং এই কথাই বলি, সে পথে সাধুভক্তির দ্বারা নিজের আলোককে আরও উজ্জ্বল করা যায়; সেই পথ যুগধর্ম্মের পথ।

তৃতীয়তঃ, সাধুভক্তি ও স্বাধীনতার ন্যায় আর দুইটী বিসম্বাদী ভাব আছে,

তাহা সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি। ধর্ম্মের একটা সামাজিকতা আছে। কাহার কাহারও মতে সেইটাই সর্ব্বপ্রধান; কোন কোনও সম্প্রদায়ের মতে সেইটাই সর্ব্বেসর্ব্বা। দশ জনে না মিলিলে তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন হয় না। দশজনে বসাই তাঁহাদের সাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ধর্ম্মের এই সামাজিক দিকের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়াতে, আত্মদৃষ্টি, ধ্যান, নির্জ্জন উপাসনা প্রভৃতি ব্যক্তিগত সাধনের প্রতি তাঁহাদের অনাস্থা দৃষ্ট হয়। সামাজিকতা হইতে যে সকল ভাব স্বতঃ মানব অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেই সকল ভাবই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের প্রধান লক্ষণ, ধ্যান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা যে গভীরতা ও চিন্তাশীলতা মানবচরিত্রে জন্মিয়া থাকে,তাহা তাঁহাদের জীবনে দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান সময়ের যুগধর্ম্মে এই উভয় ভাবেরই সমাবেশ চাই। তাহাতে সামাজিকতা ও আত্মদৃষ্টি উভয় তুল্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হওয়া চাই; ভাবের তরঙ্গও চাই, চিন্তার গভীরতাও চাই। নির্জ্জন ও সজন সাধন দুইএর প্রতি দৃষ্টি রাখা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উভয়কেই আপনাতে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, আর একটী বিষয়ে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ আবশ্যক, তাহা ভূত ও বর্ত্তমানের মিলন। ধর্ম্মরাজ্যে দেখিতে পাই, যাঁহারা ভূত কালের প্রতি অধিক আস্থাবান তাঁহারা যেন বর্ত্তমানকে এক প্রকার অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বর্ত্তমানের সহিত তুলনাতে ভূতকাল সর্ব্বদাই অধিকতর সুন্দর দেখায়। কারণ বর্ত্তমান বলিলে আমাদের চতুর্দ্দিকে ভাল মন্দ মিশ্রিত যে সকল মানুষ, যে সকল বিষয় ও যে সকল ঘটনা দেখিতেছি তাহাই বুঝায়। বর্ত্তমানে আমরা যেমন একদিকে সাধুতা দেখি, তেমনি অপর দিকে অসাধুতা দেখি; এক দিকে যেমন নিঃস্বার্থ পরোপকার দেখি, তেমনি অপর দিকে কুটিল স্বার্থপরতা দেখিতে পাই। সুতরাং বর্ত্তমানের ভাব আমাদের হৃদয়ে সাধুতা অসাধুতা-মিশ্রিত; বরং অসাধুতার দ্বারা সঙ্কুচিত। ভূতকালের ভাব ও প্রকার নহে। ভূতকালের লোকের দৈনিক জীবনের অসাধুতা, নিকৃষ্টতা, অধমতার কথা কেহ লিখিয়া রাখে নাই; তাহার চিত্র রাখিয়া যাইবার জন্য কেহ প্রয়াস পায় নাই। পাইলে বোধ হয় আমরা দেখিতাম যে, সাধুতা ও অসাধুতার সংমিশ্রণ ব্যাপারে ভূতকাল বর্ত্তমানেরই অনুরূপ ছিল। কিন্তু তাহা হয় নাই; বরং তদ্বিপরীতে ইহাই হইয়াছে যে, মানুষ বাছিয়া বাছিয়া ভাল কাজ, ভাল

কথা, ভাল ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এখন ভূতকালের সহিত বর্ত্তমানের তুলনার অর্থ, ভূতকালের উৎকৃষ্ট বিষয়গুলির সহিত বর্ত্তমানের নিকৃষ্ট বিষয় গুলির তুলনা। এই কারণে বিগত যুগ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান কলিযুগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়।

সে যাহা হউক, এই যে অতীতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষ আপনার চরণ হইতে এই অতীতের শৃঙ্খল আর খুলিতে পারিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান সময়ে এক শোচনীয় দৃশ্য দেখিতেছি। চতুর্দ্দিকে বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতেছে; আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, মানুষ কাল তাহাকে অতিক্রম করিতেছে! নব নব রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে; নব চিন্তার প্রভাবে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সর্ব্বত্রই মহা বিপ্লব ঘটিয়া যাইতেছে; মানবসমাজের পুরাতন ভিত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া নবতর ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। এই বহুদূরব্যাপী ও বহুফলপ্রদ বিপ্লবের মধ্যে পুরাতন ধর্ম্ম সকলই কেবল ভূতকাল লইয়া রহিয়াছে। তেরশত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশের অধিবাসীদিগের জন্য সে দেশীয় ভাষায়, তদানীন্তন অবস্থার উপযোগী যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম স্থাপিত ও প্রার্থনাদি রচিত হইয়াছিল, তাহা আজিও লক্ষ লক্ষ নরনারীর দ্বারা আচরিত হইতেছে। জগত আলোকে ভরিয়া যাইতেছে, প্রাচীন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এক এক খণ্ড অন্ধকার বুকে ধরিয়া পোষণ করিতেছেন। এই যে অতীতের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা, প্রাচীনের প্রতি আত্যন্তিক প্রেম, ইহা দেখিলে একটী ঘটনার কথা মনে হয়। একবার আলিপুরে পশুশালাতে একটী বানরীর একটী শিশু মরিয়া গিয়াছিল। হতভাগ্য জীব মৃত শিশুটীকে কোনরূপেই ছাড়িল না। তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া বুকে ধরিয়া ঘুরিতে লাগিল। কেহই তাহার আলিঙ্গন হইতে মৃত শিশুটী ছাড়াইতে পারিল না! অবশেষে সেই মৃত শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল, পচিয়া, গলিয়া, খসিয়া পড়িতে লাগিল, তবু সে সে দেহ ছাড়িল না। ইহা দেখিলে কে চক্ষের জল রাখিতে পারে? সেইরূপ দেখিতেছি, এক একটী সম্প্রদায় কতকগুলি মৃত মত ও অনুষ্ঠান বুকে ধরিয়া রহিয়াছে; বিজ্ঞানের নবালোক যতই সে গুলিকে আলিঙ্গন-পাশ হইতে ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, ততই যেন তৎ তৎ সম্প্রদায় অধিকতর আগ্রহের সহিত সে গুলিকে

বুকে চাপিয়া ধরিতেছে; বিজ্ঞানের হস্তে দংশন করিতেছে; আপনার মৃত শিশু-টীকে জীবন্ত বলিয়া রক্ষা করিতেছে; শেষে মৃত বস্তুগুলি টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। বানরীর মৃত শিশু রক্ষা যেমন মাতৃ-স্নেহের নিদর্শন; ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের প্রাচীনতা রক্ষাও তেমনি মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগের নিদর্শন।

কিন্তু প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা অস্বাভাবিক স্থিতিশীলতার কারণ হইলেও আমরা কি প্রাচীনকে বিস্মৃত হইয়া বা অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারি? যেমন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী গঙ্গা প্রবাহের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া কেহ হরি-দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী প্রবাহকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না, কারণ সেই ধারাই এই সহরের সমীপগামিনী ধারার আকার ধারণ করিয়াছে, তেমনি হে মানব, তুমি যে কিছু জ্ঞানসম্পদের অধিকারী হইয়াছ,যে কিছু তত্ত্ব দেখিতেছ,বা শিখি-তেছ,তন্মধ্যে প্রাচীনদের শ্রমের ফল যে প্রবেশ করিয়াছে; এবং বহু বহু শতাব্দী ও বহু বহু দূর হইতে জ্ঞানিগণ যে তোমার জ্ঞানাঙ্গ পোষণ করিয়াছেন; তুমি তাহা অস্বীকার করিতে পার না। তুমি যে প্রাচীন অপেক্ষা আপনাকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতেছ, ইহাও প্রাচীনদিগের সাহায্যে। শিশু যেমন পিতার স্কন্ধোপরি বসিয়া বলে, "বাবা দেখ আমি তোমা অপেক্ষা কত বড়," ইহা তেমনি। একবার কল্পনার সাহায্যে মনে কর, রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যদি বিষয়, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীনের যে কিছু কীর্ত্তি আছে, সমুদয় বিলুপ্ত হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়, এবং কল্য প্রাতে আমাদিগকে নব জগতে নবজীবন আরম্ভ করিতে হয়, তাহা হইলে কিরূপ অবস্থা ঘটে। প্রাচীন হইতে বর্ত্তমানকে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রাচীনের প্রতি সমুচিত আস্থা ধর্ম্ম জীবনের প্রধান পরিপোষক।

যাঁহারা প্রাচীনের প্রতি অতিরিক্ত আস্থাবান তাঁহারা বর্ত্তমানের প্রতি অনাস্থাসম্পন্ন। তাহাও যুগধর্ম্মের বিরোধী ভাব। মানব-জীবনরূপ তরু হইতে বর্ত্তমানে যে সকল শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগধর্ম্ম সে সকলকেও প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রমাণ মানব-জীবন এক মঙ্গলময় পুরুষের হস্তে; তিনি ইহাকে উন্নত হইতে উন্নততর

সোপানে লইয়া যাইতেছেন। আমরা কি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি না, যে বর্ত্তমান সভ্যতা মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির অনুকূল অবস্থা সকল আনিয়া দিতেছে? পুরাকালে একজনকে বিদ্যালাভ করিতে হইলে, কত পথশ্রম স্বীকার করিয়া গুরু সন্নিধানে যাইতে হইত, নিজ হস্তে লিপি করিয়া গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিতে হইত, একটা জ্ঞানের তত্ত্ব জানিবার উপায় অভাবে তাহা চিরদিন জ্ঞান-চক্ষুর নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত। এখন বিদ্যার উপাদান সকল সকলেরই হাতের নিকট। তুমি জ্ঞানানুরাগী হও, বা সত্যানুসন্ধায়ী হও, বা বিজ্ঞানানুরাগী হও, বা নরপ্রেমিক হও, বর্ত্তমান সভ্যজগত সর্ব্ববিষয়ে তোমার অনুকূল। বর্ত্তমান সময়ে মনুষ্যের লাভের আশা যেমন অদ্ভুত শক্তির সহিত স্বকার্য্য করিতেছে, নব নব অর্থাগমের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে, তেমনি সর্ব্ববিধ উন্নতির আশাও আপনাকে প্রবলরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

অতএব যুগধর্ম্ম ভূতকালের ন্যায় বর্ত্তমানকেও অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত আলিঙ্গন করিবে। বর্ত্তমানকে বিধাতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া মনে করিবে, সর্ব্ববিধ মানবীয় উন্নতির মধ্যে আপনাকে সোৎসাহে নিক্ষেপ করিবে ও সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে সহায় হইবে, পরা বিদ্যার ন্যায় অপরা বিদ্যাকেও আদর করিবে। বলিতে কি, পরা অপরা বিদ্যার প্রভেদ ঘুচাইয়া দিবে, সকল বিদ্যাকেই পরা বিদ্যার চক্ষে দেখিবে!

বর্ত্তমানকেই যে কেবল আগ্রহের সহিত ধরিবে তাহা নহে, আশার বাস-স্থান ভবিষ্যতে; আশাকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবে। উচ্চ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করাই জীবন। ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় বিধাতার হস্তে, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদা আশা বিদ্য-মান। এই আশা হৃদয়ে শান্তি আনে, প্রতিজ্ঞাতে বল আনে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে দৃঢ়তা আনে। বিশ্বাসী মনের যে এই আশা, ইহা যুগধর্ম্মের মধ্যে প্রধান শক্তিরূপে বাস করিবেই। ঈশ্বর করুন, সেই শক্তিশালী ধর্ম্মভাব আমরা প্রাপ্ত হই।

রাজসিকধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকধর্ম্ম।

গতবারে পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মভাবের একত্র সমাবেশের বিষয়ে কিছু বলিয়াছি। এবারে সে বিষয়ে আরও কিছু দেখাইব। সেটা এই, আমরা সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানি এবং ধর্ম্মনামে অভিহিত করি, তাহার মধ্যে দুইটী ভাব আছে;—এক রাজসিক অপর সাত্ত্বিক। রাজসিকধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকধর্ম্ম উভয়ের প্রকৃতি ও লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উভয়ের কার্য্য এবং ফলও স্বতন্ত্র। রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ধর্ম্মে প্রভেদ কোথায়, তাহা ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি।

রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই শ্রেণীবিভাগ অতি প্রাচীন। প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যগণ মানবপ্রকৃতি অনুশীলন করিয়া মানব-চরিত্রের ত্রিবিধ ভাব ও ত্রিবিধ কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সত্ত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয় কল্পনা করিয়া, ঐ ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, 'যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেম, সত্ত্ব; অহং বুদ্ধিজাত কর্ম্মস্পৃহা, রজ এবং অজ্ঞতাপ্রসূত মোহ, তম। গীতাকার বলিয়াছেন,—

> জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।
> লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
> রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥
> অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ
> তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন॥

অর্থাৎ—হে কুরুনন্দন, সত্ত্বগুণের আধিক্য হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, রজোগুণের আধিক্য হইলে, লোভ, উদ্যোগ, চেষ্টা, অবিশ্রান্ত কর্ম্মস্পৃহা প্রভৃতি প্রবল হয়; তমোগুণের আধিক্য হইলে অজ্ঞানতা, কর্ম্মে বিতৃষ্ণা, আত্মার কল্যাণকর বিষয়ে অমনোযোগ এবং পাপে আসক্তি প্রকাশ পায়।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণানুসারে রজোগুণের প্রধান লক্ষণ অহং-বুদ্ধি-প্রসূত কর্ম্মস্পৃহা। এই মূল লক্ষণটী মনে রাখিয়াই ধর্ম্মকে রাজসিক ও সাত্ত্বিক দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছি।

রাজসিক ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ,—তাহাতে সাধক নিজের গৌরব অন্বেষণ করে। ইহা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মপরীক্ষার একটী প্রধান বিষয়। কোনও কোনও মানুষের প্রকৃতিতে একপ্রকার আত্ম-শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহার প্রভাবে তাঁহারা এ জগতে অনেক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। স্বাবলম্বন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যে সকল বিঘ্ন বাধা সচরাচর সাধারণ মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তাহা তাঁহাদিগকে দমাইতে পারে না। রোগ, শোক, দারিদ্র্য কিছুতেই তাঁহাদিগকে স্বীয় অভীষ্ট পথ হইতে নিরস্ত করিতে পারে না। তাঁহাদের সমক্ষে বিপদ-তরঙ্গ যতই উচ্চ হইয়া উঠুক না কেন,তাঁহারা স্বীয় আত্ম-শক্তির প্রভাবে তদুপরি উত্থিত হন। এই প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যখন সাধনে মনোনিবেশ করেন, তখন তাঁহাদের আত্ম-নিহিত শক্তি অবিশ্রান্ত কার্য্যশীলতাতে প্রকাশ পায়। তাঁহারা সর্ব্বদাই কিছু করিতেছেন। কিন্তু সেই কার্য্যের পশ্চাতে অহং বুদ্ধি বিরাজমান থাকে। অনেক সময় অজ্ঞাতসারে তাঁহারা ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া, নিজ গৌরব অন্বেষণ করিতে থাকেন। যখন তাঁহাদের হস্তের কার্য্য সফল হইতে থাকে, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি ঈশ্বরের উপরে না পড়িয়া অজ্ঞাতসারে নিজের উপরেই পড়িতে থাকে। সত্যের রাজ্য বিস্তার হইতেছে, ধর্ম্মের জয় হইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার জয় হইতেছে, এজন্য আনন্দিত না হইয়া, তাঁহারা অজ্ঞাতসারে নিজ শক্তির কার্য্য দেখিয়া আনন্দিত হইতে থাকেন। যীশুর শিষ্য সেণ্টপল একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি কিছুই নহি, আমি ধূলি ও ভস্ম মাত্র, প্রভু যীশুই সকল।" হয় ত এই রাজসিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণও বলিতে থাকেন, "আমি কোথায়? আমিত্ব উড়িয়া গিয়াছে, আমার যাহা কিছু কাজ দেখিতেছ তাহা ঈশ্বরের," কিন্তু দুই উক্তির মধ্যে প্রভেদ থাকে। পলের উক্তির অর্থ এই, আমাকে সরাইয়া নিয়াছি, যীশু সেই স্থান পূর্ণ করিয়াছেন, দ্বিতীয় উক্তির অর্থ এই,আমি ফুলিয়া উঠিয়া ঈশ্বরের সহিত মিশিয়াছি। এখন যাহা কিছু করিতেছি সকলি ঈশ্বরের কাজ।" দেখ দুইটি ভাবে কত প্রভেদ। এই রাজসিক ভাবাপন্ন ধর্ম্মসাধকগণের প্রকৃত ভাব তখনি ধরা পড়ে, যখন কেহ সাহসী হইয়া তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপরে আঘাত করে। তখন তাঁহাদের প্রকৃতিনিহিত রাজসিক ভাব পদাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে, মনে মনে বলিতে থাকে, এত

বড় আস্পর্দ্ধা, আমার শক্তিতে আঘাত, দেখি তোমরা কি করিতে পার। এই বলিয়া এক দিকে তাঁহারা নিজ অবলম্বিত পথে আরও দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হন, অপর দিকে বিরোধীদিগের প্রতি দন্তঘর্ষণ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকেন। তখন জগদ্‌বাসী বুঝিতে পারে যে, এতদিন তাঁহারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ না করিয়া নিজেদেরই গৌরব অন্বেষণ করিতেছিলেন। ধর্ম্মরাজ্যে রাজসিক ভিত্তির উপরে কিছু দাঁড়ায় না। সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু গড়িয়াছিলেন, তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

এই গেল রাজসিক ধর্ম্মের ভাব। সাত্ত্বিক ধর্ম্মের লক্ষণ আর এক প্রকার। সেখানে উদ্যোগ আছে, চেষ্টা আছে, কার্য্য আছে, আত্মশক্তি প্রয়োগ আছে, স্বীয় বিশ্বাসে দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হওয়া আছে, অথচ আত্ম-গরিমা নাই। সে মানুষ সত্য-রাজ্যের বিস্তার ও ধর্ম্মের জয় ভিন্ন কিছুই অন্বেষণ করিতেছে না। তাহার যে দৃঢ়তা, তাহা অহং বুদ্ধিপ্রসূত নহে, কিন্তু ঈশ্বরাদেশে প্রগাঢ় নিষ্ঠাপ্রসূত। তাঁহার বিরোধ আছে, কিন্তু বিদ্বেষ নাই; বিচার আছে, কিন্তু পরনিন্দা নাই; স্বমতপোষণ আছে, পরমতের প্রতি উপেক্ষা নাই; চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা আছে, পরের কার্য্যের সমালোচনা নাই। তিনি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াছেন, ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, কে কি বলিল, কে কি করিল, তাহার প্রতি আর দৃষ্টি করেন না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আত্ম-গৌরব অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরেরই গৌরব অন্বেষণ করেন।

যাহার প্রধান নির্ভর নিজ শক্তির উপরে, যাহার প্রধান দৃষ্টি নিজের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের উপরে, সে মুখে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিলেও অন্তরে অন্তরে তদুপরি নির্ভর করে না। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় তাহার চক্ষু আত্মশক্তির উপরেই পড়ে, নিজ দলবলের উপরেই পড়ে, ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্যের প্রতি পড়ে না। তাহার মন এ কথা বলে না, ঈশ্বর আমার সহায় আমার ভয় কি, বরং এই কথাই বলে, আমি ঢের বিঘ্ন বাধা দেখিয়াছি, আমাকে কে বাধা দিতে পারে? এজন্য সে মানুষ নূতন কর্ত্তব্যের পথে প্রার্থনাপূর্ণ অন্তরে অগ্রসর হয় না; বিনয়ের সহিত কার্য্য করে না; অহঙ্কারে ফাটিতে থাকে; চারিদিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে; মনে মনে যেন নিজ বাহুতে তাল ঠুকিতে থাকে।

আর একটী বিষয়ে রাজসিক ধর্ম্ম ও সাত্ত্বিক ধর্ম্মে প্রভেদ আছে। গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গার দিকে রাজসিক ধর্ম্মের অধিক গতি। এরূপ মানুষ সর্ব্বদাই যেন প্রতিবাদের শিং পাতিয়া রহিয়াছে, লড়াই করিতে প্রস্তুত। অপরের যাহা আছে সকলি মন্দ, আমার যাহা আছে সকলি ভাল। এই তাহার মনের ভাব। জীবন্ত প্রাণীকে অভিভূত করিয়া তাহার দেহ বিদারণ করিতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ যেমন সুখ পায়,সে মানুষ তেমনি বিরোধীদিগের মত ও বিশ্বাস ছিন্ন ভিন্ন করিতে সুখ পায়। মানব-হৃদয়ের পবিত্র ও সুকোমল ভাবগুলির প্রতি, প্রাচীন কাল হইতে সমাগত কল্যাণকর বিষয়গুলির প্রতি, তাহার দয়া মায়া নাই। কেবল ভাঙ্গ, কেবল ভাঙ্গ, ঐ যেন তাহার উক্তি। এই ভাঙ্গা কাজটা সর্ব্বদা করিয়া করিয়া মানবপ্রকৃতিতে এক প্রকার উগ্রতা প্রস্তুত হয়। যেমন জীবন্ত প্রাণীকে সর্ব্বদা হত্যা করিয়া ব্যাঘ্রাদির প্রকৃতিতে একপ্রকার উগ্রতা জন্মে, হত্যা করিতে, রক্তপাত দেখিতে, তাজা রক্ত পান করিতে তাহারা ভাল বাসে, তেমনি সর্ব্বদা প্রতিবাদপরায়ণ প্রকৃতিতে একপ্রকার উগ্রতা জন্মে যাহাতে বিনয়, শ্রদ্ধা,সাধুভক্তি প্রভৃতি আর থাকে না; সুতরাং ধর্ম্মভাব আর বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

যেমন সামাজিক বিধিব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তেমনি ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে। রাজসিক ধর্ম্মভাবাপন্ন ব্যক্তি মানুষকে গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গিতে ভাল বাসে। একজন মানুষকে ভাঙ্গিতে অনেক দিন লাগে না, গড়াই বড় কঠিন। যে হতভাগ্য ব্যক্তির পা একবার পিছলাইয়াছে, তাহাকে তুমি ধাক্কা দিয়া আরও ফেলিয়া দিতে পার, আবার মনে করিলে হাতখানা ধরিয়া তুলিতেও পার। বাড়ীর ছাদে বা রাজপথে কেহ যদি পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায়, তখন যাহারা নিকটে থাকে, তাহারা কি করে? দেখিতে পাই সকলেই বলিয়া উঠে "হাঁ হাঁ গেল, গেল, পড়িয়া গেল, ধর ধর মানুষটাকে ধর।" এইটা দয়ার কাজ, সত্ত্ব-গুণের কাজ। জীবন সম্বন্ধে ইহার বিরুদ্ধ যদি দেখি, যদি দেখিতে পাই, যেই একটু ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, অমনি দশজনে শকুনির ন্যায় চারি-দিক হইতে উড়িয়া আসিয়া তাহার সেই দুর্ব্বলতা ধরিয়া পা দিয়া চাপিয়া ঠোঁট দিয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, যে দুর্ব্বলতাতে পড়িয়া নিরাশ হইতেছিল, তাহাকে আরও নিরাশ করিয়া ফেলিতেছে, তাহাকে ঈশ্বরের প্রেম-মুখ স্মরণ

না করাইয়া, মানুষের কোপে আরক্ত ভীষণ মুখই দেখাইতেছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সেখানে রাজসিক প্রকৃতির কার্য্য চলিতেছে। আমরা বলি মানুষকে গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা অতি সহজ।

সাত্ত্বিক ধর্ম্ম গড়িতে ভাল বাসে; ইহা বিনয়, শ্রদ্ধা, সাধুভক্তি প্রভৃতিকে পোষণ করিয়া প্রাচীনে যাহা ভাল, নবীনে যাহা ভাল সকলকে সংরক্ষণ ও গঠন করে। প্রেম সাত্ত্বিকধর্ম্মের প্রাণ, প্রেমের কার্য্য গঠন করা, সুতরাং সাত্ত্বিক ধর্ম্মে চারিদিক গড়িয়া তোলে।

সাত্ত্বিক ধর্ম্ম মানুষকে ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়িতে ভাল বাসে; সহস্র দুর্ব্বলতাতে যাহাকে ঘিরিয়াছে, তাহার ভিতরে যে একটু সাধুভাব আছে, তাহাকে ধরিয়া সে মানুষটাকে তুলিতে চায়; সৎ যাহা তাহাকে ফুটাইয়া, সবল করিয়া, মানুষটাকে বাঁচাইতে চায়; যে অসাধুতাতে পা দিয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া সাধুতাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যগ্র হয়।

তৃতীয়তঃ, রাজসিক ব্যক্তি পরের গুণ অপেক্ষা দোষের সমালোচনা করিতে অধিক ভাল বাসে; সাত্ত্বিক ব্যক্তি পরের দোষ অপেক্ষা গুণের আলোচনা করিয়া অধিক সুখী হয়। ইহার ভিতরকার কথা এই; রজোগুণের লক্ষণ অহঙ্কার, সুতরাং এই প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অজ্ঞাতসারে পরকে হীন করিয়া আপনারা বড় হইতে ভাল বাসে। এই পরদোষ চিন্তা হইতে এক প্রকার সমালোচনাপ্রিয়তা জন্মে, যাহার ন্যায় মানবচরিত্রের বিকার অতি অল্পই আছে। পরদোষ সমালোচনা একবার যাহার অভ্যাস-প্রাপ্ত হয়, তাহার অন্তরের বিনয় শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্মজীবন গঠনোপযোগী ভাবগুলি শুকাইয়া যায়; চিত্তে অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ বার বার উদিত হওয়াতে, মনে একপ্রকার রুক্ষতা ও তিক্ততা জন্মিতে থাকে; প্রেমের ভাব ম্লান হইয়া মানুষকে মানুষ হইতে দূরে লইয়া যায়; সুতরাং এরূপ মানুষ ঈশ্বর ও মানব দুই হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। রাজসিক ধর্ম্ম তাহাতেই তৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ভাব অন্য প্রকার। পরের দোষ অপেক্ষা গুণের প্রতি ইহার অধিক দৃষ্টি। মানুষকে ভাল ভাবিয়া ইহা সুখী হয়। পরের গুণ দেখিলে মন কোমল হয়, বিনীত হয়, প্রেমের উদয় হয়। ইহা হৃদয়কে উন্নত করে ও ঈশ্বর-প্রীতিকে পোষণ করে।

রাজসিক ধর্ম্মের আর একটী লক্ষণ আছে, ইহাতে দিবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা

নিবার প্রবৃত্তিই অধিক। ধর্ম্মসম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা অপরের সাহায্য লইতে প্রস্তুত, অপরকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়। ইহাদের মুখে সর্ব্বদাই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়, অপরের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাহারা করে না। আমাকে কেহ দেখে না, আমার খবর কেহ লয় না,—আমার সাহায্য কেহ করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি যাহারা এরূপ অভিযোগ সর্ব্বদা করে, তাহারাই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী ; তাহারাই অপরের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদাসীন। যাহারা অপরের সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র, যাহারা দিতে প্রস্তুত, তাহাদের মুখে এরূপ অভিযোগ শুনা যায় না, কেহ দেখিল কি না, সাহায্য করিল কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার তাহাদের সময় নাই। অথচ বোধ হয় তাহারা স্বতঃই লোকের সাহায্য পায়। সাত্ত্বিক ধর্ম্মের ভাব এই, ইহাতে পাওয়া অপেক্ষা দিবার প্রবৃত্তি অধিক। অপরে তাহাদের কর্ত্তব্য করিতেছে কি না, এ প্রশ্ন অপেক্ষা আমি অপরের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতেছি কি না, এই প্রশ্নই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অধিক উদিত হয়। নিজের অভাব ও ত্রুটির কথা এতই তাঁহার মনে জাগে যে, অপরের ত্রুটির কথা মনে তুলিবারও সময় হয় না। আপনার অপরাধ স্মরণ করিয়া তিনি সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, পরের অপরাধ ভাবিবেন কখন ?

এক্ষণে অনেকে হয় ত প্রশ্ন করিবেন, সাত্ত্বিক ধর্ম্মের যে সকল লক্ষণের কথা শুনিতেছি, তাহা লাভ করিবার উপায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিরা বলিয়াছেন :—

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈব প্রবর্ত্তকঃ।

সেই মহান্ পুরুষই সত্ত্বের প্রবর্ত্তক। অর্থাৎ তাপকে যেখানেই দেখ, আর যে আকারেই দেখ, সূর্য্যই যেমন তাহার প্রবর্ত্তক, তেমনি সত্ত্বগুণকে যেখানেই দেখ, আর যে আকারেই দেখ, সেই পূর্ণ পবিত্রতার আকর পুরুষই তাহার প্রবর্ত্তক। তাঁহাকে লইয়াই ধর্ম্ম, ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসমাজ। যতটা তাঁহার সঙ্গে যোগ ততটাই সাত্ত্বিক ধর্ম্মের আবির্ভাব। গীতাকার বলিয়াছেন, বিশুদ্ধ জ্ঞানই সত্ত্ব। আমি তাহার সঙ্গে একটু যোগ করি, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রেমই সত্ত্ব। ঈশ্বরে অকপট প্রীতি সঞ্চারিত হইলে, তাহা মানব-চরিত্রের অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করে,

মানবের চিন্তা ও ভাবকে অনুরঞ্জিত করে, মানবের আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র করে; সুতরাং সেরূপ চরিত্রে সাত্বিক লক্ষণ সকল স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন আর সে মানুষ আত্মগৌরবের প্রতি লক্ষ্য করে না, ঈশ্বরের গৌরব অন্বেষণ করে; নিজ শক্তি অপেক্ষা ব্রহ্মকৃপার উপরে অধিক নির্ভর করে; সে মানুষ ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়ার দিকে অধিক মনোযোগী হয়; পরদোষ অপেক্ষা পরের গুণের অধিক পক্ষপাতী হয়; সে মানুষ পাবার অপেক্ষা দিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হয়; বিনয় শ্রদ্ধাতে নত থাকে; নিজ অপরাধ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে; এবং জগতকে প্রীতির চক্ষে দর্শন করে। এই প্রেমের ধর্ম্মের দিকে অধিক মনোযোগী হওয়া আমাদের সকলের পক্ষে উচিত।

ধর্ম্মে শ্রেণীভেদ।

গতবারে ধর্ম্মকে রাজসিক ও সাত্বিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ ধর্ম্মের আর এক-প্রকার শ্রেণীভেদ প্রদর্শন করিতেছি।

জগতে মানুষ যত প্রকার ধর্ম্মের যাজন করিতেছে ও যত প্রকার ভাবকে ধর্ম্মভাব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে সমুদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে, স্থূলতঃ অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্থূলতঃ বলিবার অভিপ্রায় এই, ঐ পার্থক্য ধর্ম্মের স্বরূপগত নহে; কেবল বহিঃপ্রকাশে ও লক্ষণ বিশেষের আতিশয্যে। জগতের পরস্পর-বিসম্বাদী ধর্ম্ম সকলের বিবাদ কোলাহলের প্রতি দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, ইহা যেন অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায়। চারিজন অন্ধ হস্তী দেখিতে গেল। কেহ স্পর্শ করিল পদ, সে বলিল ভাই হস্তী স্তম্ভের ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল শুণ্ডটা, সে বলিল, ভাই হস্তী কদলীবৃক্ষের ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল লাঙ্গুল, সে বলিল হস্তী মোটা কাছির ন্যায়; কেহ স্পর্শ করিল কর্ণ, সে বলিল, না না, হস্তী সূর্পের ন্যায়। কাহারও কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, অথচ প্রত্যেকের উক্তির মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। এই খণ্ডঅংশ সকলকে জোড়া দিলে যে জিনিসটা দাঁড়ায় বরং সেটাকে একদিন হস্তী বলিলেও বলা যাইতে পারে।

জগতের ধর্ম্ম সকলের দশা দেখি যেন সেই প্রকার। এক একজন সাধক সত্যের এক এক দিক্ দেখিয়াছেন। তিনি অন্ধ হইয়া ভাবিয়াছেন, আর কোনও দিক্ নাই; সেইটীকেই পূর্ণ সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারই উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়াছেন। এই জন্যই এতটা বিবাদ।

প্রথম, জগতে এক প্রকার ধর্ম্ম দেখিতেছি, যাহাকে ঐতিহাসিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সকল ধর্ম্ম অতীতের প্রতি সম্পূর্ণ বা অতিরিক্ত মাত্রায় ঝোঁক দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন প্রাচীনকালে ঈশ্বর ঋষিবিশেষের বা ঋষিবর্গের নিকটে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঋষিদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া বেদকে প্রকাশ করিয়াছিলেন; মূষাকে গিরিশৃঙ্গে লইয়া গিয়া দশাজ্ঞা শুনাইয়াছিলেন; মহম্মদের নিকটে সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। এখন যদি তাঁহার বাণী জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার বিধি নিষেধ মানিতে ইচ্ছা হয়, তবে ঐ বেদ বা বাইবেল বা কোরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এক্ষণে ঈশ্বরের স্বরূপ বা ধর্ম্মের নিয়ম সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব জানিতে হইলে, আপ্তবাক্য ভিন্ন উপায় নাই। এই মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অজ্ঞেয়। মানব-মনের এমন কোনও দিক্ নাই, এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্দ্বারা মানব ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তবে যে ঈশ্বরজ্ঞান জগতে রহিয়াছে, ইহার কারণ কেবল আপ্তবাক্য। এক সময়ে ঋষিগণ ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন, আমরা তাহা শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। যেমন লণ্ডন সহর এ দেশের অনেকে দেখে নাই, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, লণ্ডন নামে সমৃদ্ধিশালী এক সহর আছে, সে কেবল যাহারা লণ্ডন দেখিয়াছে তাহাদের মুখে শুনিয়া, তেমনি ঈশ্বরকে কেহ দেখে নাই, সকলেই বিশ্বাস করে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর একজন আছেন, তাহা কেবল ঋষিগণের মুখে শুনিয়া। এই ধর্ম্মমত হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে কতকগুলি ভাব আসিয়াছে, যাহাতে জীবন্ত আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। প্রথম, এই ধর্ম্মভাবে এই উপদেশ দিয়াছে, যে এক্ষণে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে জানিবার ও প্রাণে পাইবার প্রয়াস বৃথা। প্রাচীন গ্রন্থে ঈশ্বর-প্রদত্ত যে সকল বিধিব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা পালন করাই ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মের সাধনের এক দিকে শাস্ত্র, অপর দিকে ক্রিয়াবহুলতা। শাস্ত্র বলিলেই তৎ সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তার প্রয়োজনীয়তা

আসিয়া পড়ে। কথাটা এই দাঁড়ায়, মানবাত্মার মুক্তির জন্য প্রাচীন ভাষা শিক্ষা চাই, এবং একদল টীকাকার পুরোহিত ও যাজকের অধীন হওয়া চাই । এই কারণেই দেখা যায় যে, সমুদয় ঐতিহাসিক ধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রধান পৌরহিত্যপ্রধান ধর্ম্ম।

আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্ম অন্য কথা বলে। তাহাতে বলে, ঈশ্বর যে এককালে মানব-হৃদয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে জানিবার জন্য আপ্তবাক্যই যে একমাত্র অবলম্বন তাহা নহে। আপ্তবাক্য আকাঙ্ক্ষাকে প্রস্ফুটিত করে, বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করে, অবিশ্বাসকে বিনাশ করে, নিজ অন্তরের আলোকের সাক্ষ্য প্রদান করে, এ সকল কথা সত্য ও স্বীকার্য্য ; কিন্তু সেই স্বপ্রকাশ ভূমা আপনাকে মানব-অন্তরে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই অভিব্যক্তি এখনও চলিয়াছে। ব্যাকুলাত্মা ও পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেই এই অভিব্যক্তি লাভ করিতে পারে। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন এই অভিব্যক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

ঐতিহাসিক ধর্ম্মের পরে আর এক প্রকার ধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে, তাহা পৌরাণিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম উপন্যাস ও কল্পিত ঘটনাবলীতে পূর্ণ বলিয়া ইহাকে পৌরাণিক ধর্ম্ম বলিতেছি। এ ধর্ম্মে বলে, ঈশ্বর ভূভার হরণ ও পাপীর উদ্ধারের জন্য রক্তমাংসময় দেহ ধারণ করিয়া মানবকুলের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবনে বা জুডিয়াতে নারীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং অপর মানবে যেমন হাস্য ক্রন্দনময়, সুখদুঃখময়, রোগ-শোক-জরা-মরণাধীন জীবন যাপন করে, সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছিলেন ; তাঁহার ঐশী শক্তির প্রকাশক অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন ; বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির উপরে গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিয়াছিলেন বা সাগর-তরঙ্গের উপরে পাদচারণা করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীর একমাত্র পাকপাত্রের অন্নের দ্বারা সহস্রাধিক ঋষিকে খাওয়াইয়াছিলেন বা পাঁচ খানি রুটি ভাঙ্গিয়া পাঁচ হাজার বুভুক্ষু ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছিলেন, এ সমুদয়ই পৌরাণিক কথা। সমুদয় পৌরাণিক ধর্ম্মের মধ্যে এরূপ কথার প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক প্রেমের ধর্ম্ম আর এক কথা বলে। এই ধর্ম্ম বলে, ভগবান ভূভার হরণ ও পাপীর উদ্ধারের জন্য একবার নামিয়া তাঁহার অবতরণ ক্রিয়া শেষ করিয়াছেন, ইহা কিরূপ ? এখনও কি ভূভার নাই, এখনও কি জগতে পাপী নাই ?

পৃথিবী যে এখনও দুষ্কৃতিভারে অবনত হইতেছে! মানব-সমাজে এখনও পাপী-তাপীর অপ্রতুল নাই! বৃন্দাবনের রাখালগণ বা জুডিয়ার মৎস্যজীবিগণ এমন কি করিয়াছিল, যে জন্য তাঁহার সন্দর্শন পাইল? তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম ভারতে বা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জুডিয়াতে এমন কি পাপের আধিক্য হইয়াছিল, যে জন্য ভগবান সেখানে নামিয়াছিলেন? তিনি এক সময়ে জগতের কোনও প্রান্তে নামিয়াছিলেন, এই মাত্র শুনিলে কি মানিলে কি আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে? কেহ যদি কলিকাতায় আসিয়া লোকমুখে শুনিয়া যায় যে ১৮৮০ সালে আলিপুরের পশুশালাতে রুশিয়া দেশের একটা শুক্ল ভল্লুক আনিয়া রাখা হইয়াছিল, তবে কি তাহার শুক্ল ভল্লুক দেখা হইল? শুক্ল ভল্লুকের গল্প শোনা যেমন শুক্ল ভল্লুক দেখা নয়, তেমনি ঈশ্বর কোনও বিশেষ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা মানাও ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম সাক্ষাৎ দর্শনে ও প্রেমে।

আর এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহাকে দার্শনিক ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ধর্ম্মের এক দিকে জড়বাদ অপর দিকে আত্মবাদ। জড় বিজ্ঞানের দিক দিয়া যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা বলেন, জড় ও জড়ের শক্তিই সর্ব্বস্ব। সৃষ্টি লীলার মধ্যে আত্মার উদ্দেশ কোথাও পাওয়া যায় না। সৃষ্টি রাজ্যের সর্ব্ববিভাগেই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা। ঈশ্বর যদি থাকেন, তিনি এই কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার অপর পার্শ্বে রহিয়াছেন; অথবা তিনি ব্রহ্মাণ্ডের কল চালাইয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কারণ আর তাঁহার কাজ নাই। এ ধর্ম্মমতে স্তুতি প্রার্থনা প্রভৃতি অনাবশ্যক। কারণ যাহা হইবার হইবেই। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপে এই ধর্ম্মমতের প্রবলতা দৃষ্ট হইয়াছিল।

এই দার্শনিক ধর্ম্মের আর এক ভাব আছে, তাহা বলে সকলই আত্মা। যাহাকে জড় বলিতেছ তাহা জ্ঞানবস্তু মাত্র, সুতরাং তাহাও আত্মার প্রকাশ। দর্শনের এই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এদেশীয় বৈদান্তিকগণ জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ অদ্বৈতবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। জড় ও আত্মা মূলে এক কি না, এ তত্ত্বের বিচারে চিন্তা ও সময়কে নষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। ইহা সকলেই জানে যে, অনাদি অনন্ত, স্বয়ম্ভু ও নিরপেক্ষ সত্তা, দুই দশটা,

বা ত্রিশ পঁচিশটা হইতে পারে না। আমরা ব্যবহারিক জ্ঞানে জড় ও চেতনকে যেরূপে দেখিতেছি, তন্মধ্যে দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ, জড় বলিলেই চেতন সেই সঙ্গে আছে ; চেতন বলিলেই জড় সেই সঙ্গে আছে। উভয়ে যখন পরস্পর সাপেক্ষ, তখন উভয়ের সত্তা নিরবলম্ব সত্তা নহে ; উভয়ের অন্তরালে, উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া, উভয়কে সম্ভব করিয়া আর কোনও সত্তা রহিয়াছে। সেই পরমার্থ সত্তা এক,জড় ও চেতন তাহা হইতেই উদ্ভূত, তাহারই প্রকাশ। ব্যবহারিক জগতে, অর্থাৎ সৃষ্টিলীলার মধ্যে কিন্তু জড় ও চেতন পরস্পর সাপেক্ষ, পরস্পর বিসম্বাদী অথচ পরস্পর-পোষক হইয়া রহিয়াছে। আমাদের পদদ্বয় সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করি। তিনি আমাদিগকে সত্তা না দিলে আমরা কিরূপে সৎ হইতাম, সুতরাং আমরা তাঁহারই আশ্রিত ও অনুগত জীব।

আর এক প্রকার ধর্ম্ম আছে, যাহাকে নৈতিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মহাত্মা বুদ্ধ এই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞেয়, তাঁহার পশ্চাতে ছুটিও না, যাহা বিচারের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে না, তাহাতে শক্তি পর্য্যবসিত করিও না ; যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা মানবজীবন শাসিত,যাহাকে প্রতিনিয়ত নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছ, তদুপরি পদদ্বয়কে স্থাপন কর ; পাপকে পরিহার কর, কারণ শাস্তি অনিবার্য্য ; পুণ্যকে আশ্রয় কর, কারণ পুণ্যের ফল অনুল্লঙ্ঘনীয়। এই মূল ভাব অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম আত্ম-পরমাত্ম বিচার বর্জ্জন করিয়া, চিত্তশুদ্ধি, অনাসক্তি, সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রভৃতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ইহার ফল এই হইল, যে বৌদ্ধধর্ম্ম ত্বরায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম পালনে পর্য্যবসিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত বিসম্বাদী ধর্ম্মভাব সকলকে অন্ধের হস্তী দর্শনের সহিত তুলনা করিবার কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য আছে। ঐতিহাসিক ধর্ম্মের মূল কথার মধ্যে কি সত্য নাই ? প্রাচীনকালে ঈশ্বর কি ঋষিগণের হৃদয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত করেন নাই ? বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রসকলে ঈশ্বরাভিব্যক্ত সত্য সকল কি সঞ্চিত নাই ? আমরা জগতের ঋষিগণের উক্তি সকল কি অবহেলার চক্ষে দেখিতে পারি ? তাহা কখনই

দেখিতে পারি না। জড়জগতে যেমন দেখিতে পাই যে, বৃক্ষের বীজটীকে বিকাশ করিবার জন্যই তাপ, বায়ু, আলোক প্রভৃতির বিধান, তেমনি তোমার আমার হৃদয়ে যে ধর্ম্মের বীজ রহিয়াছে, তাহাকে বিকাশ করিবার জন্যই সাধু ও শাস্ত্রের বিধান। এক একজন ঋষি ধর্ম্মের এক একটা মহৎ তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়া মানবজাতিকে উন্নতির মঞ্চের এক এক সোপানে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইটুকু সত্য।

এইরূপ পৌরাণিক ধর্ম্মের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে সত্য আছে। ঈশ্বর কালবিশেষে বা দেশবিশেষে মানবকুলের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা মিথ্যা
কথাটা মিথ্যা নয় অর্থাৎ মানবের মধ্যেই ঈশ্বর
নিহিত হইয়া রহিয়াছেন। দেব ও মানব এক সঙ্গেই বাস করিতেছেন। মানবকুলের মধ্যে যাঁহারা উন্নতাত্মা সাধু, তাঁহাদিগকে এক অর্থে ঈশ্বরাবতার বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ মানবের আত্মনিহিত ঈশ্বরের মঙ্গলভাব, পবিত্র ভাব তাঁহাদের চরিত্রে ফুটিয়াছে, তাঁহারা ঈশ্বরীয় ভাবের পরিচায়করূপে জগতে দাড়াইয়াছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের ভাব হৃদয়ে পাইয়াছে। তাঁহাদের চরিত্রে ঈশ্বরীয় শক্তি ঘনীভূত আকারে বাস করিয়াছে ও জগতে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অবতারবাদের এই সত্যটুকুকে অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম তাহাতে শাখা প্রশাখা যোজনা করিয়া প্রকাণ্ড ধর্ম্মমত সৃষ্টি করিয়াছে।

দাশনিক ধর্ম্মের মধ্যেও কি সত্য নাই? জগৎ কি কার্য্য কারণ শৃঙ্খলাতে আবদ্ধ নহে? ঈশ্বর কি আপনাকে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে বাঁধিয়া কার্য্য করিতেছেন না? জড় ও চেতন এই উভয় আবরণের মধ্যে থাকিয়া কি তিনি সৃষ্টিকে ধারণ করিতেছেন না? তবে তিনি কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার মধ্যে রহিয়াছেন বলিয়া ভাবিতে হইবে, যে তিনি সৃষ্টিকার্য্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাহা নহে। তিনি যদি আপনাকে নিয়মাধীন না রাখিয়া পৃথিবীর রাজাদিগের ন্যায় অব্যবস্থিতচিত্ত ও যথেচ্ছাচারী হইতেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সত্তার অধিক প্রমাণ পাইতাম বা তাঁহার মহত্ত্ব অধিক অনুভব করিতাম? বরং এই কথাই কি সত্য নহে যে, আমরা যে সর্ব্বাবস্থাতে তাহার অবিচলিত সংকল্পের উপরে নির্ভর করিতে পারি, ইহাতেই তাঁহার

মহত্ত্ব। আর এ কথাও কি সত্য নহে যে, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার জগৎ চালাই-বার কোনও শক্তি নাই। যে নিয়মে ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য চলিতেছে, সে নিয়ম এক, আর যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, সে শক্তি আর এক এরূপ নহে। উভয় নিয়মই সেই আদি শক্তির কার্য্যের প্রণালী মাত্র। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা যতই দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকুক না কেন, সেই শক্তি সর্ব্বত্র বিরাজিত। নবোদিত সূর্য্যালোকের প্রত্যেক স্ফুরণে সেই শক্তি, প্রবাহিত বায়ুসাগরের প্রত্যেক হিল্লোলে সেই শক্তি, অনন্ত প্রসারিত বিশ্বব্যাপী তাড়িত তরঙ্গের প্রত্যেক কম্পনে সেই শক্তি, উন্নত অশনির ঘোর নির্ঘোষে সেই শক্তি ধরা-বিদারী ভূকম্পের ঘন কম্পনে সেই শক্তি, তিনি আমাদিগকে সত্তা না মহানৃত্যে সেই শক্তি; আবার মানবচিন্তার প্রত্যেক বিকাশে সেই শক্তি, মানব-হৃদয়ের প্রত্যেক সুকোমল ও পবিত্রভাবে সেই শক্তি, সংক্ষেপে বলি, সেই শক্তির মহাপ্লাবনে, জলস্থল শূন্য, স্থাবর জঙ্গম, জড় ও চেতন সমুদয় প্লাবিত। ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তাঁহাকে দূরে রাখিয়া কার্য্য কারণ শৃঙ্খলাকে ভাবিবার উপায় নাই।

নৈতিক ধর্ম্মের মধ্যে কি সত্য আছে, তাহা অগ্রে আলোচনা করিয়াছি। মানবের সঙ্গে মানব-সমাজ বাঁধা, মানবের সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা, সুতরাং মানব-সমাজের সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা। নীতির সঙ্গে ধর্ম্ম বাঁধা, এই সত্য পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। নীতিকে ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করা সম্ভব নহে। কিন্তু যাহা অর্দ্ধেক, তাহাকে সম্পূর্ণ বলিলে যে ভ্রম হয়, কেবল মাত্র নীতিকে ধর্ম্ম বলিলে সেই ভ্রম হইয়া থাকে। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় নৈতিক ধর্ম্ম সেই ভ্রমেই পতিত হইয়াছেন।

অন্ধের হস্তীদর্শনের ন্যায় এই সকল ধর্ম্মের ভ্রমাংশ বর্জ্জন করিয়া সত্যাংশ যোড়া দিলে, পূর্ণাঙ্গ ধর্ম্মভাব পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক—এরূপ প্রণালীতে কেহ কখনও ধর্ম্ম লাভ করে নাই। প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্মের পথ ইহাও নহে। যেমন আলু পটল প্রভৃতি তরকারীর খোসা ছাড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া মশলা ও লবণ মাখাইয়া একত্র রাখিলেই তাহাকে ব্যঞ্জন বলে না; এ সকল পদার্থ ব্যঞ্জন-রূপে পরিণত হইতে আরও কিছু চাই, অগ্নির ক্রিয়া চাই; তেমনি প্রাচীন ও

বর্ত্তমানের সমুদয় ভাল কথা ও ভাল বিষয় বাছিয়া একত্র রাখিলেই তাহা ধর্ম্ম হয় না। আরও কিছু চাই,—অগ্নির ক্রিয়া চাই। ঈশ্বরের প্রেমানল যখন হৃদয়ে জ্বলে, জ্বলিয়া তাহাকে নব জীবন প্রদান করে, যখন প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত সত্য সকল প্রতিভাত হয়, তখনি তাহা পরিপক্ক হইয়া ধর্ম্ম-জীবনের আকার ধারণ করিতে পারে। বরং এই কথাই বলা উচিত, প্রকৃত ভগবৎপ্রেম একবার হৃদয়ে জন্মিলে পূর্ব্বোক্ত সত্য সকল স্বতঃই সে হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। জীবন্ত প্রেমই ধর্ম্মের উৎস।

মানব জীবনের একতা।

মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ মানবের মনোবৃত্তি সকলকে সমুচিতরূপে বিচার করিবার জন্য যতই কেন মানবাত্মাকে বিভিন্ন ভাগে বিভাগ করুন না; বাস্তবিক মানবাত্মার মধ্যে খণ্ড ভাব নাই, সেখানে অখণ্ড একতা। আমরা সচরাচর বলি, মানবাত্মা জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত। তাহার অর্থ এই নয় যে, গৃহস্থের বাড়ীতে যেরূপ অন্দর মহল, রান্না মহল, সদর মহল প্রভৃতি থাকে, তেমনি মানবাত্মাতে জ্ঞানের একটী মহল, ভাবের একটী মহল ও কার্য্যের একটী মহল আছে অথবা এক মহলের জিনিস যাহাতে অপর মহলে না যায়, আমরা এরূপ কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারি। বরং এ বিষয়ে এই কথাই সত্য যে, দুইটী জলাশয়ের জল যদি উচু নীচু থাকে, আর প্রণালী খনন করিয়া যদি তাহাদিগকে সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে যেমন উভয় জলাশয়ের জল সমান উচু হইয়া এক জলাশয়রূপে পরিণত হয়, তেমনি মানব-মনেরও সমতার দিকে গতি আছে। যাহা চিন্তাকে প্রগাঢ়রূপে অধিকার করে, তাহা ভাবরাজ্যে প্রবেশ করে; যাহা ভাবকে আশ্রয় করে, তাহা কার্য্যে পরিণত হয়; যাহা কার্য্য দিয়া প্রবেশ করে, তাহা ভাবরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা চিন্তাতেও যায়। মানবাত্মা বা মানব চরিত্রের মধ্যে আলি দিয়া কেহই তাহাকে দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত করিতে পারে না। মানবাত্মার মধ্যে সমতা-বিধানের একটী নিয়ম আছে, যাহাকে ইংরাজীতে law of adjustment বলা

যাইতে পারে। একটী সত্য যদি চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিয়া ভাল করিয়া বসিয়া যায়, তবে তাহা অপরাপর চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং সমগ্র চিন্তা-রাজ্যকে আপনার অনুসারে গঠন করিতে থাকে; তাহা ভাবের মধ্যে প্রবেশ করে ও ভাবকে আপনার অনুযায়ী করিতে থাকে। এইরূপে অনেক সময়ে সমগ্র প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে।

এই উক্তির প্রমাণ কি মানব-ইতিহাস কি ব্যক্তিগত জীবন, সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন যে,বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অদ্ভুত বিকাশ, রাজনীতির যে আশ্চর্য্য উন্নতি, সামাজিক ভাব সকলের যে অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে, সকলের মূলে সুপ্রসিদ্ধ মার্টিন লুথার প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কার। এ কথার যুক্তিযুক্ততা আমরা অনুভব করিতে পারি। যখন ইউরোপীয় জাতি সকল বিবিধ দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইয়া, মোহ-নিদ্রায় অভিভূত ছিল,—যখন রাজনীতি, গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সমুদয় নীতিই শাসন ও বাধ্যতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন লূথার দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন —"মানবের আত্মা স্বাধীন ভাবে নিজের মুক্তিবিষয়ক পরম তত্ত্ব সকলের বিচার করিতে সমর্থ,—সে বিষয়ে ধর্ম্মসমাজ বা ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যবর্ত্তিতার প্রয়োজন নাই।" এ কথাটী শুনিতে সামান্য কথা, কিন্তু ইহার ফল বহুদূর ব্যাপ্ত হইল। লোকে জাগিয়া চক্ষু খুলিয়া পরস্পরকে বলিতে লাগিল, সে কি কথা, মানুষ আপনার মুক্তিবিষয়ক পরমতত্ত্ব সকলের বিচার আপনি করিতে পারে? তবে কেন সমাজনীতি,রাজনীতি বিষয়ে সে বিচারশক্তিকে প্রয়োগ করিতে পারিবে না?" এইরূপে যে স্বাধীন বিচারশক্তি ধর্ম্মের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল, তাহাই দ্বিগুণিত উৎসাহ ও স্বাধীনতার সহিত লৌকিক বিষয়ে প্রযুক্ত হইল। তাহারই ফলে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়। লোকে বলিল—ধর্ম্মবিষয়ে যদি আমাদের বিচারে যাহা ভাল বোধ হয় তাহাই অবলম্বনীয়, তবে রাজনীতি বিষয়ে আমরা যাহা ভাল বলিয়া বুঝি, তাহাই করিতে হইবে। অমনি রাজনীতি বিষয়ে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইতে লাগিল। মানুষ অনেক বিচারের পর যে সকল সত্য হৃদয়ঙ্গম করিল, তাহা হৃদয়ে রাখিল, অর্দ্ধ শতাব্দী না যাইতে যাইতে তাহা দাবানলের ন্যায় হৃদয়পাত্রের সমগ্র চিন্তা ও সামাজিক সমগ্র ব্যবস্থাকে পরি-

বর্জ্জিত করিয়া ফেলিল। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ইউরোপীয় সমাজে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি আজ আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হন, তবে চমৎকৃত হইয়া দেখিবেন, সে ইউরোপ আর নাই। কিন্তু এই সুমহৎ পরিবর্ত্তন সকল স্থলে ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় বিবাদ, বিদ্রোহ, রক্তপাত করিয়া ঘটে নাই; নিঃশব্দ, নিস্তরঙ্গ বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ার গুণে ঘটিয়াছে। নবাবিষ্কৃত সত্য সকল দম্বলের ন্যায় কার্য্য করিয়া অনেক বিধি ব্যবস্থাকে বদলাইয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞান যখন মাথা তুলিল তখন ধর্ম্ম তাহাকে বাধা দিল, জোরে বসাইবার চেষ্টা করিল; বিজ্ঞান বসিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল, শেষে ধর্ম্ম বলিল, এস তবে আমরা কোলাকুলি করি, শত্রু না থাকিয়া পরস্পরের মিত্র হই; কিন্তু কোলাকুলি করিতে গিয়া ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; বিজ্ঞানের রং ধর্ম্মের গায়ে লাগিয়া ধর্ম্ম ও মানব-সমাজের মহাবিবর্ত্তন প্রক্রিয়ায় একটী অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। দেখ কেমন সাম্যবিধানের প্রক্রিয়া। কেমন law of adjustment। ইহা চিন্তা করিলে কি মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয় না? যে সকল সত্য ও যে সকল মত নির্ব্বাণ করিবার জন্য রোমানক্যাথলিক পুরোহিতগণ জীবন্ত মানুষ পোড়াইয়াছিলেন, জীবন্ত মানুষকে ঘৃত কটাহে ভাজিয়াছিলেন, দলে দলে গলে রজ্জু দিয়া মারিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন, মানববুদ্ধিতে যাতনা দিবার ও হত্যা করিবার যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, সমুদয় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্য ও সেই সকল মত এক্ষণে বিনা রক্তপাতে, বিনা বিবাদে, জনসমাজের চিন্তায় অস্থি মজ্জার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। নব সভ্যতা ও নব জ্ঞান যেন হাসিয়া বলিতেছে, তোমরা যে সকল সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এত রক্তপাত করিয়াছিলে, দেখ আমরা চক্ষে ধূলি দিয়া, বিনা রক্তপাতে সে সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছি।

বাস্তবিক ইহা চক্ষে ধূলি দেওয়ার ন্যায়। আমরা একটী সত্যকে প্রবলরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহার প্রভাবে বদলাইয়া যাই। কিন্তু বদলাইবার সময় বুঝিতে পারি না যে বদলাইতেছি। সামাজিক জীবনে যেরূপ, ব্যক্তিগত জীবনেও সেইরূপ। ইতিহাসবর্ণিত একটী চরিত্র অবলম্বন করা যাউক। মনে কর সেণ্টপল। ইহার পূর্ব্ব জীবনে ও পরবর্ত্তী জীবনে কি সুমহৎ প্রভেদ লক্ষিত হইয়াছিল! যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যেন শোণিতপিপাসু ব্যাঘ্রের

ন্যায় যীশুর শিষ্যগণের অনুসরণ করিতেছেন, বার্দ্ধক্যে তিনি যীশুর অনুগত শিষ্যরূপে ঘাতক-হস্তে প্রাণ দিতেছেন। উভয় ছবিতে কতটা প্রভেদ। কিন্তু এই প্রভেদ কিরূপে ঘটিল? প্রক্রিয়াটী স্বাভাবিক ও অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে। ষ্টিফেনকে হত্যা করিয়া যখন তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে ডামাস্কাসবাসী যীশু-শিষ্যদলকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে সেই নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটী কথা সত্যরূপে তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল, যাহা তিনি এতদিন দেখিয়াও দেখেন নাই। সে কথাটী এই,—যীশুই প্রাচীন য়িহুদী শাস্ত্রের বর্ণিত ঈশ্বর-প্রেরিত মেসায়া। এই বিশ্বাসটী যখন তিনি হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা বদলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি এতদিন ভাবিতেছিলেন, মেসায়া যিনি হইবেন, তিনি য়িহুদীরাজ হইবেন, তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদেশীয় রাজাদিগের হস্ত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবেন, তিনি লৌকিক সম্পদ ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিবেন। এখন বুঝিলেন, স্বর্গরাজ্য অন্তরে, তাহা আধ্যাত্মিকতাতে এবং যীশু সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি লৌকিক সম্পদ হইতে আধ্যাত্মিকতার উপরে গিয়া পড়িল; নিয়ম ও ক্রিয়াবহুল ধর্ম্ম হইতে উঠিয়া প্রেমের ধর্ম্মের উপরে স্থাপিত হইল। জীবনের আদর্শ যেমন বদলিয়া গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষাও বদলিয়া গেল। যে আগ্রহের সহিত তিনি য়িহুদীধর্ম্মের শত্রুদিগকে দলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই আগ্রহের সহিত তিনি নূতন প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার সমগ্র চিন্তা ও ভাবের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই জন্যই বলি, ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে যখন নব আদর্শ ও নব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, তখন তাহার প্রভাব মানব আত্মার বা মানব জীবনের এক বিভাগে আবদ্ধ থাকে না, সর্ব্ব বিভাগেই ব্যাপ্ত হয়। ঈশ্বর মানবাত্মা ও জগৎ এই তিনের স্বরূপ ও সম্বন্ধ বিষয়ক যে সকল সত্য, তাহা আমাদের সর্ব্ববিধ চিন্তার মূলে থাকে, এবং সর্ব্ববিধ চিন্তাকে অনুরঞ্জিত করে; সুতরাং সেই সকল সত্য বিষয়ে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহার প্রভাব আমাদের জীবনের সকল বিভাগেই পরিব্যাপ্ত হয়। তুমি যদি ঈশ্বরকে নির্গুণ সত্তামাত্র

বলিয়া বিশ্বাস কর, তাহা হইলে জীবনে এক প্রকার ভাব ঘটিবে, .আর যদি তাঁহাকে জ্ঞানক্রিয়া সম্পন্ন পুরুষরূপে জান, আর এক প্রকার ভাব ঘটিবে। ইহা স্বাভাবিক। প্রাচীন হিন্দুগণ এ জগতকে ও মানবজীবনকে কারাবাসের ন্যায় মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের সাধন যে প্রকার হইবে, যাঁহারা এ জগতকে করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার গৃহ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সাধন সে প্রকার হইতে পারে না। ইহা আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি।

এ সকল বিষয়ে যে এত বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা যাইতেছে, তাহার উদ্দেশ্য ইহা প্রদর্শন করা যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে যে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে কয়েকটী গুরুতর ও মৌলিক বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে, এবং সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যেই সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের বীজ নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন সাকারবাদের শিক্ষা এই ছিল, উপাস্য দেবতা বাহিরে। ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, উপাস্য দেবতা অন্তরে। প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজ হইতে দূরে, ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজে। প্রাচীন ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, নিয়ম বিধি ও বাহিরের ক্রিয়াই প্রকৃষ্ট সাধন প্রণালী; ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন, "প্রীতিঃ পরম সাধনং" প্রেমই প্রকৃষ্ট সাধন। এই তিনটী মহাসত্য মানব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়াতে লোকের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাই-তেছে। ঈশ্বর অন্তরে অর্থাৎ মানবের ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, একথা বলিলেই স্বাভাবিকরূপে এই কথা আসিয়া পড়ে যে, চিত্তশুদ্ধিতে তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে। সাধনক্ষেত্র জনসমাজে এ কথা বলিলে স্বভাবতঃ এই কথা আসিয়া পড়ে, গার্হস্থ্য ও সামাজিক ভাব সকলকে ধর্ম্মের প্রতিকূল বলিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে না, কিন্তু ধর্ম্মের সহায় জানিয়া পোষণ করিতে হইবে, এবং মানবসমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতিকে ধর্ম্মের সাধন-ক্ষেত্রের মধ্যে আনিতে হইবে। প্রীতিই ধর্ম্মের সাধন বলিলে এই কথা স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে যে, জগৎ ও মানবকে প্রেমের আলিঙ্গনের মধ্যে আনিতে হইবে। দেখ জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা কি আকার ধারণ করিল।

ঈশ্বর অন্তরে, মানবের সাধনক্ষেত্র জনসমাজ ও প্রীতিই প্রকৃষ্ট সাধন, এই তিনটী সত্য যদি আমরা ভাল করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তবে ইহার

প্রভাবেই ভাবী ভারতের ধর্ম্মজীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যে সকল সত্য ইহার প্রতিকূল, তাহা আপনাপনি খসিয়া পড়িবে। মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা বশতঃ, বিশেষতঃ ধর্ম্মভাবের রক্ষণশীলতা বশতঃ, অনেক সময়ে দেখা যায়, মানব জীবনের অপর সকল বিভাগে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াও ধর্ম্মমতের ও ধর্ম্মের আচরণের পরিবর্ত্তন ঘটে না। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগত যখন আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, তখন ধর্ম্মাচার্য্যগণ এক এক খণ্ড অন্ধকার বুকে ধারণ করিয়া পোষণ করিতেছেন। কিন্তু ইহা চিরদিন চলিতে পারে না। সাম্যবিধানের নিয়মানুসারে একদিন সমতা আসিবেই আসিবে। যিনি মানবকে উন্নতির মুখে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনিই মানব প্রকৃতিতে এই স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা দিয়াছেন। নতুবা অতীতের কিছুই থাকে না; মানব এক সময়ে বহু শ্রমে ও আয়াসে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। সকল বিভাগেই দেখা যায় বিবর্ত্তনের প্রক্রিয়া বড় ধীর গতিতে চলে। একজন রোগী ঘোর বিকারে আচ্ছন্ন ছিল, ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঔষধের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিকারের সকল লক্ষণ কি একেবারে কাটে? যখন ঔষধ কার্য্য করিতেছে, তখনও আমরা দেখিতে পাই, বিকারের কোন কোন লক্ষণ রহিয়াছে।

মানবাত্মা এক, ইহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মহল নাই। এ কথা বলিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। অনেক সময়ে মানুষ জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া সাধন করিয়া থাকে। মনে করে ধর্ম্ম আমার জ্ঞানে থাক, বা ভাবে থাক, অনুষ্ঠানে গিয়া কাজ নাই। আমি ধর্ম্মের উদার ও আধ্যাত্মিক মত জ্ঞানে ধারণ করিব, ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিব, কিন্তু অনুষ্ঠানে বিশ্বাসানুসারে আচরণ করিব না। এইরূপে মানুষ অনেক বিষয়ে জীবনের মধ্যে একটা আলি দিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করে; মনে করে কার্য্যের ফল জীবনের এক বিভাগেই বদ্ধ থাকিবে। তাহা থাকে না। একজন মনে করে, কর্ম্ম স্থানে যখন থাকিব, তখন মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি গণিব না, কিন্তু গৃহ-পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঠিক ব্যবহার করিব। তাহা ফলে দাঁড়ায় না। মানুষ প্রত্যেক আচরণের দ্বারা আপনাকে গড়ে। যে মিথ্যাচারী হয়, মিথ্যাচার নিবন্ধন তাহার প্রকৃতির এমন পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহাতে সর্ব্ববিভাগেই মিথ্যাচারী

হওয়া তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন "পাপকারী পাপো ভবতি" যে পাপাচরণ করে, তাহার প্রকৃতি পাপ হইয়া যায়। পাপাচরণের এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শাস্তি। যে ছুতার আজ জুয়াচুরি করিয়া আমার টাকাটি লইয়া কাজটি খারাপ করিয়া দিতেছে, সে মনে করিতেছে সে কি চালাক, আর আমি কি বোকা, কিন্তু সে যদি জানিত যে তাহার ঐ কার্য্যের দ্বারা আমার অপেক্ষা সে নিজেরই অধিক ক্ষতি করিতেছে, তাহা হইলে বোধ হয় সেরূপ করিত না। একটী পুরাতন উপমা দি। যেমন একজন ঔদরিকের প্রতিদিন গুরুতর আহার না যুটিতেও পারে, কিন্তু গুরুতর আহার নিবন্ধন উদরের যে পরিসর বাড়ে, সেটুকু থাকিয়া যায়, তেমনি আমাদের ভদ্রাভদ্র কাজের ফল স্বরূপ আমাদের প্রকৃতির মধ্যে এমন একটু পরিবর্ত্তন ঘটে, যাহা স্থায়ী হইয়া যায়। সেইটুকুই গুরুতর চিন্তার বিষয়।

অভয়-প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদের মধ্যে একটী বচন আছে, যাহাতে ঋষিগণ এক দিকে ঈশ্বরকে অরূপ, অনির্ব্বচনীয় বলিতেছেন, অথচ আবার পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, তাঁহাতে যে ব্যক্তি অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে আর ভয় প্রাপ্ত হয় না। সে বচনটী এই—

যদা হ্যেবৈষএতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে
ঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতোভবতি।

অর্থ—যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য, নিরবয়ব, অনির্ব্বচনীয়, নিরাকার পরব্রহ্মে নির্ভয়ে স্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত উভয় উক্তিকে একত্র পাঠ করিলে, আপাততঃ পরস্পর-বিসম্বাদী বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ঈশ্বরের যে কিছু স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সমুদয় নিষেধ মুখে। তিনি কিরূপ? না তিনি নিরবয়ব, অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার ইত্যাদি। ইহার প্রত্যেক শব্দই যেন ঈশ্বরকে মানব-হৃদয় হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধির অগোচরে স্থাপন করিতেছে। তৎপরে এই

প্রশ্ন সহজেই উঠে, যিনি ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির অগোচরে রহিলেন, তাঁহাতে মানবাত্মা অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে কিরূপে? এ বিষয়ে মানবের জ্ঞান ও হৃদয়ের প্রীতি উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে। জ্ঞান অসীমতা দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পারে; কিন্তু হৃদয় ধরিবার, ছুঁইবার, সম্ভোগ করিবার মত জিনিস চায়। এইজন্য সর্ব্বদেশেই ও সর্ব্বাবস্থাতেই নারীহৃদয় সূক্ষ্ম সত্য অপেক্ষা স্থূল মানুষকে বেশী ভাল বাসে। প্রেমের স্বভাব তাহা প্রতিদান-প্রয়াসী। যেখানে প্রতিদান নাই, সেখানে প্রতিদানের কল্পনা করিয়াও সুখী হয়। প্রেম যদি প্রেমকে ধরিতে না পারে, তবে তাহা ভাল করিয়া জাগে না। একটী অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যযুক্ত, পাষাণ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা একটী জীবন্ত কুকুরও ভাল, কারণ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাহার প্রেমোজ্জ্বল চক্ষুদুটী দেখিতে পাই। এই যদি মানব-হৃদয়ের ধর্ম্ম হয়, তবে যাঁহার বিষয়ে এই মাত্র বলা যাইতেছে, যে তিনি অদৃশ্য, অরূপ, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার, তাঁহাকে লইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে কিরূপে? তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয় দাঁড়াইবে কিরূপে? আর যদি হৃদয় না দাঁড়াইল, তবে প্রাণে অভয় ভাব আসিবে কিরূপে?

কোনও কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের অনন্ত ভাব মানব মনে প্রবল হওয়াতেই অবতারবাদের সৃষ্টি করা প্রয়োজন হইয়াছিল। যিনি জ্ঞানবুদ্ধির অতীত, যিনি অদৃশ্য, অচিন্ত্য, অগ্রাহ্য তাঁহাকে লইয়া আমরা কি করিব? আমরা এমন ঈশ্বর চাই, যিনি আমাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, যাঁহাকে ভয়ে বিপদে ধরিতে পারি; তাঁহাতে অনন্ততা থাকে থাক, সে অনন্ততাকে কিয়ৎপরিমাণে আবৃত করিয়া আমাদের মত হইয়া আমাদের কাছে না আসিলে, আমরা কিরূপে ধরিব? রাজ রাজেশ্বর পিতা ক্ষণকালের জন্য রাজ সম্পদ ও রাজ ভাব ভুলিয়া যদি শিশুত্ব প্রাপ্ত না হন, তা হইলে কি তাঁর শিশু সন্তান তাঁহার সঙ্গে খেলিতে পারে? এরূপ ভাব হইতেই অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। জ্ঞান যখন ঈশ্বরকে দূরাৎ সুদূরে স্থাপন করিল, তখন প্রেম তাঁহার মঙ্গল ভাবের সূত্র ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে ধরাধামে নামাইল, বলিল, করুণাময় করুণা করিয়া ভূভার হরণ করিতে আসিলেন।

এই উক্তির মধ্যে কিছু যুক্তি থাকিতে পারে। ঈশ্বরকে মানব হৃদয় হইতে দূরে লইয়া গেলেই প্রেম মরিয়া যায়। তবে ঋষিগণ এরূপ বাক্য কেন বলি-

লেন? আর এক দিকে ইহার গভীর অর্থ আছে। মানুষকে এই কথা বলা— তুমি একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ যে অনন্তশক্তির ক্রোড়ে ব্রহ্মাণ্ড শায়িত, যে শক্তির দ্বারা চরাচর বিধৃত, তুমিও সেই শক্তির ক্রোড়ে শায়িত ও তদ্দ্বারাই বিধৃত হইয়া রহিয়াছ, তবে কেন ভীত হও? অসীম গগনে কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত গ্রহ নক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ রহিয়াছে, কৈ একদিনও ত ভয় কর না, পাছে তাহারা পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তবে কেন নিজের বিষয়েই এত ভীত হও? যে শক্তি বা যে জ্ঞান লক্ষ লক্ষ সূর্য্যকে স্বীয় কক্ষে রাখিতেছে, তাহা কি তোমাকে রাখিতে সমর্থ নয়?

ইহার উত্তরে মানব বলিতে পারে, চন্দ্র সূর্য্য ত স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট কক্ষ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদীয় প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহার দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে, আমি যে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষ হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারি, এইখানেই আমার ভয়ের কারণ। ইহার উত্তরে ঋষিগণ বলিতেছেন—"তুমি একবার অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ কর, তাহা হইলে তোমারও ভয় থাকিবে না।" অর্থাৎ তুমি একবার সেই মহাসত্যকে জ্ঞানে ধারণ করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হও।

এই প্রতিষ্ঠা শব্দটির অতি গভীর অর্থ। মানুষ কখন স্থির ভাবে দাঁড়াইতে পারে ও কিসের উপর দাঁড়াইতে পারে? যাহা চঞ্চল তাহার উপরে কি মানুষ স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে? পদতলের মৃত্তিকা প্রতি মুহূর্ত্তে সরিয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে কি দাঁড়াইতে পারে? নদীর চর, যাহা আজ উত্তরতীরে উঠিয়াছে, আগামী বর্ষে তাহা দক্ষিণতীরে উঠিতে পারে, তদুপরি কি কেহ পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারে? পাখী যখন বাসা বাঁধে, তখন কিরূপ স্থান অন্বেষণ করে? যেখানে মানুষ সর্ব্বদা গতায়াত করিতেছে, তাহাকে একটু সুস্থির হইয়া বসিতে দেয় না, এরূপ স্থানে কি কুলায় নির্ম্মাণ করে? তাহা করে না, সে নিভৃত, নিরুপদ্রব স্থান অন্বেষণ করে। চঞ্চলতার মধ্যে একটা পাখীরও বাসা বাঁধা হয় না, আর চঞ্চলতার মধ্যে কি মানব-জীবনের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হইতে পারে? অতএব মানবজীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অবিনশ্বর সত্যভূমি চাই, আত্মার প্রতিষ্ঠা ভূমিস্বরূপ যে পরমাত্মা, তাঁহাকে ভাল করিয়া ধরা চাই। তৎপরে তাঁহার স্বরূপ যে ধর্ম্ম তাহার সহিত একীভূত

হইয়া তাঁহার ইচ্ছার অধীন হওয়া চাই। তাঁহার ধর্ম্ম নিয়মের সহিত একীভূত হওয়া ও স্বভাবে বাস করা চাই। যে স্বভাবে বাস করে ব্রহ্মাণ্ডপতি তার রক্ষক। বৃক্ষটী ত মাথা তুলিবার সময়ে ভাবে না, আমার রক্ষার কি হইবে? যতক্ষণ সে স্বভাবে আছে ততক্ষণ তার রক্ষার ব্যবস্থাও আছে। পৃথিবীর রস, সূর্য্যের তাপ, আকাশের বায়ু তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে দুইটী পাতা বাহির করিয়া মাথা তুলিয়া উঠিতে না উঠিতে, ইহারা আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে, ফুটাইয়া তুলিতেছে, পূর্ণতালাভে সহায়তা করিতেছে। তেমনি মানুষ যদি স্বভাবে বাস করে, যদি হৃদয়টি পবিত্র রাখিতে পারে, যদি জগতের প্রতি প্রেম ও মানবের প্রতি প্রেমকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, যদি সমুদয় অভদ্রভাবকে বর্জ্জন ও ভদ্রভাবকে পোষণ করিতে পারে, তাহা হইলে সে নির্ভয়চিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত শক্তির ক্রোড়ে বাস করিতে পারে। কারণ জগতের মঙ্গল বিধানে বৃক্ষের ন্যায় তাহার আত্মারও রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

যেখানে স্বভাবের ব্যতিক্রম, সেইখানেই দুঃখ; সেইখানেই ভয়। তোমার হাতখানি পাইয়াছ কাজ করিবার জন্য। দেখ কেমন ব্যবস্থা, হাতগুলির উপরে মাংসপেশীগুলি, সবই কার্য্যের অনুকূল। পড়িয়া বা আঘাত পাইয়া আজ হাতখানি ভাঙ্গিয়া ফেল, স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটাও, আর আরাম বা শান্তি থাকিবে না, উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে ব্যথা লাগিবে, ভয় হইবে পাছে আঘাত পাও। হাতখানি যতক্ষণ সুস্থ অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ না হয়, ততক্ষণ অপর অঙ্গগুলিও স্বচ্ছন্দে কাজ করিবে না, সর্ব্বদাই যেন বলিবে আমাদের একজন যে ভাঙ্গিয়া রহিল, কিরূপে নিরুদ্বেগে কাজ করি। সেইরূপ ভিতরের প্রকৃতিতে যদি স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটাও দেখিবে, আরাম, শান্তি, নির্ভয়ভাব থাকিবে না। ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করা একখানা হাত বা পা বা মেরুদণ্ডটা ভাঙ্গিয়া ফেলার ন্যায় স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটান। যতক্ষণ ঈশ্বরেচ্ছার সহিত বিচ্ছেদটা থাকে, ততক্ষণ শান্তি থাকে না। ভাঙ্গা হাতখানা বাঁকিয়া থাকার ন্যায় অন্তরের প্রকৃতির কোথাও যেন কি একটা ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া থাকিয়া যায়, যে জন্য সুস্থ ও সুখী হইয়া ধর্ম্মনিয়মে দাঁড়াইতে পারে না, কাজ করিতে পারে না। যখন সেই বিচ্ছেদ দূর হয়, তখনই আত্মা প্রতিষ্ঠালাভ করে, নিরুপদ্রবে দাঁড়ায়।

ইহার পর আত্মা স্বভাবে বাস করে, স্বাভাবিকরূপে বাড়িতে থাকে। মহাত্মা যীশু এরূপ জীবনকে জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। জলপার্শ্বে রোপিত বৃক্ষ যেমন স্বাভাবিক ভাবে বাড়ে এবং তাহার সরসতা যেমন কথনই নষ্ট হয় না, তেমনি এরূপ জীবনও স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ে এবং তাহার সরসতা চিরদিন থাকে।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে প্রাচীন কালের সহিত আমাদের গুরুতর মতভেদ জন্মিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেন, মানুষ ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই পড়িয়া রহিয়াছে। মানবপ্রকৃতিকে বাধা দিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তবে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। কুকুরকে এক মুঠা অন্ন দিয়া যদি কেহ একগাছি যষ্টি লইয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে, তবে সে যেরূপে আহার করে, একগ্রাস খায় আর ভয়ে ভয়ে চায়, আমাদিগকে যেন তেমনি করিয়া জীবনের সুখসম্ভোগ করিতে হইবে, কখন কি অপরাধ হইয়া যায়। এই দেহটাকে এদং দৈহিক সমুদয় ভাবকে ঘৃণা করিতে হইবে, জগতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্মসাধনের ভাব এ প্রকার নহে। আমরা বলি তুমি স্বভাবে থাক, ঈশ্বরের হস্তে বাস কর, ধর্ম্মের আদেশের বশবর্ত্তী থাক, ঈশ্বর-প্রেম ও মানবপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর, তোমার পক্ষে সকল দিকেই কল্যাণ। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সকলি তোমার উন্নতির সহায়তার জন্য। তোমার মনে যদি পাপ না থাকে, তোমার অভিসন্ধিতে যদি মলিনতা না থাকে, তুমি ভয় করিবে কেন? তুমি যেখানেই থাক, তুমি বাড়িবে, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন। কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর, প্রভু, প্রভু, বলিলে ধর্ম্ম হয় না, তাঁহার এই রক্ষিণী শক্তিতে বিশ্বাস রাখিতে হয়। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে দেহটা আছে, ইহা যেমন জান, তাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মাটি আছে ইহাও তেমনি জানিতে হয়। ঈশ্বর করুন, যেন এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর আমরা তাঁহাতে স্থাপন করিতে পারি।

ধর্ম্মে আত্ম-প্রবঞ্চনা।

যাহারা বাল্যকালে ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়, উত্তর কালে সুখ সৌভাগ্যের মুখ দেখিলেও,সম্পদ ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে লালিত হইলেও, তাঁহাদের চরিত্রের অন্তস্তলে এমন একটা সুদৃঢ়চিত্ততা ও সাহসিকতা থাকে, যে কোনও বিপদে তাঁহাদিগকে ভীত বা বিচলিত করিতে পারে না। যে সকল বিপদ বা পরীক্ষাতে অপর ব্যক্তিগণ দমিয়া যায়, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, সে সকল বিপদে তাঁহারা পা দুখানা শক্ত মাটীতে স্থির রাখেন, ও ধীরভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন। স্বদেশ বিদেশে যত মহাত্মা দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের জীবনে এই লক্ষণ দেখা গিয়াছে।

ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, প্রতিদিন ব্যায়াম করা যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহাদের দেহের মাংসপেশী সকল যেমন সবল ও দৃঢ় হয়, তেমনি প্রতিদিন সহস্র প্রকার বিঘ্ন ও সংগ্রামের মধ্যে যাঁহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাঁহাদের চরিত্রের পেশী সকলও দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। একটী বিপদকে অতিক্রম করিতে পারিলে, আর দশটী বিপদকে লঘু জ্ঞান করিবার উপযুক্ত সাহস জন্মে। এইরূপ বার বার বিপদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বার বার তাহাকে অভিভূত করিয়া আর বিপদকে বিপদ জ্ঞান হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত প্রতিদিন জলপথে গতায়াত করিবার সময়ে দেখা যাইতেছে। যে সকল ব্যক্তি সৌধমালা সমাকীর্ণ ও প্রশস্ত রাজপথ সুশোভিত রাজনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেখানেই বর্দ্ধিত হইয়াছে, কখনও একটী নদীর মুখ দেখে নাই, কখনও একখানি নৌকাতে পদার্পণ করে নাই, তাহাদিগকে যদি ঘটনাক্রমে কোনও দিন নৌকাতে আরোহণ করিতে হয়, এবং জলপথে যাত্রা করিবার সময় সামান্য সায়াহ্নিক বায়ুর আঘাতে জল যদি একটু কম্পিত হয়, তাহা হইলে সেই সহুরে লোকদিগের মনে কি ভীতির চিহ্নই দেখা যায়! "ও মাঝি নৌকা দোলে কেন, ও মাঝি নৌকা দোলে কেন" করিয়া মাঝিকে অস্থির করিয়া তোলেন। তখন যদি সে নৌকাতে এমন কেহ থাকেন, যিনি প্রতিদিন নৌকাতে গতায়াত

করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অকারণ ভয় দেখিয়া বিরক্ত হইতে থাকেন। মাঝিদিগের মধ্যে আবার কাঁচা মাঝি ও পাকা মাঝি আছে। পদ্মা প্রভৃতি নদীতে সময়ে সময়ে এমন মাঝি দেখা যায়, মাঝিগিরি যাহাদের নিত্য-কর্ম্ম নয়, জীবিকার উপায় নয়। যাহারা বৎসরের অধিকাংশ দিন ক্ষেতে কৃষিকার্য্য করে, যখন কৃষিকার্য্য না থাকে, তখন নৌকা লইয়া মাঝিগিরি করিবার জন্ত বাহির হয়। ইহারা কাঁচা মাঝি। সেই সকল নদীর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের লোকগণ, যাঁহারা নৌকা চিনেন, তাঁহারা পারতপক্ষে কাঁচা মাঝির নৌকাতে পদার্পণ করেন না। কাঁচা মাঝির নৌকাতে উঠিয়া পথে যদি বিপত্তি ঘটে, যদি ঝড় ঝটিকা উপস্থিত হয়,তবে তাহারা সামলাইতে পারে না। নিজেরাই ভয়ে অস্থির হইয়া যায়। আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন করিয়া শন্ শন্ রবে বায়ু হাঁকিয়া আসিতেছে, আরোহিগণ ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"ও মাঝি ঐ যে ঝড় এল, কি হবে?" মাঝি বলিতেছে—"বদর! বদর! তাই ত বাবু বড় বেগতিক দেখ্ ছি।" সকলেই অনুমান করিতে পারেন, এরূপ মাঝির নৌকাতে বসা কি নিগ্রহের ব্যাপার। পাকা মাঝির কথা ও ব্যবহার অন্ত প্রকার। সে হয়ত বাল্যকাল হইতেই নিজ পিতার নৌকাতে দাঁড়িগিরি করিয়া আসিতেছে, পরে সে যৌবনের প্রারম্ভে নিজের নৌকা করিয়া মাঝির কাজ করিতেছে। হিন্দু গৃহস্থ যেমন আপনার গাভীটীকে যত্ন করে তেমনি সে আপনার নৌকাখানিকে যত্ন করিয়া থাকে। জীবনে সে বহু বহু বার ঝড়ে নৌকা বাঁচাইয়াছে, অনেকবার জলে ডুবিয়া বাঁচিয়াছে, কোন্ মেঘে কিরূপ ঝড় উঠে, কোন্ ঝড়ে নদীর কি অবস্থা হয়, কোন্ অবস্থাতে নৌকাকে কিরূপ রাখিতে হয়, সে সমুদয় উত্তমরূপ জানে। সুতরাং কোনও আকস্মিক বিপদে তাহাকে ভীত বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিতে পারে না। সে বলিল—"বাবু স্থির হয়ে বসো, ভয় নাই।"

কাঁচা মাঝি ও পাকা মাঝিতে এই প্রভেদ। মানবচরিত্রের শিক্ষা দুই প্রকারে হয়, চিন্তাগত শিক্ষা ও কার্য্যগত শিক্ষা। সামরিক বিদ্যালয়ে কতক গুলি যুবক পড়িতেছে, কিরূপে শিবির স্থাপন করিতে হয়, কিরূপে কেল্লা দখল করিতে হয়, কিরূপে পরিখা খনন করিতে হয়, কিরূপে অল্প সংখ্যক সেনা লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্তের সম্মুখীন হইতে হয়, ইত্যাদি যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে অবশুজ্ঞাতব্য

বিষয় সকল তাহারা শিখিতেছে। সুচারুরূপে সমর কার্য্য চালাইতে হইলে, এ সকল বিষয় জানা যে অতীব আবশ্যক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে কর তাহারা গৃহে সামরিক বিদ্যা শিখিয়াই জীবন কাটাইল, জীবনের মধ্যে একবার যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইল না; দুইটা গোলাগুলির আওয়াজ শুনিল না। বল দেখি তাহাকে কি তোমরা বীর বলিবে? যদি একটা মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়, এরূপ লোকের হাতে কি সেনাপতিত্বের ভার দিবে? কখনই নহে। যে সৈনিক পুরুষ অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছেন, অনেক গোলাগুলি খাইয়া বাঁচিয়াছেন, অনেক সঙ্কটে অনেক সাহস ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, অনেক কেল্লা দখল করিয়াছেন, অনেক সংগ্রামে বীরখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তখন এরূপ ব্যক্তিরই প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়িবে।

অতএব দেখিতেছি মানব-চরিত্রের প্রধান শিক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে। কাজে হাত না দিলে মানুষ গড়ে না। রণক্ষেত্রে না গিয়া মানুষ যদি বীর হইতে পারিত, তবে দাবা খেলিয়া অনেকে রণনৈপুণ্য শিখিতে পারিত, কারণ দাবা খেলাতেও লোকে রাজা, মন্ত্রী, অশ্ব, গজ, লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকে। কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া কিছুই গড়ে না। কল্পনার মঞ্চে বসিয়া ভীরু ক্ষণকালের জন্য সাহসীশ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কৃপণ ও দীনসত্ত্ব ব্যক্তি বদান্যবর হইয়া বসিতে পারে, নীচ ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত জন পবিত্রচেতা সাধুর পদ অধিকার করিতে পারে, কিন্তু কাজের সহিত, প্রকৃত ঘটনার সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলেই ইহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন দেখি, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে তরবারির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিতেছিল, আমি একাকী এই তরবারির সাহায্যে দশজন আততায়ীকে ফিরাইতে পারি, তাহার বুক 'চোর চোর' শব্দ শুনিয়াই দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছে, যে ব্যক্তি উপাসনা কালে ঈশ্বরকে বলিতেছিল, "এই লও আমার প্রাণ মন, এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন", যখন ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের জন্য পাঁচটী টাকা দিবার প্রস্তাব আসিল, তখন সে দেখিল টাকা তার কলিজার সঙ্গে এমনি বাঁধা যে টাকাতে টান দিলে তার কলিজাতে টান পড়ে; এইরূপ কার্য্যগত জীবনের সংঘর্ষণে সমুদায় কল্পনাময় ভাব উড়িয়া গেল।

কল্পনা ধর্ম্মপথের যাত্রীদিগকে পদে পদে প্রবঞ্চনা করিতেছে। কল্পনা এমনি গূঢ় শত্রু যে ইহা সূক্ষ্মভাবে ঈশ্বরোপাসনার মধ্যেও প্রবিষ্ট হয়, আমরা

লক্ষ্য করিতে পারি না। আমরা যখন উপাসনা করিতে বসি, তখন একটা কল্পিত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করি। এই যেন আমার প্রভু আমাকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, এই যেন তাঁহার প্রেমদৃষ্টি আমার উপরে রহিয়াছে, এই যেন তিনি আমার প্রার্থনা শুনিতেছেন; এইরূপে "এই যেন" "এই যেন" করিতে করিতে মন এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে সেই সময়ের জন্য প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভাবোদয়, আশা, আনন্দ, আত্মসমর্পণ, সৎসঙ্কল্প, প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মের লক্ষণ বিকাশ হয়, কিন্তু তাহা আর কার্য্য ভূমিতে অবতরণ করে না। কার্য্য-কালে যাহা প্রকৃতিগত, যাহা অভ্যাসপ্রাপ্ত, যাহা শিক্ষাজাত, তাহাই আসিয়া পড়ে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের পথে কল্পনাজাত এই আত্মপ্রবঞ্চনার বিপদটা কিছু অধিক। তাঁহারা কল্পনাপ্রসূত ভাবময় উপাসনা করিয়া ভাবিতে পারেন, ধর্ম্মসাধন ত হইল। তৎপরে কার্য্যগত উপাসনার প্রতি উদাসীন হইতে পারেন; জ্ঞানোন্নতি, হৃদয়মনের শাসন, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, স্বার্থনাশ, উদ্যোগ, শ্রমশীলতা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে উপেক্ষা বুদ্ধি জন্মিতে পারে।

এই বিপদ যাঁহাদের পথে আছে, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাজে হাত না দিলে মানুষ গড়ে না। আর ইহাও নিশ্চিত যে মৌখিক উপাসনা অপেক্ষা কার্য্যগত উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরকে সমুচিত সম্মান করা হয়। যে ব্যক্তি মুখে বলিতেছে প্রভু, প্রভু, কিন্তু জীবন রাখিতেছে নিজের সেবায়, তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি মুখে প্রভু প্রভু বলিতে লজ্জা পাইতেছে, কিন্তু প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রতিদিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও মহৎ কার্য্যকে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কি অধিক প্রশংসনীয় নয়?

জীবনকে সুসংযত, সুনিয়মিত ও সমুন্নত করিয়া ঈশ্বরোপাসনার উপযোগী হইবার চেষ্টা করাই উপাসনার প্রকৃত আয়োজন। এই আয়োজন করিতে করিতে কখনও কখনও জীবন কাটিয়া যায়। তাহাতে দুঃখ কি? অনন্ত জীবন সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। অনেক সময়ে জগতের লোকে এ সংগ্রাম দেখিতে পায় না, তাহাতে দুঃখ কি? প্রেমাস্পদের জন্য এই সংগ্রাম একচিন্তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। অনেক সময়ে এরূপ স্বাভাবিক সাধনকে লোকে সাধন

বলিয়াই মনে করে না, তাহাতে দুঃখ কি? লোকের নিকট সাধক নাম কিনিয়া ফল কি? যাঁহার দিকে চাহিয়া এই সংগ্রাম, তাঁহার প্রসাদ কি যথেষ্ট নয়? এক দিকে কল্পনাময় স্বপ্ন, অপর দিকে কার্য্যগত হিতবাদ, এই উভয়ই বর্জ্জন করিতে হইবে। কল্পনাময় স্বপ্ন কেবল ভাব লইয়া সন্তুষ্ট থাকে, বলে কার্য্যে কিছু নাই বা করিলাম, কার্য্যগত হিতবাদ বলে, যাহা জগতের কোনও কাজে আসে না তাহা করিয়া ফল কি? এই হিতবাদের ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, মানুষ বলে—"চক্ষু মুদিয়া দুই ঘণ্টা বসিয়া উপাসনা করিয়া ফল কি? সে সময়টা দুর্ভিক্ষের চাঁদা সংগ্রহ করা কি ভাল নয়? কল্পনাময় স্বপ্ন ও কার্য্যগত হিতবাদ এই উভয়ের মধ্যে আর একটা ভাব আছে, সেটা মনুষ্যত্ব লাভ, অর্থাৎ এই ভাব যে আমি একজন মানুষ, আমি আপনি এখানে আসি নাই, ঈশ্বর আমাকে এখানে রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে যে সকল শক্তি-সামর্থ্য দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী। কেহ দেখুক না দেখুক, আমাকে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে, আমি যে জ্ঞানালোচনা করি বা কর্ত্তব্যসাধন করি বা জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হই, তাহা মনুষ্যত্ব লাভের জন্য, আমার জীবনকে সফলতা দিবার জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা সম্পাদনের জন্য। ঈশ্বরেচ্ছার সুদৃঢ় ভূমিতে জীবনকে দাঁড় করাইতে না পারিলে, জীবন কথনই সুনিয়মিত ও সুপরিচালিত হইতে পারে না। ঈশ্বর করুন, সর্ব্বপ্রকার আত্ম-প্রবঞ্চনা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আমরা তাঁহার ইচ্ছার উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

ঈশ্বরের কাজ ও মনুষ্যের কাজ।

বাইবেল গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, যীশুর দেহান্ত হইলে, তাঁহার প্রেরিত-শিষ্যগণ যখন উৎসাহের সহিত নব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রাচীন য়িহুদী সমাজের দলপতিগণ তাঁহাদিগকে বিবিধমতে নির্যাতন করিতে লাগিলেন। একবার তাঁহাদিগকে ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা কোনও অদ্ভুত উপায়ে কারাগার হইতে বাহির হইয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আপনাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে য়িহুদীসমাজের নেতৃগণ এতই বিরক্ত হইলেন যে, তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার মানসে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সেই মন্ত্রণা সভাতে গামালিয়েল নামে একজন প্রাচীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তি সমাসীন ছিলেন। দেশ মধ্যে পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। তিনি সমবেত য়িহুদী মণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, ইহারা যে কাজ করিতেছে তাহা যদি মানুষের কাজ হয়, তবে ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আর যদি ঈশ্বরের কাজ হয়, তোমরা ইহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না, বরং সতর্ক থাক যেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন না কর।"

ইহাতে ইহাই বুঝিতেছি যে, মানুষ ধর্ম্মার্থে যে কাজ করে তাহাতে মানুষের কাজ থাকে, ঈশ্বরের কাজও থাকে। এই উভয়ের প্রভেদ নির্ণয় করা যায় কিরূপে? সংক্ষেপে এই বলা যায়, ক্ষুদ্র পার্থিব অভিসন্ধিতে যে কাজ কৃত হয়, তাহা মানুষের কাজ, আর বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রীতির দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারই আদেশে যে কাজ কৃত হয় তাহা ঈশ্বরের কাজ। ধর্ম্মের নামে কোন অনুষ্ঠান করিলেই যে তাহা ধর্ম্ম কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত তাহা নহে। চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এ জগতে মানুষের শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর পশ্চাতে অথবা বৈরাগ্য, স্বার্থনাশ, নরসেবা প্রভৃতির পশ্চাতে অনেক সময় সামান্য প্রশংসাপ্রিয়তা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এদেশে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চড়ক সংক্রান্তির সময়ে লোকে স্বীয় পৃষ্ঠদেশ লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া যে

রঙ্গকর্ণাছে ঘূর্ণিত হইত, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতি বৎসর শত শত বিধবা নারী যে পতির অগস্ত চিতায় পুড়িত,অত্যাপিও যে নানাদেশে শত শত বীর পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে কামানের মুখে প্রাণ দিতেছে, এই সকল কার্য্যের মূলে বহু বহু স্থলে অলক্ষিত প্রশংসা-প্রিয়তা ব্যতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

এ সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। কোন কোন মানুষের প্রকৃতি এভাবে গঠিত যে, তাহাতে চতুর্দ্দিকের মানবকুলের মনের ভাব সহজে প্রতিফলিত হয়। এই সকল মানুষের জীবন অনেক সময়ে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত রঙ্গভূমির অভিনয়ের মত হইয়া যায়। ইহারা চিন্তা বা কাজ করিবার সময় অপরের দৃষ্টি ভুলিয়া চিন্তা বা কাজ করিতে পারেন না। ভাবিতে বসিলেই লোকে কি চায় তাহাই তাঁহাদিগের মনে হয়; কাজ করিতে গেলেই কিরূপ কাজ করিলে লোকের প্রিয় হওয়া যায়, তাহাই মনে আসে; এবং সেই চিন্তা তাঁহাদের কাজকে নিয়মিত করে। ইহার অর্থ এ নয়, যে লোক কি চাহিতেছে এবং কিরূপে তাহা দিতে হইবে, ইহা বেশ পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়া তাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অনেক সময় চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকের ভাব তাঁহাদের নিজের অলক্ষিতভাবেই তাঁহাদিগের কার্য্যকে অনুরঞ্জিত করে। তন্ময়তা শক্তির প্রভাবে তাঁহারা লোকের ভাবের সহিত এরূপ একীভূত হইয়া যান যে, লোকে যাহা ভাল বলে, লোকে যাহা চায়, তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ে আসে, হৃদয়ে কার্য্য করে। এই সূক্ষ্ম প্রশংসাপ্রিয়তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতীব কঠিন।

তৎপরে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, মানুষের গূঢ় স্থানে কোন একটী গূঢ় আসক্তি বা গূঢ় দুর্ব্বলতা থাকে। মানুষ যাহাই করুক, সেটীকে অতিক্রম করিতে পারে না। তদ্বিরুদ্ধ কোনও সাধন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না সে যে কিছু অনুষ্ঠান করিতে যায়, ভিতরের সেই জিনিষটী প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার গতিকে নিয়মিত করে। তখন গতি সোজা যাইতে যাইতে সেই দিকে বাঁকিয়া যায়। সে যখন ভাবিতেছে আমি ঈশ্বরের জন্ত সকলি করিতেছি, সবই দিতেছি,তখন বস্তুতঃ তাহার গতি সেই ভিতরকার জিনিসটুকুকে বাঁচাইয়া চলিতেছে। একজন অর্থকে বড় প্রিয় জ্ঞান করেন, ঐটী তাঁহার বিশেষ আসক্তি। তিনি ধর্ম্ম সাধনার্থ বা ধর্ম্মসমাজের সেবার্থ যাহা কিছু করিতে যান,

ঐ জিনিষটী বাঁচাইয়া করেন, এমন কাঁচা মাটিতে পা দেন না, যাহাতে ঐ, জিনিসটীর ক্ষতি হইতে পারে। ঐ স্থানে তাঁহার বড় কর্ম্ম, বড় বড় প্রস্তাব ছোট ছোট হইয়া যায়। তিনি হয়ত বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার বড় কাজ ছোট হইয়া যাইতেছে, মানুষের চক্ষে ছোট দেখাইতেছে। কিন্তু তাহার ফল ছোট হয়। তিনি যাহা চান কখনই তাহা দাঁড়ায় না।

এই জন্য বলি, ঈশ্বরের এই সত্যময় রাজ্যে মানুষ যাহা নয়, তাহা করিতে প্রয়াস পাওয়া ঘোর বিড়ম্বনা। তোমার দৃষ্টিটা ছোট, স্বার্থের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলেই তোমার দৃষ্টির সীমান্ত রেখা সঙ্কীর্ণ হয়, তোমার পক্ষে ধর্ম্ম-রাজ্যে মস্ত একটা কিছু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার প্রয়াসমাত্র।

ধনাসক্তির ন্যায় ক্ষমতা বা প্রভুত্বের প্রতিও একটা আসক্তি আছে। দশজন আমার কথাতে চলে, আমি মনে করিলে একটা কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারি, লোকে আমাকে কৃতী ও বাহাদুর বলিয়া জানে, দশজনে আমাকে জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া সম্মান করে, এই চিন্তাতে মানুষকে একপ্রকার সুখ দেয়। এই প্রভুত্ব-প্রিয়তাতে মানুষ করিতে পারে না এরূপ কাজ নাই। নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট ইহার প্রভাবে ইউরোপকে নর-রুধিরে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এখনও এই ক্ষমতাপ্রিয়তা দ্বারা চালিত হইয়া মানুষ সকল বিভাগেই কাজ করিতেছে। ইহাও সূক্ষ্ম ও অলক্ষিতভাবে মানব অভিসন্ধির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মানুষকে চালিত করিয়া থাকে।

এত প্রকার সূক্ষ্ম ও অলক্ষিত শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই, যে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ভিন্ন মানুষের কাজ ঈশ্বরের কাজ হয় না, সেই অভি-সন্ধির বিশুদ্ধতা কিরূপে লাভ করা যায়, সেই চিন্তাতে সকলকে প্রবৃত্ত করা। আমাদের কাজ যাহাতে ঈশ্বরের কাজ হইতে পারে, সে জন্য তিনটী সাধনের প্রয়োজন।

প্রথম, আত্মপরীক্ষা। মধ্যে মধ্যে একান্তে বাস করিয়া আপনার কার্য্য সকলের অভিসন্ধি কি তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করা। আত্মপরীক্ষার অভ্যাস সাধুজীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ। এই কারণে তাঁহারা অপরের দোষ অপেক্ষা নিজের দোষ অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকেন। সচরাচর মানুষের স্বভাব

এই দেখি যে, তাহারা অপরের দোষকে কঠিন হস্তে ধরে এবং আপনাদের দোষকে কোমল হস্তে ধরে; আপনার অপরাধ ও ত্রুটির বিচার করিবার সময়ে বলে—"আহা মানুষ দুর্ব্বল, এ ত্রুটী মার্জ্জনীয়, কিন্তু অপরের অপরাধ ও ত্রুটী বিচার করিবার সময়ে বলে—"ছি ছি, এ মানুষ অতি ঘৃণিত, ইহার মুখ আর দেখিও না"। আত্মপরীক্ষার অভ্যাস থাকাতে সাধুদের ব্যবহার ইহার বিপরীত দেখি;—"তাঁহারা নিজের প্রতি নির্দয় ও পরের প্রতি সদয় হইয়া থাকেন। নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া সেন্টপলের ন্যায় বলেন—"হায় রে হতভাগ্য আমি, আমাকে এই মৃত্যুময় পাপ বিকার হইতে কে মুক্ত করিবে।" কিন্তু পরের প্রতি যীশুর ন্যায় সদয় হইয়া বলেন—"যাও আর পাপ করিও না।" আত্ম-পরীক্ষা ব্যতীত অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায় না, সুতরাং আত্ম-পরীক্ষা একটা প্রধান সাধন।

আত্মপরীক্ষার পরেই প্রার্থনাশীলতা। আমরা যাহাতে ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া না পড়ি, সে বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। আপন আপন জীবনপরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাই, ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া পড়া আমাদের পক্ষে কত সহজ। কয়েক দিন নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি অমনোযোগী থাকিলেই দেখিতে পাই, যেন তাঁহা হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছি। বাহিরে উপাসনাদি চলিতেছে, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলও চলিতেছে, মুখে ধর্ম্ম-প্রচারও একপ্রকার করিয়া যাইতেছি, কিন্তু মন অল্পে অল্পে তাঁহা হইতে নির্ভরটা তুলিয়া লইয়া অপর কিছুর প্রতি ফেলিতেছে; তাঁহার প্রতি প্রেম জাগ্রত শক্তির ন্যায় হৃদয়ে আর কার্য্য করিতেছে না; জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে তাঁহার সুমিষ্ট সান্নিধ্য আর মনে জাগিতেছে না। ইহা ঠিক যেন বালক-দিগের সেই খেলার ন্যায়; ধর্ ধর্ আমার মাঝের আঙুলটা ধর, বলিয়া অঙ্গুলি নাড়িতেছে, যে ধরিল সে ভাবিল প্রকৃত আঙুলটাই ধরিয়াছে, পরে দেখে আর একটা আঙুল ধরিয়াছে। এই অবস্থা হইতে প্রবুদ্ধ হইলে আমাদের দশাও যেন সেই প্রকার হয়। যখন মনে ভাবিতেছি ঈশ্বরকে ধরিয়া আছি, তখন ভাবিয়া দেখি, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কিছু ধরিয়াছি।

ঈশ্বরকে ছাড়ার আর এক অর্থ আছে। তাঁহার যে ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা মানব-জীবন ও মানব-সমাজ শাসিত হইতেছে, তাঁহার সহিত যদি হৃদয়ের যোগ

বিচ্ছিন্ন হয়, যদি ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয় দেখিয়া হৃদয় আনন্দিত না হয়, যদি সাধু ও সাধুতার প্রতি ভক্তি ও অসাধুতার প্রতি বিদ্বেষ হ্রাস হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হৃদয় ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে। এ রূপেও আমাদের আত্মা অল্পে অল্পে ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া থাকে। অনেক সময়ে এই বিপদ এত অলক্ষিতভাবে আসে, যে আমরা ইহার ক্রম লক্ষ্য করিতে পারি না। আধ্যাত্মিক জীবনের ম্লানতা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারি না।

পদে পদে যখন ঈশ্বরকে ছাড়িবার এতই সম্ভাবনা, তখন পদে পদে প্রার্থনারও আবশ্যকতা। "আমাকে তোমা হতে দূরে যাইতে দিও না।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু ডেবিড হেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী জেনেট হেয়ার কন্যার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। জেনেট দেখিতেন রাজা পথে যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকেন। একদিন তিনি রাজার সঙ্গে গাড়ীতে যাইতেছেন, দেখিলেন রাজা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আছেন। রাজা নয়ন উন্মীলন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এত চক্ষু মুদিয়া থাকেন কেন?" রাজা উত্তর করিলেন—"আমি সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করি ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।" জেনেট বলিলেন—"এত প্রার্থনা করেন কেন?" রাজা বলিলেন —"আমরা দুর্ব্বল মানুষ, সর্ব্বদা ঈশ্বরকে স্মরণ করাই ত ভাল!" জেনেট বলিলেন—"তাহা অপরের পক্ষে খাটে, আপনাতে ত কোন দুর্ব্বলতা দেখি না।" রাজা হাসিয়া বলিলেন, "না জেনেট, তুমি জান না, আমরা সকলেই দুর্ব্বল, আমাদের সকলের পক্ষেই প্রার্থনাশীল হওয়া প্রয়োজন।" রাজা জেনেটকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনদিগের জীবনেও দেখিতে পাই। যীশুর জীবনচরিত পাঠ করিলেই দেখিতে পাই, তিনি মধ্যে মধ্যে একান্তে গিয়া প্রার্থনাপরায়ণ হইতেছেন। অবশেষে ক্রুশ কাষ্ঠে যখন তাঁহাকে বিদ্ধ করিতেছে, তখন যাতনায় ক্ষণকালের জন্য চিত্ত চঞ্চল হইলে তিনি প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলে?" সেই ক্ষণকালের চঞ্চলতাও তাঁহার ঈশ্বর-বিচ্যুতি বলিয়া মনে হইল।

প্রার্থনা-শীলতার পরেই আত্মসমর্পণ। ঈশ্বরের শক্তি হৃদয়ে অবতীর্ণ

হইয়া যে দিকে প্রেরণ করিতে চায়, সে দিকে যাইতে প্রস্তুত থাকার নাম আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের ভাব না থাকিলে সে প্রেরণা আমাদের হৃদয়ে আসে না। সে প্রেরণা তোমাকে লইয়া যাইতে পারে বলিয়া তোমার কাজ ঈশ্বরের কাজ, আমাকে লইয়া যাইতে পারে না বলিয়াই আমার কাজ মানুষের কাজ।

এই আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সে কথাটা এই, প্রেমের এক প্রকার জুলুম আছে। প্রেম মানুষের ঘাড়ে ধরিয়া বাধ্য করিয়া কাজ করায়। সেণ্টপল সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতাতে তৎকালীন য়ীহুদীসমাজে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি যীশুর নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, তখন আপনার মানসম্ভ্রম, পদ ও ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যীশুর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। ইহাতে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। সেণ্টপল বলিলেন—"the love of Christ constraineth me" অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রতি যে প্রেম তাহা আমাকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়া চালাইতেছে।" ইংরাজীতে বলিতে গেলে এই যে, "constraining power of love" প্রেমের জুলুম ইহা মানব-হৃদয়ের একটা গূঢ় রহস্য। প্রেমে বাধ্য করিয়া মানুষকে কি করায় তাহা আমরা প্রতি দিন দেখিতেছি। মানুষে মানুষে যে ভালবাসা তাহারও একটা জুলুম আছে, তাহাতেও অনেক সময়ে মানুষকে স্বাধীনতা বঞ্চিত ও বন্দীদশা প্রাপ্ত করিতেছে।

প্রকৃত ঈশ্বরপ্রীতিরও সেইরূপ একটা জুলুম আছে। তাহার দ্বারা চালিত হইয়া এ জগতে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাও স্বাধীনতা বঞ্চিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন। যেন আর একটা কি শক্তি তাঁহাদিগকে ঘাড়ে ধরিয়া কার্য্য করাইয়াছে। যীশু, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় কোনও উত্তর দিতে পারিতেন না, হয় ত বলিতেন, "না করিয়া চারা ছিল না।" ঈশ্বর-প্রীতির খাতিরে যাহা কর, যাহা না করিয়া তোমার চারা নাই, তাহাই ঈশ্বরের কাজ, আর যাহা তুমি করিলেও করিতে পার, না করিলেও না করিতে পার, যাহা করা না করা তোমার অনুগ্রহসাপেক্ষ, তাহা তোমার কাজ।

যেখানে মানুষ প্রেমের জুলুমটা অনুভব করে, সেখানে আত্মসমর্পণ আপনা-পনি আসিয়া পড়ে। সে স্রোতে ভাসিয়া যায়, সে বন্দীভাবে নীত হয়।

কিন্তু প্রেমের জুলুমটা সকল হৃদয়ে অনুভূত হয় না। সে শক্তি সকলেরই কাছে আছে কিন্তু মনকে চালাইতে পারে না। যেখানে পবিত্রচিত্ততা আছে, ব্যাকুলতা আছে, সে শক্তি সেই খানেই কার্য্য করে। আমাদের জীবনযাত্রার যে যে শুভলগ্নে পবিত্রচিত্ততা ও ব্যাকুলতা থাকে, সেই সেই শুভলগ্নে তাহা প্রকাশ পায়। এই শক্তি অবাধে আমাদের হৃদয়ে কার্য্য করিতে পাইলেই আমাদের কাজ ঈশ্বরের কাজ হয়।

কল্যাণকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

গীতার অনেক বচন এদেশে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তন্মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান, এবং বাস্তবিক সকল দেশের প্রবাদবাক্যের মধ্যে অতি উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। সে বচনটী এই :—

"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"

অর্থ—হে তাত, যে কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

এই উক্তির মধ্যে কিরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে। কল্যাণ যাহার চিন্তাতে, কল্যাণ যাহার অভিসন্ধিতে, কল্যাণ যাহার কার্য্যে, এরূপ ব্যক্তি কখনই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। ইহা কি সত্য? এ কথা কি উপস্থিত ব্যক্তি-গণের মধ্যে সকলেই বিশ্বাস করেন? গীতাকার বলিয়াছেন, এ কথা সত্য, সকল সাধুজন বলিয়াছেন, এ কথা সত্য। কিন্তু এ কথার কি কোনও প্রমাণ আছে? মানব-ইতিবৃত্ত কি এ কথার সাক্ষ্য দেয়? দেখা যাউক।

যে কল্যাণকে চায় সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না, এই উক্তিকে আমরা প্রথমে এই অর্থে গ্রহণ করিতে পারি যে, সে যে কল্যাণকে লক্ষ্য স্থলে রাখিয়াছে, যে কল্যাণের অভিমুখে সে চলিতেছে, যে কল্যাণকে সে কার্য্যদ্বারা লাভ করিতে চাহিতেছে, সে কল্যাণ কখনই নষ্ট হয় না; তাহা সংসাধিত হয়ই হয়।

এই একটা কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয় যে, এ জগতে যাহা কিছু সৎ, তাহার মার নাই। অবশ্য এরূপ হইতে পারে যে, তুমি যে আকারে তাহাকে দেখিতে চাহিতেছ, সে আকারে তাহা থাকিতে না পারে, তুমি যে ভাবে ও যে ক্ষেত্রে তাহাকে জয়শালী দেখিবার আশা করিতেছ, সে ভাবে ও সে ক্ষেত্রে তাহা জয়শালী না হইতে পারে, কিন্তু তাহা থাকিবেই থাকিবে, বাড়িবেই বাড়িবে। সাগরগর্ভে একটী দ্বীপ উঠিয়াছে, কোনও নাবিক এখনও সেখানে যায় নাই। দ্বীপটী নির্জ্জনে বালুকাময় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এক দিন সাগরজলে ভাসিতে ভাসিতে একটী ফল কোথা হইতে আসিয়া সেই দ্বীপে লাগিল, অথবা কোন পক্ষীর মুখচ্যুত একটী বীজ সেই দ্বীপবক্ষে পড়িল। কেহই দেখিল না, কেহই খবর লইল না। কতিপয় বৎসর অতীত হইতে না হইতে, দ্বীপটী স্বচ্ছন্দজাত তরুগুল্মে পূরিয়া গেল। একটী বীজ শতটী হইল; শতটী সহস্র হইল; এইরূপে বাড়িয়া গেল। নিশ্চয় জানিও যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সৎ, ঈশ্বরের জগতে তাহার সেরূপ বর্দ্ধনশীলতা আছে। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি শত শত নরনারীকে একভাবে ও একপ্রাণে আবদ্ধ করি, আমার হৃদয়ের বিশ্বাস শত শত হৃদয়ে স্থাপন করি, আমার অপ্রিয় যাহা তাহার উন্মূলন করি; সে আকাঙ্ক্ষাটা হয় ত পূর্ণ হইল না; এ জীবনে হয় ত আমার প্রতি অনুরক্ত লোক অপেক্ষা আমার প্রতি বিরক্ত লোকের সংখ্যা অধিক দেখিয়া গেলাম; হয় ত আমার প্রকৃতির মধ্যে যে সকল গূঢ় দুর্ব্বলতা আছে, তাহা আমার অনেক কার্য্যকে নষ্ট করিয়া দিল; কিন্তু একথা কি কেহ বলিতে পারেন, আমার মধ্যে প্রকৃত ভাল যে টুকু আছে, আমার অন্তরে যে ধর্ম্মজীবনটুকু জাগিয়াছে, তাহাও আমার সহিত নষ্ট হইবে? এরূপ চিন্তা যিনি করেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ফুটিতে এখনও বিলম্ব আছে। আমাতে যে টুকু ভাল আছে, সে টুকু অমর। সে টুকু কত দিনে, কত হৃদয়ে কাজ করিতেছে ও করিবে, তাহা কে জানে? আমি মানুষকে যাহা দিতে চাহিতেছি, তাহা হয় ত দিতে পারিব না, যে কথাটাকে অমর করিবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া বসিতেছি, উপদেষ্টা হইয়া দাঁড়াইতেছি, সেটা হয় ত লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু যাহা আমি আমারই অজ্ঞাতসারে দেখাইতেছি, যাহা লোকে দাবা খেলার চাল দেখার ন্যায় আমার পৃষ্ঠের দিকে দাঁড়াইয়া দেখিয়া লইতেছে,

তাহা অপর চরিত্রে প্রবিষ্ট হইতেছে। আমার সঙ্গে যাহারা থাকিতেছে, তাহারা তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহার প্রভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। আবার আজ যাহাদের প্রতি তাহার প্রভাব বিস্তীর্ণ হইতেছে না, আমি মরিলে, তাহাদের উপরে তাহার প্রভাব পৌঁছিবে। সে টুকু নষ্ট হইবার নয়, সে টুকু যে নষ্ট হয় না কেবল তাহা নহে, দ্বিগুণিত, চতুর্গুণিত, অষ্টগুণিত ষোড়ষগুণিত হওয়া তাহার স্বভাব। কোনও প্রকৃত সাধু ব্যক্তি এ জগতে বৃথা বাস করেন নাই। যেমন রৌপ্য গালাইবার সময় রতি প্রমাণ স্বর্ণ যদি তাহার মধ্যে পড়ে, তবে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে না, গলিয়া মিশিয়া, রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তেমনি সেই সকল সাধুজীবন আমাদের দৈনিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের চিন্তা ও ভাব, তাঁহাদের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের চিন্তাপটের টানাপড়েনের মধ্যে সূত্ররূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। সত্যই বলিতেছি, মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে সৎ যাহা, তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। তবে কল্যাণকারীর অভীষ্ট কল্যাণটী দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। কল্যাণ যাঁর অভিসন্ধিতে, কল্যাণ যাঁর আচরণে, সেই নিঃস্বার্থ পুরুষ বা নারী এ জগতে এক পবিত্রতার শক্তি, যে শক্তি অপর হৃদয়ে আপনাকে অভ্যুদিত করিবেই করিবে।

আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না। যাঁর অভিসন্ধি বিশুদ্ধ, যাঁর অন্তরে কল্যাণ, সে ব্যক্তি এ জগতের পাপ প্রলোভনের মধ্যে নিরাপদে বাস করেন। মানুষের ভ্রম প্রমাদ সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে; আজ তুমি যাহা করিতেছ, কল্য তাহা বর্জ্জনীয় মনে হইতে পারে; আজ যে পথে যাইতেছ, কল্য সে পথে পদার্পণ করা অকর্ত্তব্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু কল্যাণই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, কল্যাণচিন্তাই যদি প্রধানরূপে তোমার হৃদয়ে বাস করে, তবে তুমি যে কোথা দিয়া সকল জাল কাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তোমাকে যদি বিপজ্জালে জড়ায়, তাহাতে চিরদিন আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না। তুমি সমুদয় কাটিয়া বাহির হইবেই হইবে, কল্যাণ চিন্তাই তোমাকে সকল প্রলোভনের বাহিরে রাখিবে। যীশুর বিরোধী লোকেরা তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত এই বলিয়া বিবাদ করিত—"তোমাদের গুরু কিরূপ লোক? কেবল মাতাল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত লোকদিগের সঙ্গে বেড়ান।" ইহার

উত্তরে যীশু বলিলেন, "তাহাদিগকে বলিও, ঔষধ কি রোগীর জন্য না সুস্থদের জন্য?" আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যীশু কিভাবে পাপাচারী লোকদের মধ্যে যাইতেন? কি কল্যাণের চিন্তা তাঁহার অন্তরে ছিল। সেই কল্যাণই তাঁহাকে সর্ব্ববিধ অসাধুতার মধ্যে রক্ষা করিত। কল্যাণ যাহার অন্তরে সে কখনও দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মের ক্ষুধা যে অন্তরে একবার জাগিয়াছে, তাহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে ছাড়িয়া দেও, সে এ জগতে আপনার উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইবেই লইবে। আমরা যে মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকি তাহারও ত এই উদ্দেশ্য। কাহাকেও কি এ জগতে এমন করিয়া মানুষ করা সম্ভব, যে সে কখনও অসাধুতার মুখ দেখিবে না, সর্ব্বদাই সৎসঙ্গে বাস করিবে? যেমন লোকে কাচের ঘর করিয়া লতা বা গুল্ম বিশেষকে রক্ষা করে, তেমনি কি সমাজ মধ্যে থাকিয়া বালক বালিকা ভালটাই দেখিবে, মন্দটী আর দেখিবে না? তাহা সম্ভব নহে। ইহাই জানিয়া রাখা উচিত যে জনসমাজে বাস করিতে গেলেই ভাল মন্দ দুই আমাদের চক্ষের সমক্ষে আসিবে, উভয়ের সহিত সংঘর্ষণ হইবে। সংক্ষেপে শিক্ষার উদ্দেশ্য এই—মনের মধ্যে এমন কিছু দিয়া দেওয়া, যাহার গুণে মানুষ ভাল মন্দ দুই দেখিয়া ভালটাই লইবে ও মন্দটী পরিহার করিবে। সে জিনিসটী কি? সেটী সাধুতার জন্য ক্ষুধা, জীবনকে উন্নত করিবার জন্য জ্বলন্ত আগ্রহ, নিজের ও অপরের কল্যাণের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। যেমন যে শিক্ষা জ্ঞানের সামগ্রী যোগায়, কিন্তু জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিতে পারে না, তাহা শিক্ষাই নহে, তেমনি যে শিক্ষা হৃদয়ে এই জাগ্রত কল্যাণকামনা অভ্যুদিত করিতে পারে না, মন্দটীকে বর্জ্জন করিয়া ভালটী লইতে সমর্থ করে না, তাহাও শিক্ষা নহে। অতএব কল্যাণ যাহার হৃদয়ে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

আর এক অর্থে কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। মনে করা যাউক, তিনি যাহা করিতে চাহিলেন তাহার কিছুই হইল না; তাহার প্রভাব কোনও জীবনে বিস্তৃত হইল না; কেহই তাঁহার সাধুতা লক্ষ্য করিল না বা স্বীকার করিল না। তাহা হইলেই কি বলিতে হইবে যে, তিনি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইলেন? তাঁহার সাধুচেষ্টা বিফলে গেল? কখনই নহে। মানুষ কল্যাণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এবং কল্যাণের অনুষ্ঠান করিয়া অপরের কিছু উপকার করুক আর

না করুক নিজেকেই উপকৃত করে। প্রত্যেক কল্যাণচিন্তাতে ও কল্যাণের অনুষ্ঠানে তাহার নিজের চরিত্র ফুটিতে থাকে, তাহার নিজের প্রকৃতি সাধুতার অনুগত, সাধুতার উপযোগী ও সাধুতার উৎসস্বরূপ হইতে থাকে। একটি সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আর দশটী সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানের উপযোগী শক্তি বিকশিত হয়। এ লাভটা কে ঘুচাইতে পারে? আমি একটী ভাল কাজে হাত দিয়াছিলাম, তোমরা দশজনে তাহা ভাঙ্গিয়া দিলে, দেও, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া সেই কাজটীতে হাত দেওয়াতে আমার আত্মা যে বলশালী হইয়াছে, তাহা তোমরা কিরূপে হরণ করিতে পার? সেই কাজে হাত দিয়া যে ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিয়াছি, তাহা কিরূপে কাড়িয়া লইতে পার? তবে দেখ কল্যাণকৃৎ ব্যক্তি কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

আর এক অর্থেও একথা সত্য। যাঁহাতে প্রকৃত সাধুতা আছে, মানব-হৃদয়ে তাঁহার জন্য সিংহাসন গঠিত হইবেই হইবে। মানব-হৃদয়ের নিঃস্বার্থতা এমনি জিনিস, যাহাতে অপর হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিবে। যে আপনাকে চায় না, তাহাকে সকলেই চায়। মিশর দেশের রাজা একবার মক্কানগরে দূত প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন—"দূত, দেখিয়া আয় ত কোন্ সাহসে মহম্মদ পৃথিবীর রাজাদিগকে ঘোষণাপত্র পাঠায়?" দূত ফিরিয়া গিয়া বলিল,—"মহারাজ, দেখিয়া আসিলাম, অন্ততঃ সহস্রটি মস্তক অগ্রে না কাটিলে, মহম্মদের মস্তকে পৌঁছিবার যো নাই।" অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহম্মদের জন্য মস্তক দিতে প্রস্তুত। ঘাতকগণ মহম্মদের বাস-ভবন আবেষ্টন করিলে, আলি মহম্মদকে পার্শ্বের দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া, শত্রুগণকে নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্য তাঁহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রহিলেন। সে মুহূর্ত্তে কি আলি মহম্মদের জন্য স্বীয় জীবন দিতে প্রস্তুত হন নাই? এতটা প্রেমের মূল কোথায়? তাহা যদি কেহ অন্বেষণ করেন, তবে তাঁহাকে বলি, ইহার মূল যদি দেখিতে চাও, তবে তাঁহার জীবনের দুইটী ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। প্রথম ঘটনা এই—যখন মহম্মদ বহুদিনের পর সদলে মক্কানগরে প্রবিষ্ট হইলেন, যখন তাঁহার সৈন্যগণ সহর লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল, বা বৈরনির্যাতনের জন্য ব্যগ্র হইল, তখন মহম্মদ সর্ব্বাগ্রে একজনকে কাবামন্দিরের উচ্চ প্রাসাদে তুলিয়া দিলেন, বলিলেন,—উচ্চৈঃস্বরে একবার মক্কাবাসীদিগকে ডাকিয়া বল—"এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই।" জয়ের

উল্লাসের মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান চিন্তা সত্যের ঘোষণা। দ্বিতীয় ঘটনা ইহারই অনুরূপ, মহম্মদ যখন ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন, তখন দেখা গেল, একটী মাদুর, একটী বদনা ও কয়েক টাকার সম্পত্তি ভিন্ন তাঁহার কিছুই নাই। অথচ তাঁহার সেনাপতিগণ এক একজন রাজসম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। লোকে দেখিল, মহম্মদ বাহিরের সম্পদ ও সম্ভ্রমের মধ্যে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়াছিলেন। এই কথা যতদূর প্রচার হইতে লাগিল, একেবারে আগুন জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। আবুবেকর ও আলি সকলেই এই ভাব লইয়া খলিফার কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। হায়, আমরা হৃদয়কে নিঃস্বার্থ রাখিতে পারি না বলিয়াই, ধর্ম্মরাজ্যে কিছু করিতে পারি না, মানব-হৃদয়ের প্রেমে স্থান পাই না। লোকে বিষয়বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া ভাবে, আপনার দিকে যদি না তাকাই, তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। আপনাকে আগে বাঁচাও পরে সময় থাকিলে অপরকে দেখিও। বিষয়ী মানুষের ভাব এই —পরের জন্য ভাবিবার বা কিছু করিবার বাধ্যতা আমার উপরে নাই, আমারটী আমি আগে বেশ করিয়া গুছাইয়া লই, পরে সময় ও সামর্থ্য থাকিলে অপরের জন্য কিছু করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তাহা নাই করি, তাহাতেই বা কি? অপরে মরিল, ডুবিল, মজিল, হাজিল, তাহাতে আমাদের কি? আমার ঘরটী, আমার পরিবারটী ত সুখে রাখিলাম, তাহাতেই আমার সন্তোষ। এইরূপ স্বার্থচিন্তা করিতে করিতে মানুষের এক প্রকার অভ্যাস দাঁড়ায়, যখন পরার্থ-চিন্তা তাহাদের হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইলেও, হৃদয়ে প্রবেশ করে না, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় গড়াইয়া পড়িয়া যায়। এই কথাই কি বলা উদ্দেশ্য যে মানুষ আপনাকে দেখিবে না, আপনার গৃহ পরিবার রক্ষা করিবে না? যাহাদের ভার প্রধানরূপে আমার উপরে, যে ভার আমি নিজে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা বহন করা কি আমার কর্ত্তব্য নহে? এরূপ শাস্ত্র কে প্রচার করিবে? কথা এই—আমাদের হৃদয়ে থাকিবে না স্বার্থ কি পরার্থ, কিন্তু থাকিবে কল্যাণ। নিজের ও অপরের কল্যাণ। ক্ষুদ্র বা মহৎক্ষেত্রে কার্য্যের একই উদ্দেশ্য,—কল্যাণ। আমরা গৃহ বা পরিবারে যখন বাস করিব, তখন আলি দিয়া প্রাচীর তুলিয়া পরার্থ হইতে স্বার্থকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করিব না। কিন্তু নিয়োগ করিব জীবনের মহত্ত্ব সাধনে, নিজের ও অপরের সদ্গতিলাভের

দিকে। যাহার পক্ষে আর পরার্থকে স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা সম্ভব নহে, এক দেখিতে গেলেই যিনি দুই দেখিয়া ফেলেন, তিনিই প্রকৃত কল্যাণকৃৎ, তিনি এ জগতে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না।

যেখানে প্রীতি সেখানেই নির্ভর।

আমি যখন প্রথমে মহিসুর রাজ্যে গমন করি, তখন অনুরুদ্ধ হইয়া সেখানকার একটি মহিলার গৃহে উপাসনা করিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম। সেই মহিলা আপনার কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যা সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষায় যাপন করিয়াছিল। তখনও সে বিবাহিতা হয় নাই। উপাসনান্তে কন্যার মাতা সেই কন্যাটিকে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে লইয়া আসিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কোন বিশেষ বিঘ্ন থাকাতে তখন আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

কয়েক বৎসর পরে যখন পুনরায় আমি সে স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন শুনিলাম সেই স্ত্রীলোকটী মারা গিয়াছেন। তাঁহার সেই কন্যাটীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে "তাহার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন, সে মন্দ হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ উত্তর পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে,হঠাৎ ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে,"একটী স্ত্রীলোক ও একটী পুরুষ আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য আসিয়াছেন।" আমি তাঁহাদিগকে আমার নিকট লইয়া আসিতে বলিলাম। স্ত্রীলোকটী আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন দেখিলাম,সে সেই পূর্ব্ববর্ণিতা কন্যা; সে আমাকে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে বিশেষ ভাবে তাহার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে সে বলিল, "লোকে আমাদের প্রকৃত অবস্থা না জানিয়া, এরূপ বলিয়াছে। আমরা বিবাহিত হইয়াছি। আমাদের আচার্য্য গোপনে আমাদের বিবাহ দিয়াছেন। আমার স্বামীও আমার সঙ্গে

আসিয়াছেন ।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বিবাহ হইয়াছে ? সে বলিল “হাঁ, আমার বিবাহ হইয়াছে।”

আমি বলিলাম “তোমাদের বিবাহ কি আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে ?”

সে বলিল, “না, কোন আইন করা হয় নাই।”

আমি বলিলাম, “তোমার স্বামী যদি তোমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে তুমি কি করিবে ?”

সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া স্বাভাবিক সরলতার ও দৃঢ়তার সহিত বলিল যে, “তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ? যদিও তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা বারম্বার আমাকে ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছে, ভয় দেখাইয়াছে, তথাচ তিনি কখনও আমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না।”

স্বামীর প্রতি তাঁহার নির্ভর ও বিশ্বাস এমনি যে, তাহার তুলনা হয় না। আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তৎপরে বলিলাম “তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে এস, তোমার মাতার বড়ই ইচ্ছা ছিল, তোমাকে পাত্রস্থ করেন, তাহা হইয়াছে। কিন্তু তোমরা ভয়ঙ্কর নির্যাতন সহ্য করিতেছ। তোমাদের এই কার্য্যের সহিত আমার হৃদয়ের যোগ আছে। তোমাদের প্রতি অন্য কাহারও প্রীতি না থাকিলেও আমার প্রীতি আছে।”

“তিনি কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন ?” তাহার এই সরল নির্ভরব্যঞ্জক কথাটী আমার মনে এখনও জাগিয়া রহিয়াছে। যেখানে খাঁটি প্রীতি থাকে, সেখানেই আশা এবং তার সঙ্গে নির্ভর অবস্থিতি করে। যখন নিজের মনে নিরাশার উদয় হয়, সমাজের কথা ভাবিয়া মন নিস্তেজ হয়, নিরুৎসাহ আসে, তখনি মনে করি, ভগবানের প্রতি আমার বিশ্বাস ও প্রীতি চলিয়া যাইতেছে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে বিশ্বাস ও আশা থাকিবেই।

একবার মহম্মদ কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অনেক সৈন্য ও সেনাপতি হতাহত হইল। যখন সৈন্যদল সায়ংকালে শিবিরে প্রত্যাগত হইল, তখন শিবিরের চারিদিকে ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। স্ত্রী স্বামীর বিচ্ছেদে কাঁদিতেছে, ভ্রাতা ভ্রাতার বিয়োগে কাঁদিতেছে, পুত্র পিতৃশোকে কাঁদিতেছে। সেই হাহা-

কার,কোলাহল এবং ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে মহম্মদ এক বৃক্ষতলে স্থির গম্ভীর,ভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মুখে নিরাশা নাই, অধীরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষ্য করা যায় না।

এক জন গিয়া মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহাপুরুষ! তোমারই বিশেষভাবে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তুমি কি করিয়া সুস্থির রহিয়াছ?" মহম্মদ প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তোমরা স্থির হও, বিলাপ করিও না, প্রভু পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই।"

ভয়ঙ্কর নিরাশার ভিতরে তিনি আশার আলোক দর্শন করিলেন। বিনাশের ভিতরে তিনি মঙ্গল দেখিলেন, এখানেই তাঁহার মহা পুরুষত্ব। যেখানে প্রীতি সেখানেই আশা ও বিশ্বাস।

আমরা যে ভগবানে নির্ভর করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমরা প্রীতি ও বিশ্বাসে হীন। আমরা মৃতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। আমাদিগকে দেখিলেই অন্যের মনে হয়, এ মানুষ গুলির বিশ্বাস নাই, আশা নাই।

প্রেম যদি থাকিত, তবে কি দেখিতাম? দেখিতাম এ জগৎ ত তাঁহার, আমাদের কাহারও নহে। এ জগতের কর্ত্তা তিনি, তুমি আমি কে? আমরা ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, ইচ্ছা করিয়া যাইব না। এ জীবনের মূলে তাঁহার কর্তৃত্ব। সেই জগৎপতি যদি তাঁহার জগৎ রক্ষা করিতে পারেন, তবে আমাদের ভার কি বহন করিতে পারেন না? তাঁহার প্রতি বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই এত দুর্গতি। প্রতিদিন সূর্য্যের উদয় হইবেই, এই বিশ্বাস আমাদের মনে যেমন প্রবল, সেইরূপ ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবেই,ইহাতে কি সেইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকি?

ঐ মেয়েটী যাহা বলিয়াছিল, তাহার নির্ভরের ভূমি কোথায়? কি দেখে সে ঐ রূপ বিশ্বাসী হইয়াছিল? প্রেমেতেই তাহার বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। আমাদের হৃদয়ে এক বিন্দু প্রেম আসিলে বাঁচিয়া যাই।

আমাদিগকে কখন ভাল দেখায়? একজন কবি বলিয়াছেন, "সুন্দর যিনি, তাঁর চক্ষের জল তাঁর হাসির চেয়ে মিষ্ট। ঘন ঘটার মধ্যে যখন সূর্য্যোদয় হয়, তখন কেমন সুন্দর দেখায়! যখন মানুষ নিরাশার অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হয়, তখন আশা আসিয়া জীবন ও সৌন্দর্য্য দান করে।

প্রেম ও সেবা।

ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছি, এবারেও আর একটী উদ্ধৃত করিতেছি। সে আখ্যায়িকাটী এই,— খ্রীষ্টীয়গণ বিশ্বাস করেন যে মহাত্মা যীশুর মৃত্যুর তিন দিবস পরে তিনি সমাধি হইতে সশরীরে উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে দেখা দিয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি না। কেবল তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই নির্দ্দেশ করিতে যাইতেছি। বাইবেল গ্রন্থে আছে যে, যীশুর মৃত্যুর পরে একদিন পিটার প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ রাত্রিকালে মৎস্য ধরিতে গেলেন। সমস্ত রাত্রি জাল ফেলিয়াও কিছু ধরিতে পারিলেন না। অবশেষে রজনীর অবসানকালে যখন তাঁহারা নিরাশমনে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, তখন উষাকালের ক্ষীণালোক ও নৈশ অন্ধকারের ঘোরের মধ্যে কে একজন তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। শিষ্যগণ প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। নবাগত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের নিকট কি কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে?" শিষ্যগণ বলিলেন —"না।" তখন তিনি আদেশ করিলেন,—"তরণীর দক্ষিণ পার্শ্বে জালখানা আর একবার ফেল দেখি, কিছু পাও কি না।" তাঁহার আদেশে জাল ফেলিবামাত্র তাঁহারা মৎস্যের ভারে জাল আর তুলিতে পারেন না। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, এ আর কেহ নয়, স্বয়ং যীশু। তৎপরে প্রজ্বলিত অনলে মৎস্য সিদ্ধ করিয়া তিনি সশিষ্যে আহার করিলেন। আহারান্তে যীশু তাঁহার শিষ্যগণের অগ্রণী স্বরূপ পিটারকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন তুমি কি ইহাদের সকলের অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল বাস?" তিনি উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রভো! আপনি ত জানেন, আমি আপনাকে ভাল বাসি।" যীশু বলিলেন, "তবে আমার মেষশিশুগুলির পরিচর্য্যা কর।" যীশু দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন তুমি কি আমাকে ভাল বাস?" পিটার উত্তর করিলেন—"হাঁ প্রভো! আপনি ত জানেন, আমি

আপনাকে ভাল বাসি।" তখন যীশু বলিলেন—"তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।" যীশু তৃতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন—"যোনার পুত্র সাইমন তুমি কি আমাকে ভাল বাস?" পিটার কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন, কারণ যীশু তিন তিন বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল বাস কিনা? তিনি পুনরায় বলিলেন —"প্রভো, আপনি ত সকলি জানেন, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে ভাল বাসি।" তখন যীশু বলিলেন, "তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।"

যে জন্য এই আখ্যায়িকাটী উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা এই, যীশু তিন তিন বার তাঁহার শিষ্যপ্রধান পিটারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমাকে ভাল বাস কি না? এবং তিন তিন বার বলিতেছেন, তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে যীশু পিটারের ভালবাসার প্রতি সন্দিহান ছিলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি শত্রুগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত হন, সেই শেষ মুহূর্ত্তে পিটার প্রাণভয়ে তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছিলেন— বলিয়াছিলেন, কে এই যীশু, আমি ইহাকে চিনি না, সেই কারণেই কি যীশু তাঁহার ভালবাসার প্রতি সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন, তাই বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভাল বাস কি না? তাহা নহে। পিটারের ভালবাসার প্রতি তাঁহার সংশয় ছিল না। তিনি উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পিটার গুরুভক্তির বিষয়ে অগ্রগণ্য। তবে বার বার একই প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য একটী মহাসত্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে দৃঢ় মুদ্রিত করা। সে সত্যটী এই, যেখানে প্রেম সেই খানেই সেবা। তিনি উক্ত প্রশ্নত্রয়ের দ্বারা এই কথাই বলিলেন,আমাকে তোমরা যদি ভাল বাস তবে যাহারা আমার প্রিয়, যাহারা আমার আশ্রিত, তাহাদিগের পরিচর্য্যা কর।

এখানে মেষশিশু ও মেষ বলিতে খ্রীষ্টাশ্রিত উপাসকমণ্ডলী বুঝিতে হইবে। মেষশিশু উক্ত মণ্ডলীভুক্ত বালকবালিকাগণ—মেষ নরনারী। যীশুর উক্তির তাৎপর্য্য এই,আমাকে যদি যথার্থ ভাল বাস, তাহা হইলে সেই প্রীতির খাতিরে আমি যাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি, তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত থাক। যীশু জানিতেন যে ঘোর নির্য্যাতন তাঁহার উপরে আসিয়াছিল, তিনি চলিয়া গেলেই দ্বিগুণ উৎসাহে সেই নির্য্যা-

তন তাঁহার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীকে আক্রমণ করিবে। তাহাদের অধিকাংশ অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দীন দরিদ্র লোক, সমাজে নগণ্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্বে অতি হীন। যাহারা নির্যাতন করিবে তাহারা সমাজপতি ঐশ্বর্য্যশালী ও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে আবার তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে অনাসক্ত, সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহারা আহত হইয়াও আত্মরক্ষার্থ হস্তোত্তোলন করিবে না। সুতরাং সেই ঘোর নির্যাতনের মধ্যে তাহারা বৃক-তাড়িত মেষকুলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। লৌকিক ভাবে যাহারা এরূপ বলহীন হইবে, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে বলশালী করিতে পারে, এমন কেহ যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। এই জন্যই তিনি পিটারকে প্রধানরূপে ঐ ভার দিয়াছিলেন। ভার দিবার সময় তিনি প্রেমের দোহাই দিলেন—বলিলেন, আমাকে যদি ভাল বাস, তবে আমার যাহারা, তাহাদের পরিচর্য্যা কর। ইহা অপেক্ষা অধিক বলবান কার্য্যের প্রেরক আর কি হইতে পারে? প্রেমের স্বভাব এই যে, প্রেমাস্পদের প্রিয় যে সেও প্রেমিকের প্রিয় হয়। প্রেমাস্পদের আশ্রিত যাহারা তাহারাও নিজের আশ্রিত বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রমাণ অন্বেষণের জন্য বহু দূরে গমন করিতে হইবে না। মানব-সমাজে প্রতিদিন দেখিতেছি অকৃত্রিম মিত্রতা যেখানে আছে, সেখানে একজনের পরিবার পরিজন অপরের পরিবার পরিজনের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতেছে। বন্ধুর পরিবার পরিজনের ভার বহিতে কোনও প্রেমিক ব্যক্তি কখনও আপনাকে ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

আখ্যায়িকাটীর মধ্যে নিমগ্ন হইয়া দেখিলে আরও অনেক গুলি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে নিজের নবপ্রচারিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীর পরিচর্য্যাকে প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাব এইরূপ বোধ হয়, তিনি যেন বলিলেন—"যদি আমার আশ্রিত উপাসকমণ্ডলীকে রক্ষা করিতে না পার, বাহিরে আমার ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উঠিতে পারিবে না।

আর একটী উপদেশ এই, মেষগুলির উল্লেখের অগ্রে মেষশিশুগুলির উল্লেখ করিলেন। ইহার অর্থ এই, ধর্ম্মসমাজের উন্নতি যদি চাও বালক-

বালিকাদিগের প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হও। তাহাদের হৃদয়ে যাহাতে ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়, তাহারা যাহাতে পরে উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসমাজের কার্য্য হস্তে লইতে পারে, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও। যে ধর্ম্মসমাজ এ বিষয়ে অমনোযোগী, তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

উক্ত আখ্যায়িকার আর একটী উপদেশ এই, তিনি পিটারকেই প্রধান-রূপে এই ভার দিলেন, অপরকে দিলেন না, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই, ধর্ম্মসমাজ মধ্যে যার শক্তি যত প্রধান, যার পদ যত উচ্চ, মণ্ডলীর পরি-চর্য্যা বিষয়ে তাহার দায়িত্ব তত অধিক। যীশু তাঁহার শিষ্যগণকে সর্ব্বদা বলিতেন, তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সকলের অপেক্ষা হীন, তিনি সকলের ভৃত্য। ইহাতে উক্ত দায়িত্ব জ্ঞান কেমন পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে কি একটী মহাসত্য নিহিত নাই? যাহার যে কিছু ক্ষমতা বা শক্তি বা প্রভুত্ব আছে, তাহা ত ঈশ্বর-প্রদত্ত। ঈশ্বর ঐ শক্তি কি কারণে দিয়াছেন? তাঁহার কার্য্যে লাগিবে বলিয়া। সুতরাং শক্তি সামর্থ্য বিষয়ে যিনি যত অগ্রগণ্য, তাঁহার কর্ত্তব্য ভার তত গুরুতর।

আরও নিমগ্ন হইয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে আরও গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যীশু পিটারকে আদেশ করিবার অগ্রে জিজ্ঞাসা করিলেন —তুমি কি আমাকে ভাল বাস? যখন শুনিলেন—হাঁ, তখন বলিলেন— তবে আমার মেষদলের পরিচর্য্যা কর। আমরা এ জগতে যে মানুষকে আদেশ করি, কোনও কাজে লাগাই, কোনও উপকার করিতে অনুরোধ করি, তাহার ভিতরে একটা বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে। সকল স্থলে এরূপ আদেশ করিতে ও সেবা লইতে সাহস হয় না। যেখানে প্রেমে প্রেমে বন্ধন আছে, সেই খানেই এরূপ সেবাতে লাগাইতে সাহস হয়। যে আমাকে ভাল বাসে, অকপটে প্রীতি করে, তাহাকেই আমার জন্য ক্লেশ দিতে সাহসী হই। কলিকাতার ন্যায় একটা সহরে প্রতিদিন কত লোক দেখিতেছি, আলাপ ও আত্মীয়তা-সূত্রে কত লোকের সহিত মিশিতেছি, এই উপাসনা স্থানে প্রতি রবিবার কত লোক আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয় ত এখানকার উপাসনা ও উপদেশাদিতে প্রীত হইয়া যাইতেছেন, অনেকে হয় ত আমাকে না জানিয়া দূর হইতে বলিতেছেন, বা এখানকার আচার্য্য ত বেশ লোক, জিজ্ঞাসা করি,

এই যে অনির্দ্দিষ্ট, গতিশীল, ক্ষণস্থায়ী জনমণ্ডলী, ইহাদের সকলকে কি আমি আমার জন্য ক্লেশ দিতে সাহস করি, আমার কোনও কাজ করিয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারি? কখনই না। এই অনির্দ্দিষ্ট জনমণ্ডলীর কথা বলি কেন, যাঁহাদের সঙ্গে এক সমাজে বিগত পঁচিশ বৎসর বাস করিতেছি, যাঁহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিতেছি, যাঁহাদের মুখ প্রতিদিন দেখিতেছি, যাঁহাদের সঙ্গে প্রতিদিন মিশিতেছি, তাঁহাদের সকলকেই কি আমার জন্য ক্লেশ দিতে বা আমার কোনও কাজ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে সাহস করি? ইহারা সকলেই কি সেই অর্থে আমার বন্ধু? কখনই না। যাঁহারা মনের মধ্যে আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছেন, আমার কাজকর্ম্ম যাঁহারা অপ্রেমের চক্ষে দেখিতেছেন, তাহার গুণ ভাগ অপেক্ষা দোষ ভাগই অধিক পরিমাণে যাঁহাদের চক্ষে পড়িতেছে, তাঁহাদিগকে কিরূপে আমি নিজের কোনও কাজ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি? বাতুল না হইলে এরূপ স্থলে কেহ কাহাকেও ক্লেশ দিতে সাহসী হয় না। আর যদিও বা সাহস করা যায়, সে সেবাতে তাহাদের আত্মার কল্যাণ নাই, আমারও সুখ নাই।। অপ্রেমে মুখ ফিরাইয়া মানুষ যে কাজ করে, তাহাতে চিত্তে সুখ প্রসব না করিয়া অসুখই প্রসব করে। প্রেম ও প্রকৃত বন্ধুতার স্থলে ঠিক ইহার বিপরীত; যে আমাকে অকপটে ভাল বাসে, সে আমার জন্য ক্লেশ পাইলে সুখী হয়; এবং আমি ক্লেশ দিবার ভয়ে কোনও অনুরোধ করি নাই জানিলে ঘোর অভিমান করে।

ইহা মানব-হৃদয়ের প্রেমের স্বভাব। এরূপ অবস্থা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। মফস্বলের কোনও স্থানে একজন বন্ধু বাস করিতেন, তাঁহার পত্নী আমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। আমাকে খাওয়াইয়া, সেবা করিয়া বড় সুখী হইতেন। এক দিন অগ্রে সংবাদ না দিয়া, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রেলযোগে হঠাৎ সেই সহরে উপস্থিত হইলাম। ভাবিলাম এত রাত্রে আর গিয়া তাঁহাদিগকে জাগাইব না। ভদ্রলোকের মেয়ে কোনও রূপেই নিজহস্তে রন্ধন করিয়া না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। দূর হোক ওয়েটিংরুমে পড়িয়া থাকি, প্রভাত হইলেই যাইব। এই বলিয়া ওয়েটিংরুমে পড়িয়া রহিলাম। প্রাতে গিয়া যখন বলিলাম, রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আসিয়াছিলাম,

তোমাদিগকে ক্লেশ দিবার ভয়ে ওয়েটিংরুমে পড়িয়াছিলাম, তখন বন্ধুর গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"ও এত দিনের পরে বুঝিলাম, আপনি আমাদিগকে ভাল বাসেন না। যদি ভাল বাসিতেন, তা'হলে বুঝিতেন যে আপনি রাত্রে আসিলে আমাদের ক্লেশ না হইয়া সুখই হইত।"

প্রেম ক্লেশ পাইতে ভাল বাসে ও ক্লেশ দিতে সাহসী হয়। এই সত্যটীকে একবার সকলে ঈশ্বর-প্রীতিতে আরোপ করিবার চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই ইতিহাসের একটী সমস্যার উত্তর পাইবেন। সে সমস্যাটী এই;—ইতিহাসে আমরা যাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া জানি, যাঁহারা বহু তপস্যার দ্বারা আপনাদের জীবনকে মহৎ করিয়াছিলেন, এবং অকপটহৃদয়ে মানুষকে প্রীতি করিয়াছিলেন। সেই সকল মহাজনের জীবন দুঃখ কষ্ট ও কঠিন পরীক্ষাতে পরিপূর্ণ ছিল। যে মহাত্মার উক্তি লইয়া অদ্য আলোচনা করিতেছি, তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা যাউক। কপটাচারী স্বার্থপর ফিরুশিগণ সুখে থাকিল, বিলাসপরতন্ত্র ধনিগণ আমোদ-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল, অর্থলোলুপ বিষয়িগণ বিষয়সুখে মগ্ন থাকিল, কিন্তু তাঁহার নাম হইল (man of sorrows), অর্থাৎ চিরবিষণ্ণ মানুষ। তিনি শৃগাল কুকুরের ন্যায় নগরে নগরে তাড়িত হইয়া বেড়াইলেন, কণ্টকের মুকুট মস্তকে পরিলেন, চোর বা দস্যুর উপযুক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; তাহার মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও লোকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল "এই ব্যক্তি পরের পরিত্রাণ দিতে আসিয়াছে কিন্তু নিজেকেই রক্ষা করিতে পারিল না।" এই নির্দ্দোষ, মানব-হিতৈষী, করুণাপরতন্ত্র মহাপুরুষের যাতনা ও পরীক্ষার বিষয় স্মরণ করিয়া হয় ত কোনও মুহূর্ত্তে কেহ ঈশ্বরকে বলিতে পারেন—"একি ঠাকুর, কায় মন প্রাণে যে তোমাকে ভজে তার প্রতি এই ব্যবহার?" এ প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর বলেন—"যে আমাকে অকপটে ভাল বাসে সে ভিন্ন আমার জন্য ক্লেশ ও পরীক্ষা আর কে সহিবে?"

ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধির জন্যই ধার্ম্মিকের ক্লেশ পাওয়া আবশ্যক। চন্দনকে শিলায় ফেলিয়া ঘষিলেই তাহার সুবাস চারি দিকে ব্যাপ্ত হয়। যেমন অন্ধকারে না ঘেরিলে আলোকের প্রকৃত শোভা প্রকাশ পায় না; তেমনি দুঃখ, বিপদ পরীক্ষাতে না ঘিরিলে সাধুর সাধুতা ও বিমল ঈশ্বরপ্রীতির শোভা প্রকৃতরূপে প্রকাশ পায় না।

এই জন্যই ঈশ্বরের মঙ্গলময় রাজ্যে প্রেম ও সেবা এই উভয়কে একত্র বাঁধা দেখিতেছি। যেখানে প্রেম সেই খানেই সেবা। এ সংসারে মানুষ মানুষের জন্য খাটিয়া সারা হইতেছে, এই টুকুই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইতরপ্রাণীরাও শিশু সন্তানদিগের জন্য খাটিয়া সারা হয়। সে প্রাকৃতিক নিয়মে, অন্ধ প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া। কিন্তু শিশু আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষাতে সমর্থ হইলে আর তাহা থাকে না। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে দেখ, শত শত জন ঘুমাইতেছে, এক জন হয় ত তাহাদের জন্য জাগিতেছেন। পল্লীতে কলেরা দেখা দিয়াছে, সন্তানগণ নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতেছে, পরিবারের পিতা অনিদ্রায় স্বীয় শয্যাতে পড়িয়া চিন্তা করিতেছেন—ইহাদের রক্ষায় কি উপায় করি।" এক জন গৃহস্থ স্বীয় পরিবারের জন্য যাহা করেন, সাধুরা সমগ্র জাতির জন্য তাহা করিয়াছেন। ইংলণ্ড বাস কালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, কোনও উপাসনা গৃহে গেলে, তাঁহাদের উপাসনা কালে বসিয়া ক্রন্দন করিতেন। লোকে ভাবিত বুঝি ভাবাবেশে কাঁদিতেছেন; কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা বলিলেন, আমার স্বদেশের কথা মনে হয়, আমার স্বদেশবাসিগণ কিরূপ উপধর্ম্ম ও কুসংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন আছে, তাহা ভাবি বলিয়া কাঁদি। ইহা কেবল মানুষেই সম্ভব যে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে বসিয়া সমগ্র জাতির জন্য কাঁদিতে পারে।

ঈশ্বরকে যাঁহারা অকপট প্রীতি করেন, তাঁহারাই মানবের সেবাতে আপনাদিগকে অর্পণ করেন, এই নিয়ম চিরদিন ধর্ম্মজগতে কার্য্য করিতেছে। আমাদের ঈশ্বরপ্রীতি যে অনেক পরিমাণে মৌখিক তাহার প্রমাণ এই, আমরা মানবের সেবাতে আপনাদিগকে দিতে পারিতেছি না, সুখাসক্তি ও স্বার্থপরতা আসিয়া বাধা দিতেছে। হায়! ইহা ভাবিলে কত কষ্ট হয় যে মুখে এত বিশ্বাস ও ভক্তির কথা বলিতেছি, অথচ আমাদের ব্যবহার অনেক পরিমাণে নাস্তিকের মত। নাস্তিক না হইলে স্বীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এত চলিব কেন? সম্মুখে ক্লেশ ও পরীক্ষা দেখিয়া কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইব কেন? প্রার্থনাতে এরূপ অবিশ্বাসী হইব কেন? ঈশ্বরের দয়াময় নামকে একটা ছেলে ভুলান ব্যাপার করিয়া রাখিব কেন? আমাদের কাজকর্ম্ম বিশ্বাসী লোকের ন্যায় নয়, এই জন্য আমাদের ঈশ্বরের নামের শক্তি জাগিতেছে না। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন, তাঁহার শক্তিও সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, প্রকৃত প্রেমিক হৃদয়

ভিন্ন সে শক্তি খোলে না। অয়স্কান্তমণি বা আতসী কাচের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই আছে, এবং সকল পদার্থেই পড়ে, কিন্তু অয়স্কান্তমণিতেই তাহা ঘনীভূত ও কেন্দ্রগত হয়, এবং অগ্নি উদ্গীরণ করে। আমরা প্রকৃত প্রেমের অভাবে এই শক্তি ধরিতে পারিতেছি না, এবং মানবের সেবাও করিতে পারিতেছি না। ঈশ্বর করুন আমাদের দুরবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

উপাসনার বিঘ্ন।

একদিন বেদী হইতে সংকেতের কথা কিছু বলিয়াছিলাম। মানুষ সকল বিষয়েরই একটা সংকেত জানিবার জন্য ব্যগ্র। বিদ্যালয়ে যে পড়িতেছে, তাহাকে যদি বলা যায়, এমন একটা সংকেত বলিয়া দিতে পারি, যাহাতে অল্পকালের মধ্যে উত্তমরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সে আমার সঙ্গ লইবে, এবং যতক্ষণ না সে সংকেতটী জানিতে পারে, ততক্ষণ আমাকে ছাড়িবে না। আমার ফরাসী ভাষা শিখিবার ইচ্ছা হওয়াতে বাজারে তদুপযোগী গ্রন্থ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম. অন্বেষণ করিতে করিতে জানিতে পারিলাম, একখানি গ্রন্থের নাম How to learn French in six months —অর্থাৎ ছয় মাসে কিরূপে ফরাসী ভাষা শেখা যায়? অমনি মনে করিলাম, এই পুস্তকই আমার জন্য। কারণ নানা কার্য্যে ব্যস্ততার মধ্যে আমি যথেষ্ট সময় দিতে পারিব না, বিশেষ পরিশ্রম করিতে পারিব না, বিনা আয়াসে ছয় মাসের মধ্যে যদি ফরাসী ভাষা শেখা যায়, তবে মন্দ কি। এই পুস্তকই আমাকে লইতে হইবে। সংকেতে সংক্ষেপে যাহা জানিতে বা করিতে পারা যায়, সেজন্য মানুষ শ্রম দিতে প্রস্তুত নয়।

যাহারা ধনের জন্য এই সহরে খাটিয়া মরিতেছে, তাহারা যদি আজ শুনিতে পায়, জগন্নাথের ঘাটে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যিনি রূপাকে সোণা করিয়া দিতে পারেন, আমার নিশ্চয় মনে হয়, এই সংবাদে দলে দলে লোক টাকার পুটুলি লইয়া জগন্নাথের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হয়। রাতারাতি বড়

মানুষ হইবার জন্য এমনি ব্যগ্রতা! আমরা সংবাদ পত্রে মধ্যে মধ্যে পাঠ করি, এইরূপ কোন কোন ভণ্ড সন্ন্যাসী লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া অনেক টাকা লইয়া পলাইল, লোকে ধনের লোভে নির্ধন হইয়া গেল। একজন প্রাচীন কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবিতহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।

দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কোমূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥

অর্থ—উন্নতির আশাতে অবনত হয়, জীবিকার জন্য জীবন ত্যাগ করে, সুখের লোভে দুঃখ পায়, পরের সেবক যে তাহার অপেক্ষা মূর্খ আর কে?

আমি বলি, বিষয়াসক্ত মানবের মত নির্ব্বোধ কে, ধনের জন্য শরীর ভগ্ন করে কিন্তু সে ধন ভোগ করে না, স্ত্রী পুত্রের সুখের জন্য ধন অর্জ্জন করে, কিন্তু সেই ধনের কারণে তাহাদের সঙ্গেই ঘোর অশান্তিতে বাস করে, এবং ধনের লোভে নির্ধনতার মধ্যে পতিত হয়।

যাক্ সে কথা, রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা যে কেবল ধনলোভী ব্যক্তিদিগের মধ্যেই দেখা যায় তাহা নহে; ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যেও দেখা যায়। শ্রমকাতর ধনলোভীর ন্যায় শ্রমকাতর ধর্ম্মসাধকও আছে, যাহারা সর্ব্বদা একটা সংকেতের অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা যদি আজ শুনে যে এক জন এমন সাধু দেখা দিয়াছেন, যিনি চক্ষে চক্ষে চাহিয়া আগুনে টিকা খানি ধরাইবার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে মনে ধর্ম্ম ধরাইয়া দিতে পারেন, অমনি দেখিবে দলে দলে লোক সেই সাধুর চরণে গিয়া পতিত হইবে। এইরূপ অনেক লোক মানুষ গুরুর চরণে দেহ মন, বিদ্যা বুদ্ধি, চিন্তা ও স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়াছে ও এ দেশে প্রতিদিন করিতেছে।

একটা সংকেত চাই, একটা সংকেত চাই, যাহাতে অল্প আয়াসে ত্বরায় ধর্ম্ম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর শ্রমকাতর সাধকদিগের জন্য একটা সংকেত দেওয়া দুষ্কর। এমন কিছুই বলিতে পারা যায় না, যাহাতে দুরন্ত পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা নাই। জগদীশ্বর মানবের জন্য ধর্ম্মকে হাতের কাছেই রাখিয়াছেন, কিন্তু মুরগী যেমন খাদ্য বস্তু পাইয়াও নিজ চরণের দ্বারা মাটী খুড়িয়া তাহাকে আবরণ করে, ও পশ্চাদ্বর্ত্তী শাবকদিগকে বলে খুজিয়া লও, তেমনি যেন জগজ্জননী আমাদের আত্মার খাদ্য বস্তু যে ধর্ম্ম

তাহাকে গুহাতে নিহিত করিয়া বলিতেছেন, খুজিয়া লও। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি সকলকে বিকশিত করাই উদ্দেশ্য। যে দিক্ দিয়াই যাও, সাধনের শ্রম অপরিহার্য্য।

তবে যাঁহারা ভাবিয়াছেন, খাটিয়াছেন, পড়িয়াছেন, উঠিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, দেখিয়াছেন, তাঁহারা দুই একটা পথ দেখাইতে পারেন, দুই একটা বিপদ জানাইতে পারেন, এই মাত্র। ইহাকে যদি সংকেত বলিতে হয় বল। এইরূপ কয়েকটা সংকেতের বিষয় অদ্য বলিতে যাইতেছি।

আমাকে অনেক সময় অনেকে একটী প্রশ্ন করিয়াছেন, উপাসনা সরস হয় না কেন? দিনের পর দিন যায়, উপাসনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, যেন নিয়ম রক্ষাই করিতেছি। আত্মাতে ভগবদ্ভক্তির উদয় দেখি না, ঈশ্বরের প্রেম মুখ যেন আচ্ছাদিত থাকে, এরূপ কেন হয়? এরূপ অবস্থা আমরা সকলেই সময়ে সময়ে অনুভব করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি? ইহা নিবারণের উপায় কি? সিদ্ধপুরুষদিগের বিষয়ে এরূপ শুনিয়াছি, তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের নাম কখনই নীরস হইত না। চৈতন্য যখনি হরিনাম করিতেন, তখনি যে শুনিত, যে দেখিত, সেই বলিত "আহা মরি মরি, ঐ চাঁদ মুখের বালাই লইয়া মরি।" হরিনাম এমনি মিষ্ট লাগিত। মহম্মদ যখন নমাজ করিতেন, তখন পাষাণ দ্রব হইয়া যাইত। নানক যখন হরিনাম করিতেন, তখন দুরন্ত পাতকীও গলিয়া যাইত। প্রভুর সেই নাম আমাদিগের মুখে এরূপ হইল কেন? অপরের হৃদয় আর্দ্র করা দূরে থাক্, আমাদের হৃদয়কেই সরস করিতে পারে না! কিসে সরসতা আসে? ইহার সংকেত কোথায়?

ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবেন, সাধন কর, সাধুসঙ্গ কর, সৎগ্রন্থ পাঠ কর, নাম জপ কর, আত্মপরীক্ষা কর ইত্যাদি। এরূপ উত্তর আমিও অনেক সময় মানুষকে দিয়াছি। কিন্তু তদুত্তরে শুনিয়াছি, সাধুসঙ্গে রুচি থাকিলে ত সাধুসঙ্গ করিব? সাধুসঙ্গ সৎগ্রন্থ পাঠ কিছুই করিতে ইচ্ছা করে না। যে কারণে উপাসনার সরসতা নাই, সেই কারণে এ সকলেও রুচি নাই। এই উত্তর শুনিয়া ব্যাধি কঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নিরুত্তর থাকিয়াছি এবং ভাবিতে বসিয়াছি। নিজেরই নাকি এই অবস্থা ঘটিয়াছে, সুতরাং ভাবিবার পক্ষে কিছু সহায়তাও হইয়াছে। অবশেষে কয়েকটী

সংকেত ধরিয়াছি। অর্থাৎ কিসে উপাসনা সরস হয়, তাহার সংকেত নহে; কেন উপাসনা সরস হয় না, তাহার সংকেত বুঝিয়াছি।

একটুকু বুঝিয়াছি, যেমন কোনও দ্রব্যে রঙ্গ লাগাইতে হইলে অগ্রে আস্তর দিতে হয়, জমি প্রস্তুত করিতে হয়, তেমনি উপাসনার সরসতারও একটা জমি আছে, আত্মার অবস্থা বিশেষ আছে, যাহা ভিন্ন উপাসনার ফল ফলে না। ক্রমে ক্রমে এরূপ কয়েকটী সংকেত নির্দ্দেশ করিতেছি :—

হৃদয়কে উপাসনার অনুকূল রাখিবার জন্য প্রথম আবশ্যক জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে পবিত্র ও মহৎ রাখা। তুমি যে মানুষ সংসারে বাস করিতেছ, তুমি কি চাহিতেছ? তুমি কিরূপ হইলে, ও কি পাইলে সুখী হও? পরীক্ষা করিয়া দেখ তুমি খুব ধনবান হইবে, তোমার দুই হাজার দশ হাজার হইবে, দশ হাজার বিশ হাজার হইবে, বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার হইবে, তুমি স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ধনী করিয়া রাখিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে একটু একটু পরোপকারও করিবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি প্রতাপ ও প্রভুত্বে অগ্রগণ্য হইবে, দশজন তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিবে, সমাজমধ্যে মান্য গণ্য হইবে—এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি বিষয়ীদের মধ্যে একজন প্রধান হইবে, তোমার অশ্বগণ উৎকর্ণ হইয়া সহরের রাজপথ কাঁপাইয়া ছুটিবে, দশদিকে তোমার দশখানা বাড়ী থাকিবে, বিষয়িগণ কোনও কাজ করিতে হইলে, তোমাকে বাদ দিয়া করিতে পারিবে না—এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি পণ্ডিত ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে, সংবাদপত্রে ও সভা সমিতিতে তোমার প্রশংসাধ্বনি গীত হইবে, তুমি তাহা শুনিতে শুনিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? অথবা তুমি ঈশ্বরের প্রদত্ত শক্তি সকলকে ব্যবহার করিয়া ও তাঁহার আদেশাধীন থাকিয়া নিজের ও অপরের উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে নিজের দেহ মনকে নিযুক্ত রাখিবে, সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তুমি জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি এই সকলের দ্বারা নিজ জীবনকে উন্নত ও মহৎ করিবে, এই কি তোমার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা? যাহার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, ঈশ্বরোপাসনা তাহার পক্ষে আকাশে মাকু চালাইবার ন্যায়,—বিফল

শ্রমমাত্র। জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ না রাখিলে উপাসনা সরস হয় না।

দ্বিতীয় প্রয়োজন অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা, সর্ব্ববিষয়ে নিজের অভিসন্ধিকে পবিত্র রাখা। পদে পদে মানুষের এমনি বিপদ যে মানুষ অনেক সময়ে না জানিয়া ক্ষুদ্র অভিসন্ধিতে মহৎ কাজ করে। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডে খ্রীষ্টীয়ান নামে একখানি উপন্যাস বাহির হইয়াছে, লেখক তাহাতে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, তাঁহার নায়কের ধর্ম্মোৎসাহ, বৈরাগ্য, স্বার্থনাশ, পরসেবা, ইত্যাদির মূলে ছিল একজন রমণীর হৃদয়কে পরাজিত করিবার ইচ্ছা। এক-জন রমণীর জন্য এতদূর করা উপন্যাসের অত্যুক্তি হইলেও, একথা সত্য যে আমরা অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে অসাধুভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধু-কার্য্যে যোগ দিয়া থাকি। কঠোর বৈরাগ্যের আচরণ করিতেছি, আমার হারান সুনাম ফিরিয়া পাইবার জন্য, সমাজের কার্য্যে উৎসাহের সঙ্গে লাগি-য়াছি, অপর এক ব্যক্তিকে দমন করিবার জন্য, দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনা করিতেছি, অপর একজনকে দুকথা শুনাইয়া দিবার জন্য, উপাসনা মন্দিরে আসিতেছি, স্ত্রীলোক দেখিবার বা নারীকণ্ঠের গান শুনিবার জন্য। পরস্পরে এইগুলি আপনার আপনার প্রতি খাটাইয়া দেখ, মানুষ ক্ষুদ্র অভিসন্ধিতে মহৎ কাজ করিতে পারে কি না? যেখানে মূলে দূষিত অভিসন্ধি থাকে, সেখানে উপাসনা সরস হয় না। এই জন্য উপাসনার সরসতাসাধনের একটা প্রধান সংকেত এই, সর্ব্ববিধ কার্য্যে অভিসন্ধি হইতে দূষিত পদার্থ উৎপাটিত করিয়া ফেলা। কোনও কাজ করিতে যাইবার সময় যদি দেখ হৃদয়ের অভিসন্ধিটা নির্দ্দোষ নহে, আর সে কার্য্যে পা বাড়াইও না। বক্তৃতা করিতে উঠিবার সময় যদি দেখ, প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতেছ আর উঠিও না। কোনও কাজে হাত দিয়া যদি দেখিতে পাও, স্বার্থের গন্ধ রহিয়াছে, তবে সে কাজ হইতে অপসৃত হও। সে পথ তোমার জন্য নিরাপদ নহে। সতর্ক হইয়া অভিসন্ধিকে এরূপে বিশুদ্ধ না রাখিলে উপাসনাকে সরস রাখা যায় না।

তৃতীয় বিঘ্ন অহংকার। বুদ্ধিমত্তার অহংকার, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, শক্তি সামর্থ্যের অহংকার, সর্ব্বোপরি ধার্ম্মিকতার অভিমান অহংকার অনেক প্রকারের আছে। কেহ মনে করেন দলের মধ্যে আমি বুদ্ধিমান, আর সকলে

বোকা, ওরা পয়সা রাখে না, আমি কেমন পয়সা রাখিতে পারি, ওরা সমাজের প্রকৃত কার্য্যপ্রণালী বোঝে না, আমি কেমন বুঝিতে পারি। ইত্যাদি। কেহ ভাবেন আমিই জ্ঞানী আর সকল গুলা মূর্খ ও অজ্ঞ; কেহ মনে করেন, আমিই মহৎ ভাবে কাজ করি, আর সকল গুলা ছোট লোক; কেহ ভাবেন বলিতে কহিতে, কাজ উদ্ধার করিতে আমি সুপটু, অপর গুলো অকর্ম্মণ্য; কেহ মনে করেন, আমি সাধক অপর গুলা কেবল খায় ও ঘুমায়,—এইরূপে অপরের সহিত তুলনাতে আপনাকে বড় ভাবা, ইহার ন্যায় সরস উপাসনার আর শত্রু নাই। একথা আমরা কতবার শুনিয়াছি, কতবার আলোচনা করিয়াছি যে, ব্রহ্মডাঙ্গায় জল দাঁড়ায় না। এই যে কয়েক দিন ধরিয়া নিরন্তর বৃষ্টি হইল, জল কি সকল স্থানে দাঁড়াইয়াছে? যেখানে খানাখন্দ পাইয়াছে সেই খানেই দাঁড়াইয়াছে। যে হৃদয়ে বিনয় নাই, সেখানে ভক্তি দাঁড়াইবার খানা নাই। এই অহংকারের উষ্মা যখন ব্যাধির ন্যায় একটা সমাজকে ধরে, তখন দেখিতে পাই, পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করা, তাহাদের একটা প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। কারণ নিজে বড় হওয়া শ্রমসাপেক্ষ, তাহা না পারিয়া অনেক সময়ে লোকে অজ্ঞাতসারে একটা সহজ পথ অবলম্বন করে, অপরকে ছোট করিয়া নিজে বড় হইতে চায়। রেলওয়ের ট্রেণে বসিয়া যেমন অনেক সময় দেখা যায়, আমরা দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু পার্শ্ব দিয়া আর একখানা ট্রেণ যাইতেছে, আমাদের বোধ হইতেছে আমরাই যাইতেছি, তেমনি অনেক সময় মানুষ নিজে যাহা তাহাই থাকে, কিন্তু অপরে নামিলে মনে করে নিজে উঠিতেছি। তাই অপরকে লোকচক্ষে হীন করিতে সুখ পায়। এ ব্যাধি যে সমাজকে ধরিয়াছে, তাহার লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই প্রথমে বলে—"ওহে শুনেছ, অমুকের কাণ্ডটা দেখেছ?" আর যেন ত্রিসংসারে কথা কহিবার কিছু নাই। এই ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা পরনিন্দা মুখে করিয়াই প্রাতে বাহির হয়, এবং বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া নিন্দা ছড়াইতে থাকে। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই যাহাদের অবস্থা, এই যাহাদের কাজ, তাহাদের উপাসনা আকাশে মাকু চালা মাত্র।

চতুর্থ বিঘ্ন বিদ্বেষ। প্রাণে বিদ্বেষ পোষণ করা, আর রক্তাধারে যক্ষ্মা রোগ ধারণ করা দুই সমান। রক্তাধারে বিষ লাগিয়াছে, যক্ষ্মার বীজ বসি-

স্থাছে, দিনের পর দিন জিনিয়া বসিতেছে, পাকাইয়া পচাইয়া তুলিতেছে। দুই চারি মাস সে ব্যক্তি সুস্থের ন্যায় বেড়াইতে পারে, নিয়ম মত অন্ন পান গ্রহ করিতে পারে, কিন্তু একদিন আসিবেই আসিবে, যে দিন তাহাকে ধরাশায়ী হইতে হইবে। তেমনি বিদ্বেষ প্রাণে পোষণ করিয়া ধর্ম্মসাধন হয় না; উপাসনাতে সরসতা থাকে না; একদিন ধর্ম্ম জীবনের অবনতি অনিবার্য্য। এই বিদ্বেষ যে কিরূপ সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে প্রবেশ ও বাস করে, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখি না। আমরা মনে করি, আমার অনিষ্ট যাহারা করিয়াছে, কৈ তাহাদের অনিষ্ট চিন্তা ত আমি করি না। আমার নিন্দা যাহারা করিয়াছে, কৈ তাহাদের নিন্দা ত আমি করিয়া বেড়াই না। কিন্তু অপর দিকে দেখ, স্বার্থের নামে যে বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করিতে ভদ্র লোকে লজ্জা পায়, ধর্ম্মের নামে সে বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করা ধার্ম্মিকতার অঙ্গ মনে করে। দলাদলির এমনি মহিমা, সামান্য মতভেদের জন্য একদল আর এক-দলকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখা অন্যায় মনে করে না। এ বিষয়ে এই মনে হয়, মহীরাবণ নানা রূপ ধরিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বিভীষণের রূপ ধারণ করিয়া যেমন রাম লক্ষ্মণকে চুরি করিয়াছিল, তেমনি কাল বিদ্বেষ স্থূল স্বার্থের আবরণে আসিতে অসমর্থ হইয়া, বন্ধুর আবরণে আসে ও ধর্ম্মকে হরণ করে। এই বিদ্বেষের যক্ষ্মাতে যাহাদিগকে খাইতেছে, তাহাদের উপাসনায় সুফল ফলিবে না।

পঞ্চম বিঘ্ন ক্ষুদ্র আসক্তি। হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখ এমন কিছুতে কি হৃদয় আবদ্ধ আছে, যাহা আবশ্যক হইলে ঈশ্বরাদেশে ত্যাগ করিতে পার না? এই আসক্তির বিষয় নানাপ্রকার, কাহারও পক্ষে লোকানুরাগ, কাহারও পক্ষে ইন্দ্রিয়সুখ, কাহারও পক্ষে ধন, কাহারও পক্ষে আরাম, একটা না একটা কিছুতে বাঁধিয়া রাখিতেছে। এরূপ বন্ধনে যাহাদের হৃদয় আবদ্ধ তাহাদের উপাসনা সুফল প্রসব করে না। একবার একটী কৌতুককর গল্প শুনিয়াছিলাম। কয়েক ব্যক্তি নৌকা করিয়া কোনও স্থানে নিমন্ত্রণে গিয়া-ছিল। সে রাত্রে সেখানে থাকিবার কথা। কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া সকলের মন যখন উত্তেজিত, তখন একজন প্রস্তাব করিল চল, এই রাত্রেই নিজেরা নৌকা বাহিয়া যাই। অমনি সকলে প্রস্তুত। ঘাটে আসিয়া দেখে

মাঝী মাল্লারা নাই। তখন কেহবা হাকে, কেহ কেহ বা দাঁড়ে বসিয়া টানিতে আরম্ভ করিল। দাঁড় টানিতেছে, কিন্তু নৌকার রজ্জু খোলে নাই। অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি গেল, প্রাতে দেখে যেখানকার নৌকা সেইখানেই আছে। আমি দেখিয়াছি ক্ষুদ্র আসক্তিতে হৃদয় বাঁধিয়া রাখিয়া উপাসনা করা, মাতালের দাঁড় ফেলার ন্যায়; শ্রম আছে উন্নতি নাই।

এখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উপাসনা সরস করিবার সংকেত কি? উত্তরে আমি বলি, জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ রাখ, অভিসন্ধিকে বিশুদ্ধ রাখ, বিনয়কে হৃদয়ে ধারণ কর, অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিও না, এবং হৃদয়ের ক্ষুদ্র আসক্তি সকলকে উৎপাটন কর, তবে উপাসনার জমি প্রস্তুত হইবে। আরও হয় ত তাঁহাকে বলি, জমি প্রস্তুত না করিয়া উপাসনা করিলে যে ফল হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিবার জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে না, আমাদিগকেই দর্শন কর। দেখ আমরা কত উপাসনা করিতেছি, তাহার ফল নাই, সরসতাও নাই। ভিতরে ঐ সকল কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন এই ব্যাধিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

মহাত্মা যীশু ও মহাত্মা বুদ্ধের জীবনচরিতের যে বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে কোনও কোনও স্থলে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটী এই— উভয়েরই ধর্ম্মজীবনের প্রাক্কালে একটী ব্যাপার দেখা যায়। পাপ-পুরুষ উভয়কেই প্রলুব্ধ করিয়াছিল এবং সে সংগ্রামে উভয়েই জয়লাভ করিয়াছিলেন। যীশুর স্থলে পাপ-পুরুষের নাম শয়তান, বুদ্ধের স্থলে পাপ-পুরুষের নাম মার। বাইবেলে এরূপ উক্ত আছে যে, যীশু ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে গভীর ধ্যানে যাপন করিয়াছিলেন। ধ্যানান্তে যখন তিনি ক্ষুধিত হইলেন, তখন পাপ-পুরুষ শয়তান আসিয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে যীশু দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন—“শয়তান, তুই আমার সম্মুখ হইতে

চলিয়া যা" এই কথা বলিবামাত্র শয়তান অন্তর্হিত হইল, এবং স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল ও যীশুর পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত হইল।

মহাত্মা বুদ্ধের জীবনচরিতেও ইহার অনুরূপ বিবরণ আছে। তিনি যখন মহা সঙ্কল্প করিয়া বোধিদ্রুমের তলে বসিলেন, তখন পাপ-পুরুষ মার বিধিমতে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইল। বুদ্ধ মারের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে যেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত বলিলেন—"মার, মার, তুই আমার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হ", অমনি মার অন্তর্হিত হইল, এবং অমনি স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; সেই মহা প্রতিজ্ঞার মহা নিনাদে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়া গেল; বুদ্ধ নবালোক পাইয়া উত্থিত হইলেন।

মানবের চরিত্র বলিয়া যে জিনিষটীর বিষয়ে আমরা সর্ব্বদা শুনি, তাহার একটী প্রধান উপাদান পাপকে বাধা দিবার শক্তি। জগতে আমরা এক প্রকার মানুষ দেখি, যাহাদের হৃদয় মনে সাধুভাব, মঙ্গলভাব, কোমল কান্ত গুণাবলি প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু হৃদয়ে পাপকে বাধা দিবার শক্তি নাই, "যা তুই পাপ-পুরুষ শয়তান আমার সম্মুখ হইতে যা," এরূপ বলিবার উপযুক্ত তেজ নাই। ইহারা যতদিন প্রলুব্ধ না হয়, তত দিন ভাল থাকে, কিন্তু প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎকার হইলে, অগ্নির অগ্রে মোমের বাতি যেরূপ গলিয়া যায়, ইহাদের সাধুতাও তেমনি গলিয়া যায়। এজন্য মানব-চরিত্রে মঙ্গলভাবের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে বাধা দিবার শক্তি না জন্মিলে, তাহাকে চরিত্র বলা যায় না।

ঈশ্বর এ জগতে মানুষের শিক্ষার জন্য যে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহাতে উভয়েরই ব্যবস্থা আছে। এই দেহের জীবন সম্বন্ধে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে দেখাইতেছেন, যে উপচয় ও অপচয় এই উভয় প্রকার কার্য্যের দ্বারা জীবন বাঁচিতেছে। যেমন একদিকে আমরা পুষ্টিকর ও বলাধানের উপযোগী পদার্থ সকল দেহমধ্যে গ্রহণ করিতেছি, এবং পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত করিতেছি, তেমনি অপর দিকে নিরন্তর চতুর্দ্দিকস্থ বিশ্লেষণকারী শক্তিপুঞ্জের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছি। এই সংগ্রামে দৈহিক ধাতুপুঞ্জের অপচয় হইতেছে। অপচয় অপেক্ষা উপচয় অধিক হইতেছে বলিয়া আমরা এ জগতে জীবনকে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছি।

স্থূলভাবে দেহ-রাজ্যে যাহা সত্য, সূক্ষ্মভাবে আত্ম-রাজ্যেও তাহা সত্য। এই যে আমরা এক এক জন মানুষ কতকগুলি সুখ দুঃখ, কতকগুলি সম্বন্ধ ও তজ্জনিত কতকগুলি কর্ত্তব্য লইয়া এক একটী ব্যক্তি হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিতেছি, আমাদিগকেও অধ্যাত্মভাবে নিরন্তর উপচয় ও অপচয়ের ভিতর দিয়া যাইতে হইতেছে। প্রতিনিয়ত আমাদের চারিদিকে সাধুতার উপকরণ ও অসাধুতার সহিত সংগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন যে দেহ বিশ্লেষণকারী ভৌতিক শক্তি সকলের সহিত সংগ্রামে জয়শালী হইতে পারে না, তাহা বিনষ্ট হয়, তেমনি যে চরিত্র অসাধুতার সহিত সংগ্রামে জয়শালী হইতে পারে না, তাহাও বিনষ্ট হয়।

এই জন্যই দেখা যায়, প্রকৃত চরিত্র গঠনের পক্ষে দুইটারই প্রয়োজন। সাধুতার প্রতি প্রেম ও অসাধুতার প্রতি বিদ্বেষ, অর্থাৎ অসাধুতাকে বাধা দিবার শক্তি। যে মানুষে বা যে সমাজে সাধুতার প্রতি আদর আছে, কিন্তু অসাধুতার প্রতি বিরাগ নাই, তাহাতে চরিত্র নাই। সে সাধুতা অধিক দিন রক্ষা পাইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদেশীয়েরা যখন আমাদিগকে সত্যানুরাগে হীন বলিয়া কটূক্তি করেন, তখন আমাদের স্বজাতি-প্রেমে আঘাত লাগে, আমরা সে কটূক্তি সহ্য করিতে পারি না; তখন বলি, কি অবিচার! দেশে এরূপ সহস্র সহস্র হিন্দুসন্তান রহিয়াছেন, যাঁহারা কখনই কোনও ধর্ম্মাধিকরণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না; বা সহস্র ক্ষতির ভয় সত্বেও পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার করিবেন না, বা অঙ্গীকৃত পালনে বিমুখ হইবেন না। ইহা সত্য, কিন্তু বিদেশীয়গণ আরও একটু অগ্রসর হইয়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, যে তোমাদের সমাজ এরূপ কিনা যে সেখানে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকগণ উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে না, তাহারা সাধারণের দ্বারা তিরস্কৃত ও অধঃকৃত হইয়া নিতান্ত হীনভাবেই দিন যাপন করে? তখন উত্তর দিতে হয় ত আমাদিগকে একটু মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যাহারা প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধনী হইয়াছে বা হইতেছে, তাহারা অবাধে সমাজমধ্যে আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে সত্যের প্রতি প্রেম

থাকিলেও মিথ্যার প্রতি-তীব্র কটাক্ষপাতের শক্তি নাই। ইহার অনিবার্য্য ফল সমাজের অধোগতি। সুবিখ্যাত দায়ূদের সংগীতাবলীতে এক স্থানে আছে,—"The wicked walk on every side when the vilest men are exalted."—অর্থাৎ অসৎ ও জঘন্য মানুষ যে সমাজে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, সে সমাজে অসাধু ব্যক্তিদিগের সংখ্যাই বর্দ্ধিত হয়।" সাধু ও অসাধু সকল সমাজেই থাকিবে, পাপ ও পুণ্য সকল সমাজেই দেখা যাইবে; কিন্তু যে সমাজে পাপকে বাধা দিবার জন্য পুণ্যের শক্তি সর্ব্বদা জাগ্রত এবং যাহাতে পাপী ভয়ে ভয়ে ও সঙ্কোচে থাকে এবং পুণ্যাত্মারা সম্ভ্রমে বাস করেন, সেই সমাজে চরিত্র আছে, ধর্ম্মের প্রাণ আছে; আর যে সমাজে পাপীরা বুক ফুলাইয়া বেড়ায় ও সাধু মানুষেরা এক কোণে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকেন, সে সমাজের চরিত্র নাই ও ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, ব্যক্তিগত ভাবেও তাহা বলা যাইতে পারে। সাধু অসাধু ভাব, সাধু অসাধু কার্য্য সকল মানুষের সমক্ষেই আসে, যে সাধুতাকে বরণ করিয়া লয়, এবং অসাধুতাকে "আমার সম্মুখ হইতে যা" বলিতে পারে, তাহারই চরিত্র আছে এবং ধর্ম্মজীবন আছে। কিন্তু যাহার সাধুতার প্রতি বিশেষ স্পৃহা নাই বা অসাধুতার প্রতিও বিশেষ বিতৃষ্ণা নাই, তাহার চরিত্র নাই এবং ধর্ম্মজীবনও নাই।

পূর্ব্বোক্ত যীশু ও বুদ্ধের চরিত্র হইতে আমরা আর একটী উপদেশ প্রাপ্ত হই। তাঁহারা যখন পাপ-পুরুষকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—আমার সম্মুখ হইতে যা, যখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইলেন, তখন স্বর্গ হইতে দেবদূতগণ আসিয়া পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন এবং দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। ইহাতে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে যে, যখনি মানুষ ভাল হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তখনই দেবতা তাহার সহায়। মানুষ, তুমি সৎ হইবার জন্য যাহা কিছু ভাবিতেছ বা করিতেছ, ঈশ্বর তোমার সঙ্গেই আছেন। তবে তোমার প্রতিজ্ঞার বলের প্রয়োজন। তুমি যদি একবার স্থিরচিত্তে ও দৃঢ়চিত্তে বল, অসৎ যাহা তাহাকে আমি কখনই গ্রহণ করিব না, তুমি যদি হৃদয়ের সমগ্র শক্তির সহিত বল "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্" তাহা হইলে দেখিবে, ঈশ্বর ও ঈশ্বরের এই জগৎ তোমার

অনুকূল। যে এক ভিন্ন দুই দেখিতে জানে না, পরিণামে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী।

যেমন এই ভৌতিক জগতে আমরা সর্ব্বদাই অনুভব করি, যে আমরা কিছুই নই, আমরা সিন্ধুতে বিন্দু-প্রায় লাগিয়া আছি, মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া আছি; ভৌতিক জগৎ আর কোনও শক্তির প্রভাবে, আর কাহারও নিয়মে চলিতেছে; এখানে দেহ সম্বন্ধে যথেচ্ছভাবে বাস ও বিহার করিবার অধিকার আমাদের নাই; এখানে বাধ্যতাই সর্ব্বপ্রধান চতুরতা; তেমনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা জানা কর্ত্তব্য, যে মানব-চরিত্র অসীম ও দুর্লঙ্ঘ্য ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত হইতেছে। যে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবার জন্য উত্থিত হয়, সে ধর্ম্মাবহ পরমপুরুষের ক্রোড়েই আপনাকে অর্পণ করে।

এইরূপে তাঁহার ক্রোড়ে একবার আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিলে, আর ভয় ভাবনা থাকে না। যতক্ষণ আমরা ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে গিয়া আপনাকে দেখি, ক্ষুদ্র ক্ষতিলাভ গণনা করি, ততক্ষণ ভয় ভাবনা আসে; যখন আপনাকে আর দেখি না, কেবল সেই পরমপুরুষকেই দেখি ও তাঁহার আদেশকেই দেখি, তখন আর ভয় ভাবনা আসে না।

ধর্ম্মের যে জয় হইবে, সেজন্য আমি আবার কি ভাবিব? এ ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে রক্ষা পাইবে, সে বিষয়ে কখনও কি ভাবি? কখনও কি এই কুচিন্তা মনে আসে যে, অসীম গগনে যে অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভ্রমণ করিতেছে, যদি পথভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের আঘাতে তাঁহারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়? যদি কোনও লোক এরূপ চিন্তা করিতে বসে, তবে কি লোকে বলে না, "আরে পাগল, তুই উঠিয়া স্নান আহার করগে যা, এ ব্রহ্মাণ্ডের ভাবনা আর তোরে ভাব্‌তে হবে না, যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে করেছেন, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে রাখ্‌তে জানেন,—তুই আপনা বাঁচা।" সেইরূপ কোনও লোক ধর্ম্মের জয় পরাজয়ের বিষয়ে ভাবিতে বসিলে, তাহাকে কি বলিতে পারা যায় না, "ওরে পাগল, ধর্ম্মকে যিনি স্থাপন করিয়াছেন তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে জানেন, তোকে আর সে জন্য ভাবিতে হবে না,—তুই আপনাকে বাঁচা।"

আপনার পশ্চাতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের শক্তিকে সহায়রূপে দেখিলে মানুষের মনে কি অদ্ভুত বলের সঞ্চার হয়। এ ব্রহ্মাণ্ডে যে একা সেই বোকা, যে মনে

করে তাহার জীবন-সংগ্রামের সাক্ষী কেহ নাই, তাহার শুভসঙ্কল্পের সহায় কেহ নাই, তাহার পৃষ্ঠপোষক কেহ নাই, সেই সংগ্রামে অভিভূত হয়। যে জানে যে, তাহার প্রত্যেক সাধুচেষ্টাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষা করিতেছে, সেই পড়িয়া উঠে ও আশা ছাড়ে না।

অসাধুতার প্রতি বিরাগ যেমন মানব-চরিত্রের একটী উপাদান, প্রতিজ্ঞার বল তেমনি আর একটী। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যে ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হয়, সেই ঐশীশক্তিকে নিজ কার্য্যের সহায় করে। মানুষ যে ঈশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহারও একটা দায়িত্ব আছে ; মানুষের নিজের করিবার যতটুকু আছে, ততটুকু করিয়া তবে সে দৈব সাহায্য চাহিতে পারে। যে বলিতেছে, আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, দেখা চাই যে, সে নিজে পাপ-পঙ্ক হইতে উঠিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যে বলহীন, যে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনাকে ভাসাইয়া দিতেছে, যে আত্মশক্তিতে আত্মোন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ, ঈশ্বরের অমোঘ সাহায্য তাহার জন্য নহে। মানবের সর্ব্ববিধ উন্নতির ভিত্তি স্বাবলম্বনের উপরে, এমন কি মানুষ যে ঈশ্বরকে লাভ করিবে, তাহাতেও আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োজন। পাপ ও মৃত্যুর সহিত যে সন্ধি স্থাপন করে, শত্রুর হস্তে যে আত্মসমর্পণ করে, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না, যে হৃদয়ের সমগ্র বলের সহিত বলিতে পারে, আমি মৃত্যুকে চাহি না, জীবন চাই, বিষয়াসক্তির পাশে বদ্ধ থাকিতে চাহি না, পুণ্যময়ের সন্নিধানে বাস করিতে চাই, যা কালশত্রু পাপ, আমার সম্মুখ হইতে যা, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে।

মানবপ্রকৃতির সাক্ষ্য।

মানব-প্রকৃতির একটি গূঢ় ও গভীর রহস্য এই যে, মানবের কার্য্য, প্রবৃত্তি ও ভাব সকলের মধ্যে উচ্চ ও নীচ শ্রেণীবিভাগ আছে। ইতর প্রাণীতে এরূপ নাই। একটা পক্ষীকে কখনও দেখিতেছি যে, সে যত্নপূর্ব্বক আপনার শাবকদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্য বহন করিতেছে, নিজে অভুক্ত থাকিয়াও তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে। ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতির সময় তাহাদিগকে স্বীয় পক্ষপুটের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বসিতেছে। কোনও শত্রু শাবকদিগের নিকটস্থ হইলে, নিজের প্রাণের ভয় না রাখিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতেছে, এবং চঞ্চু ও পক্ষপুটের আঘাতে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে, এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। আবার কখনও বা দেখিতেছি, সেই পক্ষী অপর পক্ষীর সংগৃহীত খাদ্যের অংশ লইয়া টানাটানি করিতেছে ও তুমুল ঝগড়া উপস্থিত করিতেছে। পক্ষী জানে না যে তাহার শাবকপালন উচ্চশ্রেণীর কার্য্য, অথব তাহার পরস্বহরণ নিম্নশ্রেণীর কার্য্য। আমরাও ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে সেরূপ বিচার করি না। যে শাবক পালন করে, তাহাকে ধার্ম্মিক পক্ষী ও যে পরদ্রব্য লইয়া টানাটানি করে, তাহাকে অধার্ম্মিক পক্ষী বলিয়া মনে করি না। তাহাদের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ নাই।

মানুষের কার্য্যে তাহা আছে। এ দেশের একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবপতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবনে এরূপ এক মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, যখন তিনি উচ্চশ্রেণীতে থাকিবেন কি নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিবেন, এই সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং দুঃখের বিষয় যে সেই মহা মুহূর্ত্তে তিনি জ্ঞান পূর্ব্বক নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্যকে "অশ্বথামা হত" এই বাণীটি শুনাইবার মুহূর্ত্ত সেই মুহূর্ত্ত। সেই সন্ধিক্ষণে যুধিষ্ঠির দেখিলেন, তাঁহার সমক্ষে দুই পথ ও কার্য্যের দুই ফল উপস্থিত। হয় সৈন্যদল দ্রোণের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পরাভূত হইবে, না হয় দ্রোণকে নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে ও জয়শ্রী লাভ হইবে। এই কার্য্যদ্বয়ের মধ্যে যুধিষ্ঠির দোলায়মান-

চিত্তে কিয়ৎকাল অবস্থিত হইলেন। দেবতারা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, যুধিষ্ঠির উচ্চশ্রেণীতে থাকেন কি নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই জানা গেল যে যুধিষ্ঠির নিম্নশ্রেণীতে অবতরণ করিলেন; দ্রোণকে নিরস্ত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিবার আশয়ে "অশ্বত্থামা হত" এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন। যদিও পরে ক্ষীণস্বরে "ইতি গজ" বলিয়া কোনও প্রকারে সত্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধির মধ্যে যাহা ছিল, তাহাই তাঁহাকে নিম্নশ্রেণীতে অবতীর্ণ করিল।

যদি কেহ তর্কজাল বিস্তার করিয়া বলেন, যুধিষ্ঠিরের কার্য্যটা মন্দ কি হইয়াছিল? দ্রোণের সঙ্গে তাঁহারা যখন যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, তখন ত জানেন যে দ্রোণকে নিরস্ত বা পরাভূত করিতেই হইবে; যখন এইরূপ অবস্থা, তখন বিনা রক্তপাতে কৌশলে সে কার্য্য সাধন করা ত বুদ্ধিমানেরই কার্য্য হইয়াছিল কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য আংশিকরূপে মিথ্যা বলা নিন্দনীয় নহে। এরূপ যিনি বলেন, তাঁহাকে বলি তর্কে ফল কি? মানব-সাধারণের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, প্রতারণা পূর্ব্বক দ্রোণকে হত্যা করাকে মানবহৃদয় উচ্চশ্রেণীর কার্য্য মনে করে কিনা? আমি এইরূপ তর্ক আর একবার শুনিয়াছিলাম। আমেরিকা দেশে শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে গিয়া, তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসীদিগকে কি প্রকারে দলে দলে হত্যা করিয়াছেন, তাহার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এক একটী গ্রাম আবেষ্টন করিয়া, পশুযূথের ন্যায় সমগ্র গ্রামের পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ সকলকে হত্যা করিয়াছেন। এইরূপ করিয়াই আমেরিকাতে নব সভ্যতার অভ্যুদয় ও নবালোকের বিস্তার হইয়াছে। একবার ব্রাজিলনামক দক্ষিণ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ দেশের একজন উচ্চপদস্থ শুক্লকায় রাজপুরুষ সায়ংকালে আহারে বসিয়া নবাগত কতিপয় শুক্লকায় বন্ধুকে বলিলেন, অপরাপর সকলে বড় নির্ব্বোধ, আদিম অধিবাসীদিগকে হত্যা করিবার জন্য বারুদ গুলি ব্যয় করে। আমি তাহার কিছুই করি না। আমি একবার একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া একটা গ্রামের সমুদয় লোককে হত্যা করিয়াছিলাম। নবাগত বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৌশলটা কি? তখন পদস্থ পুরুষ যাহা বলিলেন, তাহা ইংরাজীতে যেরূপ পড়িয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি—Why, during the night, I

poisoned all their wells and in the morning they were all dead” অর্থাৎ রাতারাতি আমি ঐ গ্রামের সমুদয় কূয়ার জলে বিষ মিশাইয়া রাখিয়াছিলাম, পরদিন সমগ্র গ্রামের লোক মরিয়া গেল। এখানেও কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন, যদি অগ্রে স্বীকার কর যে আদিম অধিবাসীদিগকে মারা আবশ্যক, তাহা হইলে গোলা গুলির দ্বারা হত্যা করা অপেক্ষা গোপনে বিষ প্রয়োগের দ্বারা হত্যা করা কি ভাল নয়?

এরূপ তর্ক অবজ্ঞা পূর্ব্বক অবহেলা করিয়া আমরা সকলেই বলিতেছি যে, প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক দ্রোণকে হত্যা করা নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য হইয়াছিল। পুনরায় বলি, এইটুকুই মানুষের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব যে মানুষের নিকট দুই ভাবের দুইটা কাজ বা দুইটা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা আসিলে, মানুষ একটাকে উচ্চ ও অপরটাকে তুলনাতে নীচ বলিয়া মনে করে। আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য, প্রতিমুহূর্ত্তের চিন্তা ও প্রতিমুহূর্ত্তের ভাব এই প্রকারে উচ্চ বা নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে। আমরা নিরন্তর আপনারাই আপনাদের বিচারাসনে বসিয়া নিজেদের কার্য্যের শ্রেণী ভাগ করিয়া দিতেছি। যে স্বাভাবিক বৃত্তির সাহায্যে আমরা এইরূপ করিতেছি, তাহাকেই পণ্ডিতেরা বিবেক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা স্বতঃই অনুভব করি, নিঃস্বার্থতা উচ্চ, স্বার্থপরতা নীচ; সংযম উচ্চ, স্বৈরাচার নীচ; কর্ত্তব্যপরায়ণতা উচ্চ, কর্ত্তব্য জ্ঞানে অবহেলা নীচ; ঈশ্বরানুরাগ উচ্চ, বিষয়াসক্তি নীচ। যে গ্রন্থকারের উল্লেখ আমি অগ্রে করিয়াছি, তিনি যে যুধিষ্ঠিরকে উক্ত প্রবঞ্চনার জন্য নিম্ন শ্রেণীতে গণনা করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, তিনি মনে করেন, উক্ত কার্য্যের দ্বারা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের ভূমি ছাড়িয়া বিষয়ের ভূমিতে নামিয়াছিলেন।

মানবপ্রকৃতির প্রথম গূঢ় রহস্য এই যে, আমরা আমাদের কার্য্য, চিন্তা ও ভাবের মধ্যে স্বতঃই উচ্চ ও নীচ শ্রেণী দেখিতে পাই। দ্বিতীয় রহস্য এই, যাহাকে উচ্চ মনে করি, তাহাই স্বতঃ আমাদের হৃদয় ও আমাদের জীবনের উপরে আধিপত্য স্থাপন করে। ইহার প্রমাণ অন্বেষণ করিবার জন্য অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। জগতের মহাপুরুষগণের বিষয়ে একবার চিন্তা করুন। এক এক জনের জন্মগ্রহণের পর কত শত শত বৎসর অতীত হইয়া

গিয়াছে, এখনও মানবকুলের হৃদয়ের উপরে তাঁহাদের কিরূপ আধিপত্য বিদ্যমান রহিয়াছে! পৃথিবীর কোন্ রাজার বা কোন্ সম্রাটের প্রজাসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অথবা খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর হৃদয়েশ্বর যীশুর? আজ যদি জগতে সংবাদ প্রচার হয় যে, যীশু আবার সশরীরে ধরাতে আসিয়াছেন এবং এক নিশান উত্থিত করিয়া এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন যে, যাহারা তাঁহার অনুগত, তাঁহার সৈন্যদলভুক্ত, যাহারা তাঁহার জয় চায়, সকলকে সেই নিশানের তলে দাঁড়াইতে হইবে। তিনি নিজের শিষ্য গণনা করিতে আসিয়াছেন। তাহা হইলে সকলে কি মনে করেন? সেই সৈন্যদল কিরূপ হয়? পৃথিবীর মণিমুকুটভূষিত মস্তক সকলের আভাতে, বীরগণের বীরত্ব অর্জ্জিত তারকাবলীর শোভাতে, জ্ঞানিগণের জ্ঞানোজ্জ্বল মুখশ্রীতে, প্রেমিক প্রেমিকাদিগের প্রীতি-বিকশিত নেত্রপংক্তিতে সে সৈন্যদল কি সুশোভিত হইয়া যায় না? এতটা আধিপত্যের মূল কোথায়? কোন্ আকর্ষণে, কোন্ প্রলোভনে জগতের লোক এই সূত্রধর-তনয়কে প্রাণ দিয়াছে? কি আকর্ষণে, কি প্রলোভনে নবদ্বীপবাসী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-তনয়কে লক্ষ লক্ষ লোক এত ভাল বাসিয়াছে যে, এখনও "গৌরাঙ্গ এস হে, একবার সংকীর্ত্তনের মাঝে এস হে," বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে? কি আকর্ষণে, কি প্রলোভনে, পঞ্চনদবাসী একজন সামান্য বণিকের পুত্রকে লক্ষ লক্ষ লোকে প্রাণে এমনি স্থান দিয়াছে যে, "ওয়া গুরুজীকী ফতে" "গুরুজীর জয়" বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতেছে? মানবহৃদয়ের উপরে এতটা আধিপত্যের মূল কারণ কোথায়?

ইঁহারা যে কথা বলিয়া মানুষকে ডাকিয়াছেন, যে প্রলোভন দেখাইয়া সকলকে পাগল করিয়াছেন, সে বিষয়ে যখন ভাবি, তখন দেখি যে সচরাচর সংসারের লোকে যাহা চায়, যাহাকে প্রলোভন মনে করে, ইঁহারা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিয়াছেন। লোকে চায় ভাল খাব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব। ইঁহারা বলিয়াছেন, "আমার সঙ্গে যদি আসিবে, তবে দুঃখ কষ্টের বোঝা মাথায় উঠাইতে প্রস্তুত হও"। লোক চায়, দশজনে মানুক্ গণুক্ ও শ্রদ্ধা করুক, ইঁহারা বলিয়াছেন, "আমার সঙ্গে যদি এস, তবে নির্যাতন ও নিষ্পীড়ন সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হও"। যীশুর সঙ্গে কয়েকজন লোক যাইতেছিল, যীশু

ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইবে? তাহারা বলিল, "গুরো! আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব।" যীশু হাসিয়া বলিলেন, "পাখীর বাসা আছে, শিয়ালের গর্ত্ত আছে, কিন্তু আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" পৃথিবীর সেনাপতিগণ সৈন্য সংগ্রহ করিবার সময় প্রলোভন দেখাইয়া বলেন "এস বেতন পাইবে, তদুপরি যুদ্ধে গৌরবলাভ করিবে, লুঠ তরাজ করিতে পারিবে, নানা দেশের নানা সম্পদ অধিকার করিবে," কিন্তু ঈশ্বরনিযুক্ত এই সেনাপতিগণ বলিয়াছিলেন;—"দারিদ্র্য, নির্যাতন, নিগ্রহ এই সমুদয়কে বরণ কর, করিয়া আমাদের সৈন্যদলে প্রবেশ কর।" মানুষ তাহাই করিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, যাহারা বলিয়াছে এস, পেট ভরিয়া খাইতে দিব, জগত তাহাদের আহ্বানধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিল না, যাঁহারা বলিলেন, এস অনাহারে থাকিবে, তাঁহাদের চরণেই গিয়া পড়িল! যাহারা বলিল এস, যথেষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা করিতে পারিবে, তাহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল না, যাঁহারা বলিলেন, এস, সংযমের দড়িতে তোমাদিগকে বাঁধিব, তাঁহাদের দ্বারা বদ্ধ হইবার জন্য গেল! যাহারা বলিল এস, এরূপ গৌরব দিব যে, মস্তক উন্নত করিয়া ত্রিসংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিবে, তাহাদের নিকটে গেল না, যাঁহারা বলিলেন, যদি উন্নত হইবে তবে নত হও, বিনয়ে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহাদের হস্তেই আত্মসমর্পণ করিল!

ইহার অর্থ কি এই নয় যে, আমরা যে কার্য্য, যে চিন্তা বা যে ভাবগুলিকে উচ্চ বলিয়া জানি, আমাদের হৃদয়ের উপরে সেগুলির এমনি স্বাভাবিক আধিপত্য যে, আমরা যে মানবে সেগুলিকে লক্ষ্য করি, স্বতঃই তাঁহার অধীন হইয়া পড়ি? যিনি আমার জীবনের উচ্চ আদর্শকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া আমার সমক্ষে ধারণ করেন, তিনিই ত আমার স্বাভাবিক গুরু ও আমার হৃদয়ের রাজা। বিধাতা মানব-হৃদয়কে স্বভাবতঃ ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। একবার চীনদেশীয় একজন রাজা জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্ঞানিবর! রাজ্যশাসনের জন্য স্থল বিশেষে বিদ্রোহিদলকে হত্যা করা কি আবশ্যক নহে?" কংফুচ উত্তর করিলেন, "হে রাজন্! আপনি মানুষকে হত্যা করিবার বিষয়ে কেন বুদ্ধিকে প্রেরণ করেন, আপনি ধর্ম্মের উচ্চনীতি অনুসারে রাজ্য শাসন করুন, দেখিবেন বায়ুর অগ্রে

শস্তক্ষেত্র যেরূপ নত হয়, আপনার অগ্রে প্রজাগণ সেইরূপ নত হইবে।" কংফুচ মানব-প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি জানিতেন, মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত।

ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, মানব-হৃদয়বাসী ঈশ্বরের প্রকাশ মাত্র। যেমন ধূম চুল্লীস্থিত অগ্নির নিশ্বাস মাত্র, তেমনি উচ্চ প্রকৃতি, উচ্চ আদর্শ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ সংকল্প যে নামেই প্রকাশ কর না কেন, তাহা হৃদিস্থিত ঈশ্বরের নিশ্বাস মাত্র, তিনি আত্মাতে সন্নিহিত আছেন বলিয়া, আমরা ধর্ম্ম-প্রকৃতি পাইয়াছি, এবং আমাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের এত আধিপত্য।

যদি মানব-হৃদয় স্বভাবতঃ ধর্ম্মের অনুগত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে ও ধর্ম্ম প্রচার করিতে এত চিন্তা কর কেন? ডাক, মানুষকে সাহস করিয়া ডাক, যদি প্রলোভন দেখাইতে হয়, বৈরাগ্যের প্রলোভন দেখাও। বল, ঈশ্বরের নামে ডাকিতেছি কে আত্মসমর্পণ করিবে এস, কে প্রজ্বলিত হুতাশনে শলভত্ব পাইবে এস, কে দারিদ্র্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের সেবা করিবে এস, কে সংসারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চিরবৈরাগ্যের বাস পরিবে এস। মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহা কি এই মানুষগুলির পক্ষে অস্বাভাবিক হইয়াছে? এই কি মনে করিব যে, ইহারা ঈশ্বরের আহ্বান ধ্বনিতে আর জাগে না, বিষয়ের বংশীরবেই জাগে? এরূপ কখনই মনে করিতে পারি না। কারণ এখনও ডাকিবার লোক পাওয়া যাইতেছে না। যে ডাকে তাহার গলার স্বরেই চেনা যায় সে কি ভাবে ডাকিতেছে। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ডাকিয়াছিলেন, লোকে পাগলও হইয়াছিল, কারণ ডাক শুনিয়া বুঝিয়াছিল, আগে আপনাকে দিয়াছে, তৎপর ডাকিতেছে। তোমার আমার ডাকে মনে করে, আপনাকে বাঁচাইয়া ডাকিতেছে। তাই সাড়া দেয় না। নিশ্চয় বলিতেছি, ধর্ম্মে আত্মসমর্পণ কর, তৎপরে ডাক, দেখিবে ডাক শুনিবে। হে ভীরু, হে অল্পবিশ্বাসি, তুমি অকপটচিত্তে ধর্ম্মকে আশ্রয় কর। তুমি ধর্ম্মের আধিপত্যে আপনাকে অর্পণ কর, ফলাফল গণনা করিও না। চরমে দেখিবে তোমার ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে।

আসল ও নকল।

আমরা যদি মিথ্যাতে এতটা বিশ্বাস না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হইত। এ জগতে এক প্রকার হইয়া আর এক প্রকার দেখান যায়, এবং দেখাইয়া মানুষকে চিরপ্রবঞ্চনার মধ্যে রাখিতে পারা যায়, ইহা যদি মানুষ না ভাবিত তাহা হইলে ভাল হইত। কারণ তাহা হইলে মানুষ নকল ছাড়িয়া আসলটা ধরিবার জন্য ব্যগ্র হইত। আমরা অনেকে যে এ জগতে সারবান্ চরিত্র লাভ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, নিরেট খাঁটী বস্তুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস অল্প। নিরেট খাঁটি বস্তুটুকুই জগতে থাকে, জগতে দাঁড়ায় ও কাজ করে; নকল যাহা তাহা তুষের ন্যায় বায়ুতে উড়িয়া যায়, চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত হয়।

বিধাতা এ জগতে আসলে নকলে, আলোকে অন্ধকারে, সাধুতাতে ও অসাধুতাতে কেন মিশাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। রামের সঙ্গে একটা রাবণ কেন আছে, তাহা সম্পূর্ণ জানি না। বোধ হয় এই জন্য যে রাবণকে না দেখিলে রামের মূল্য ভাল করিয়া বুঝা যায় না, রাবণকে পরিহার করিয়া রামকে ধরিতে হইবে, এ জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না; কিংবা এ কথাতেও কিছু সত্য থাকিতে পারে যে, পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে না পারিলে পুণ্যের বল বাড়ে না। আমি একবার একটী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বক্তা বলিলেন, মানবের যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার সকলের সঙ্গেই অসার ভাগ আছে, অর্থাৎ যাহা পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা দৈহিক ধাতুপুঞ্জের সহিত একীভূত হয় না, যাহাকে সময়ান্তরে দেহ হইতে বর্জ্জন করিতে হয়, এমন অনেক দ্রব্য আছে। এখন প্রশ্ন এই, যাহা অসার, যাহা এক সময় দেহ হইতে বর্জ্জন করিতেই হইবে, তাহা মানবের খাদ্যের সহিত মিশিয়া রহিল কেন? প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলিলেন, ঐ অসার ভাগগুলি থাকার জন্য সারবস্তুগুলি কার্য্য করিতে পায়, ওগুলি না থাকিলে পুষ্টিকর সামগ্রীগুলি সে প্রকার জোরের সহিত কার্য্য করিতে পারিত না। তৎপরে এবিষয়ে অনেক চিন্তা

করিয়াছি। অনুভব করিয়াছি যে বিধাতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে এরূপ ব্যবস্থাই আছে, একটী সার বস্তুকে বলবান করিবার জন্য দশটী অসার তাহার চারিদিকে থাকে। যেমন মানুষ যখন পাখীটাকে মারিবার জন্য বন্দুকে গুলি পোরে, তখন অনেক সময়ে দেখি যে এক মুঠা গুলি তাহার মধ্যে দিল। কিন্তু পাখিটী যখন মরে, তখন একটী বা দুইটী গুলিতেই মরে। যদি সে বিংশতিটীগুলি বন্দুকের মধ্যে দিয়া থাকে,তবে দুইটী কাজে লাগিল আর অষ্টাদশটী বৃথা গেল। কিন্তু সম্পূর্ণ বৃথা কি গেল ? কখনই না। সেই অষ্টাদশটী গুলি বন্দুকের মধ্যে থাকাতে সংঘর্ষণের প্রভাবে অপর দুইটীর বলবৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিয়াছে ; সেইরূপ চিন্তা করিয়া দেখ, এজগতে যত প্রাণী জন্মিতেছে, সকলে কি কাজ করিতেছে ? যত প্রাণী এ জগতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলে যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে অচির কালের মধ্যে ভুবন ভরিয়া যায়। অধিক কি, পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে হস্তীর শাবক অনেক বিলম্বে হয়, সেই হস্তীর শাবক সকল যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে একশত বৎসরে হস্তীতে জগতের অধিকাংশ স্থান ভরিয়া যায়। বর্ষাকালে আমরা পথে ঘাটে কত ভেক শিশু দেখিতে পাই, দেখি কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেক চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াই-তেছে, অন্যমনস্ক ভাবে পা বাড়াইতে গেলেই, তাহাদিগকে মাড়াইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। অথবা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কোন কোন সময়ে গঙ্গার জলে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলীরক দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, কলসটী বুড়াইতে গেলেই তন্মধ্যে অনেক কুলীরক যায়। কাপড় দিয়া জল ছাঁকিলেই রাশি রাশি কুলীরক উঠে। এখন প্রশ্ন এই, এত ভেকশিশু বা এত কুলীরক কোথায় যায় ? সকলগুলি কি জীবিত থাকে ? সকলগুলি জীবিত থাকিলে কি আর আমরা পা বাড়াইতে পারি, বা গঙ্গাজলে অবগাহন করিতে পারি ? নিশ্চয় এতগুলি জন্মে বাঁচিবার জন্য নহে, অল্পসংখ্যক থাকিবে, বহুসংখ্যক মরিবে এই জন্য। এখন কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি তাহারা মরিবে তবে বিধাতা তাহাদিগকে জগতে আনিলেন কেন ? উত্তর ঐ বন্দুকের গুলির দৃষ্টান্তের মধ্যে। অষ্টাদশটীর দ্বারা দুইটীকে বলবান করিয়া লইবেন বলিয়া। ইহাকেই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, জীবন-সংগ্রাম বা struggle for existence.

জীবন-সংগ্রাম যেমন জীব-জগতে আছে, যে জীব চলিয়া যায়, সে যে থাকে তাহাকে সবল করিয়া রাখিয়া যায়, তেমনি আসল ও নকলে জীবন-সংগ্রাম আছে। নকল চলিয়া যায়, আসলকে বলশালী করিয়া রাখিয়া যায়। রাবণ মরিয়া যায়, কিন্তু রামকে জয়শালী করিয়া রাখিয়া যায়। বিধাতার অভিপ্রায় যাহাই হউক, মানব-জীবনে দেখিতেছি, মানব-ইতিবৃত্তে দেখিতেছি, ঈশ্বরের এই সত্যময় জগতে নকলের, অসত্যের বাঁচিবার ব্যবস্থা নাই। ইহা দেখিয়াই ঋষিরা বলিয়াছিলেন ;—

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোনৃত মভিবদতি।"

যে অসত্যকে আশ্রয় করে সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়। অর্থাৎ মূলহীন বৃক্ষের যেমন এ জগতে বাঁচিবার উপায় নাই, তেমনি যাহা মিথ্যা, যাহা ছায়া. যাহা নকল, তাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। তবে নকল কিছুকাল আসলকে ঘিরিয়া তাহার শক্তি ও মূল্য বাড়াইয়া দেয় এইমাত্র।

নকল মানবসমাজে ঘুরিয়া বেড়ায় বটে, চাকৃচিক্যদ্বারা অনেক সময়ে চিত্ত হরণ করে বটে, কিন্তু মানব-প্রকৃতি কাহাকে চায়? কাহার আদর করে? গতবারে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, সেই দৃষ্টান্ত এবারেও দিতেছি। জগতের সাধু-মহাজনদের শিষ্য সংখ্যা যে এত, তাহাতে কি প্রমাণ হয়? জগতের লোক কাহাকে ধরিয়াছে? জগতে ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান, কৃতী, যশস্বী লোক ত কত জন্মিয়াছে, তাহাদের পশ্চাতে জগদ্বাসী এত যায় নাই কেন? এক এক জন সাধুর পশ্চাৎ হইতে মানুষদিগকে ফিরাইবার জন্য কি চেষ্টাই না হইয়াছে। যীশুর শিষ্যগণ যখন একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া মাথা তুলিলেন, তখন উঠিয়াই দুইটী প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম গ্রীকদিগের সভ্যতা ও জ্ঞানাভিমান, দ্বিতীয় রোম সাম্রাজ্যের রাজশক্তি। গ্রীক জ্ঞানাভিমানিগণ এই নব সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অজ্ঞ বলিয়া হাসিয়া উড়াই-বার চেষ্টা করিলেন, রোমের রাজশক্তি দেববিদ্বেষী জ্ঞানে ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাসত্বেও সেই সূত্রধর-তনয়ের রাজ্য ও প্রজা সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইহা কি ইতিহাসের একটা আশ্চর্য্য ঘটনা নয়? রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে রামকে হতচেতন করিয়া, ভাবিয়া

গেল, যে রাম মরিয়াছে, পরক্ষণেই সংবাদ আসিল, রাম আবার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান, তখন রাবণ বলিল :—

"মরিলেও না মরে রাম এ কেমন বৈরি ?"

জগতের সাধুদের শক্তি সম্বন্ধে কি এই দশা ঘটে নাই ? যখন পৃথিবীর রাজারা ভাবিতেছেন, আগুন নিবাইয়াছি, বিনাশ করিয়াছি, তখন আর এক-দিকে আগুন লাগিয়া গিয়াছে। রোমের সম্রাট খৃষ্টীয়ানের দল নিঃশেষ করিবার জন্য রাজবিধি প্রচার করিলেন, ওদিকে তাঁহার রাজপরিবারের লোকেরা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। এ ব্যাপারের মধ্যে কি গূঢ় অর্থ নাই ? মহম্মদকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য, পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিবার জন্য, মক্কাবাসিগণ চেষ্টা করিতে ক্রুটী করে নাই ; কিন্তু যতই চেষ্টা করে, ততই মহম্মদের শক্তি বাড়িয়া যায়, ইহার মধ্যে কি অর্থ নাই ? অর্থ এই, মানব-প্রকৃতি আসলকে ভাল বাসে, যেখানে খাঁটি ঈশ্বর-প্রীতি, খাঁটি নিঃস্বার্থতা দেখিতে পায়, সেখানেই সেরূপ মানুষের পায়ে গড়াইয়া পড়ে।

মানব-হৃদয়ের সাধু-ভক্তির বিষয়ে যখনই চিন্তা করি, তখনই অনুভব করি যে, মানব-হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের অনুগত। ঈশ্বর আপনার সন্তানকে আপনার কাছে কাছেই রাখেন। সাধুভক্তি কখন কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হয় বটে, সাধুতার নকল দেখিয়া ভোলে বটে, কিন্তু সে ভোলাতেও প্রকাশ করে, মানব-হৃদয়ের পক্ষে আসলটার কত আকর্ষণ। আসলকে আমরা এতই ভালবাসি যে, তাহার নকল দেখিয়াই ভুলিয়া যাই। মানবহৃদয় ধর্ম্মের এতই অনুগত যে, তাহাকে উত্তমরূপে প্রবঞ্চনা করিতে হইলে, ধর্ম্মের কঞ্চুক পরিতে হয় ; মহীরাবণ যেমন বিভীষণের রূপ ধরিয়া গিয়াছিল, তেমনি ধর্ম্মের বেশ ধরিয়া মানবহৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয়। জগতে মানুষ মানুষকে অনেকস্থলে ঠকাইয়াছে ও প্রতিদিন ঠকাইতেছে, কিন্তু সকল প্রবঞ্চনার মধ্যে সেই প্রবঞ্চনা সাংঘাতিক, যাহা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের বেশে, ধর্ম্মের আকারে আসে, এবং এরূপ প্রবঞ্চক সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। আসল জিনিষ যাহা তাহার প্রতি যদি মানুষের প্রাণে প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে তাহার নকল দেখাইয়া মানুষ এতদূর প্রবঞ্চনা করিতে পারিত না। এবিষয়ে এদেশে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। তাহা এই :—

কোনও স্থানে একজন মুসলমান নবাব ছিলেন, তাঁহার এক বিবাহোপযুক্তা প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ছিলেন। ঐ কন্যা রূপলাবণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবাব এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে সাচ্চা ফকীর অর্থাৎ প্রকৃত নির্লোভ পুরুষ যদি পান, তবে তাঁহার হস্তে কন্যাকে অর্পণ করিবেন। এই মানসে নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে কোনও ফকীর আসিলেই নবাব তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেন। তাঁহাকে নানাপ্রকার মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন, বিবিধ মূল্যবান খাদ্য বস্তু যোগাইতেন, কিংবা তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিতেন। যদি ফকীর উপহারাদি গ্রহণ করিতেন বা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য রাজভবনে পদার্পণ করিতেন, তাহা হইলে নবাবের বিশ্বাস জন্মিত যে, ফকীর নির্লোভী পুরুষ নহেন, আর তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন না। এইরূপে কত ফকীর আসিল ও গেল। নবাব-কন্যার বর আর জুটিল না। অবশেষে এক রাজকুমার ঐ কন্যার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আসিলেন। তিনি নবাবের পূর্ব্বোক্ত পণের কথা জানিতেন না। তিনি সরলভাবে আসিয়াই বলিলেন, "আমি অমুক স্থানের নবাবের পুত্র, আপনার কন্যার রূপগুণের কথা অনেক শুনিয়াছি, তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। নবাব বলিলেন, "সাচ্চা ফকীর না হইলে আমার কন্যা দিব না।" রাজকুমার ভগ্নমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে প্রায় দুই তিন বৎসর পরে নবীন বয়সের এক ফকীর নবাবের রাজধানীর সন্নিকটে দেখা দিলেন। তাঁহার ফকীরের বেশ, ফকীরের জীবন, কিন্তু দেহ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, মুখে প্রতিভার জ্যোতি, আচার ব্যবহারে সম্ভ্রান্ত বংশজাত ব্যক্তির লক্ষণ। এই ফকীর রাজধানীর সন্নিকটে আসিবামাত্র ঐ সংবাদ নবাবসাহেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি প্রথমে মহামূল্য পরিচ্ছদ ও বিবিধ খাদ্য সামগ্রী উপহার পাঠাইলেন। নবীন ফকীর ঐ সকল দেখিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের নবাব কি আমাকে তাঁহার ধন সম্পদ দেখাইতে চান? আমি ফকীর মানুষ, আমার এ সকল দ্রব্যে প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাঁহার নিকটে যে সকল লোক বসিয়াছিল, তাহাদিগকে সে সকল দ্রব্য লুটাইয়া দিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে নবাবের মনে বড়ই আনন্দ হইল, ভাবিলেন, আমার কন্যার বর এত দিনে জুটিয়াছে। তৎপরে নবাব ফকীরকে আরও পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে রাজভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া

পাঠাইলেন। ভৃত্যেরা গিয়া বলিল, "নবাব সাহেবের নিবেদন, আপনাকে দয়া করিয়া একবার রাজভবনে পদার্পণ করিতে হইবে।" ফকীর আবার হাসিয়া বলিলেন, "এত লোক আমার নিকটে আসে, কত ধর্ম্মালাপ হয়, এ সকল ফেলিয়া আমি রাজভবনে যাইব, সে কিরূপ? তোমাদের নবাবের ইচ্ছা হয় তিনি আমার নিকট আসুন।" নবাব এই উত্তর যখন পাইলেন, তখন তাঁহাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে নবাব উক্ত প্রস্তাব লইয়া স্বয়ং ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু ফকীর প্রস্তাব শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নবাব সাহেব, আপনার স্মরণ হয়, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে অমুক দেশের রাজকুমার আপনার কন্যার পাণি-গ্রহণার্থী হইয়া আসিয়াছিল?" নবাব বলিলেন, হাঁ। ফকীর বলিলেন, "এই যাহাকে ফকীরের বেশে দেখিতেছেন, এ সেই ব্যক্তি। আপনার কন্যাকে পাইবার জন্যই আমি ফকীরের বেশ ধরিয়াছি, নানা তপস্যা করিয়াছি, নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছি, ফকীরের রীতি নীতি শিখিয়াছি, অবশেষে আপনার রাজধানীর সন্নিকটে আসিয়াছি। 'কিন্তু আপনার ভৃত্য চলিয়া যাওয়ার পর, এই কয় দিনে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমি ভাবিতেছি, যে জিনি-সের নকলের এত আদর, সেই ধর্ম্মের আসল কি তাহা একবার দেখিব, আমি আর আপনার কন্যার পাণিগ্রহণপ্রয়াসী নই, এখন যে নূতন ব্রত আমার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহাই আমি সাধন করিব, আমি এখন স্থানান্তরে চলিলাম।"

নকলের যদি এত আদর, তবে আসল না জানি কি! এ জগতে আসল যাহা তাহারই শক্তি, তাহাই স্থায়ী। মানুষ আপনাকে না জানিয়া অনেক আশা করে, যাহা নিজের প্রাপ্য নহে, তাহাও পাইতে চায়, কিন্তু চরমে দেখি তাহাতে খাঁটি জিনিস যতটুকু আছে, আসলে সে যতটুকু পাইবার যোগ্য তাহাই পায়। যে মৃত্যুর পূর্ব্বে না পায় সে পরে পায়; বিধাতার রাজ্যে আসল জিনিসের মার নাই। রামমোহন রায় যখন একাকী খাটি-লেন, লোকে বলিল, ওটা কোনও কর্ম্মের মানুষ নয়, ওটা অকালকুষ্মাণ্ড, দেশের শত্রু, মরিয়া গেলে ওর কাজ কর্ম্মের চিহ্নও থাকিবে না। সম-কালবর্ত্তী বাঙ্গালিরা বলিল, "বড়লোক যদি দেখিতে চাও, তবে রামদুলাল সরকারকে দেখ, বিশ্বনাথ মতিলালকে দেখ, যাহারা সামান্য অবস্থা হইতে

উঠিয়া লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইয়াছে। রামমোহন রায় কিসের বড়লোক? একটু মেধা আছে, একটু মার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, একটু শাস্ত্রীয় বিচারের শক্তি আছে এই মাত্র।" কিন্তু ইতিহাস কি বলিল? রামমোহন রায়ে যে খাঁটি বস্তুটুকু ছিল, তাহার আদর দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে। এখন লোকে বলিতেছে, শঙ্করের পরে এমন ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ভারতে জন্মে নাই, এবং হৃদয়ের প্রশস্ততা ও মানবপ্রেমে এরূপ মহৎ লোক, জগতের আর কুত্রাপি জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। দেখ, আসল বস্তুর আদর হইতেছে কিনা?

অতএব এস, আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই; বাক্য অপেক্ষা কার্য্যকে শ্রেয় মনে করি; বাহিরের দম্ভ অপেক্ষা ভিতরের শক্তির প্রতি অধিক নির্ভর করি। কাজে যতটুকু করি ততটুকুকেই আপনাদের প্রকৃত সম্পত্তি বলিয়া মনে করি। বিষয়ী লোকে কি ছায়া দেখিয়া ভোলে? একজন লোক বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়াছিল, সেখান হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। কেহ বলে এক লাক, কেহ বলে দেড় লাকের কম ত নয়, কেহ বা বলে যতটা শোনা যায় ততটা নয়, পঞ্চাশ হাজারের অধিক হইবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আনিয়াছে, সে জানে তাহার সম্পত্তি ত্রিশ হাজার মাত্র। সে কি পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ সমালোচনার প্রতি কর্ণপাত করে? সে আপনার কোমরের জোর কত তাহা জানে, যে কাজই করুক না কেন, ঐ ত্রিশ হাজারকে মনে রাখে, ও তাহার মত কাজই করে। ধর্ম্মজীবন বা ধর্ম্মসমাজ বিষয়েও আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যে নগদ যতটুকু আছে, ততটুকুই শক্তি, পুষ্পিত বাক্যে যতই বলি না, কাজে দাঁড়ায় না। এস আমরা নকল ছাড়িয়া আসলের প্রতি মনোযোগী হই।

সারবান ধর্ম্মজীবনের পথের বিঘ্ন।

গত বারে আসল ও নকল সম্বন্ধে কিছু বলা গিয়াছে, কিন্তু কিরূপে ধর্ম্ম-জীবনে অসারতা প্রবেশ করে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা ভাল। প্রাচীন কালের ভক্তিভাজন ঋষিগণ আমাদিগকে এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ;—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎকবয়ো বদন্তি।"

অর্থ—পণ্ডিতগণ এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ শাণিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া যদি কেহ চলে, তবে যেমন তাহাকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, এ পথও তেমনি। আর একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা এই দুর্গমতা কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম-জীবনের পথে চলা যেন দড়িবাজির ন্যায়। দড়িবাজি অনেকেই দেখিয়াছেন। একটী ভারি দ্রব্য স্কন্ধে লইয়া বা একটী জল পূর্ণ কলস মস্তকে করিয়া যে দড়ির উপর দিয়া চলে, তাহাকে কিরূপ সতর্ক থাকিতে হয়! হস্তস্থিত তুলা-যষ্টি গাছির উপর কিরূপ দৃষ্টি রাখিতে হয়! সে ব্যক্তির মনে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকে, যে সেই তুলাযষ্টিগাছি একটু স্বস্থানচ্যুত হইলেই সর্ব্বনাশ। তেমনি সারবান ধর্ম্মজীবন যাঁহারা লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকেও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় ; কতকগুলি বিষয়কে ভয়ের চক্ষে দেখিতে হয়।

প্রথম, ভয় করিতে হয় মানুষের দৃষ্টিকে। জনসমাজে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে গেলেই দশ জনের দৃষ্টি আমাদের উপরে থাকে। এক প্রকার বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের পক্ষে ইহাতে ঘোর বিপদ। এ জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা এ জীবনে সর্ব্বদাই অভিনয় করিতেছে, অর্থাৎ তাহাদের চিত্তের উপরে মানুষের প্রশংসার এমনি উন্মাদিনী শক্তি, যে দশজনে যাহা চায়, তাহারা অজ্ঞাতসারে সেইরূপ হইয়া যায়। লোকের বাহবাতে তাহা-দিগকে নাচাইয়া তোলে। যত অধিক বাহবা পড়িতে থাকে, ততই তাহাদের

ন্যূনের মাত্রা বাড়িয়া যায়। মানুষের ভালারে ভালারে শব্দ যেন নিরন্তর তাঁহাদের কাণে বাজিতে থাকে ও তাহাদিগকে গঠন করিতে থাকে। এই নীরব "ভালারে ভালারে" শব্দের এমনি আশ্চর্য্য শক্তি যে ইহার প্রভাবে এ জগতে অতি মহৎ মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। ইহার প্রভাবে, আশ্চর্য্য স্বার্থনাশ, অদ্ভুত সাহস, ঘোর বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা সমুদয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এ দেশে চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে বাণফোড়া ও চড়ক পাকের রীতি ছিল, লোকে লৌহশলাকার দ্বারা আপনার পৃষ্ঠে দুইটী প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে রজ্জু দিয়া, তদবস্থাতে চড়কগাছে ঝুলিত ও পাক খাইত। আমরা দেখিয়াছি, যতই চতুর্দ্দিকের লোকে তাহাকে বাহবা করিত, ততই ঐ দোদুল্যমান ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "ডেভিল ডান্সিং" নামে একপ্রকার ক্রীড়া করে; মুখের মধ্যে জলন্ত অগ্নি পুরিয়া নাচিতে থাকে। শুনিয়াছি চারিদিকের লোকের বাহবাতে তাহা-দিগকে এতই উত্তেজিত করে যে,তাহারা নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া যায়। "ভালারে ভালারে" শব্দের প্রভাব যে কেবল এই সকল স্থানেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, ভালারে শব্দের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তিদ্বারা কত সহমৃতা সতীর সাহস, কত সমরজয়ী বীরের শৌর্য্য ও কত ধর্ম্মজগতের নেতার বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাব গঠিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এই শ্রেণীর মানুষের কর্ম্মকে এই জন্য অভিনয় শব্দে অভিহিত করিয়াছি যে অভিনেতৃগণ যেরূপ দর্শকের দৃষ্টি ও প্রশংসার দ্বারা আপনাদিগকে চালিত ও গঠিত করিয়া থাকে,ইহারাও অজ্ঞাত-সারে তাহাই করেন; কিন্তু অভিনয়ের দ্বারা সারবান ধর্ম্মজীবন কখনই লাভ করা যায় না। এজন্য সমাজে থাকিয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে গিয়া, মানবের দৃষ্টিকে সর্ব্বদা জয় করিতে হইবে। ধর্ম্ম সাধন করিবার সময়ে মানুষ আমাকে কেমন দেখিতেছে, ইহা ভুলিয়া যাইতে হইবে। সাধনের সময়ে সজনে থাকিয়াও নির্জ্জন হইতে হইবে। লোকের দৃষ্টি চিত্তের উপরে কার্য্য করি-তেছে কিনা, সতর্ক হইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়, জয় করা চাই কল্পনাকে। আর এক শ্রেণীর লোক জগতে আছে, যাহাদের প্রকৃতির মধ্যে কল্পনার মাত্রা কিছু অধিক। ধর্ম্মজীবনের লক্ষ্য স্থলে যে অবস্থা বা যে আদর্শ থাকে, সেই অবস্থা বা সেই আদর্শ তাঁহাদের চিত্তকে

এতদূর অধিকার করিয়া বসে যে, তাঁহারা সেই আদর্শের বিষয় ভাবিয়া ও তাহার প্রসঙ্গ করিয়া সেই সুখেই নিমগ্ন থাকেন, তাহা জীবনে লাভ করিবার জন্ত যে সংগ্রাম করিতে হইবে, সে কথা আর মনে থাকে না। ইহা কিরূপ তাহারও একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একব্যক্তি গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আর একজন যান নাই, দুই জনে বন্ধুতা আছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কল্পনাপ্রবণ লোক। তিনি গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন আসিয়া প্রথমোক্ত বন্ধুর সহিত দার্জ্জিলিং পাহাড়ের বায়ু কিরূপ ঠাণ্ডা,—সেখানে কিরূপে গ্রীষ্মকালেও রাত্রে কম্বল ব্যবহার করিতে হয়,—সেখানে কিরূপ হৈমন্তিক শস্ত সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে ইত্যাদি বিবরণ শ্রবণ করেন, ও ভাবে মগ্ন হইয়া "আহা আহা" করিতে থাকেন। সেই ভাবমগ্নতা এত অধিক যে, তিনি সে সময়ের জন্ত গ্রীষ্মের উত্তাপ ভুলিয়া যান; যেন কলিকাতার গ্রীষ্মে বসিয়া দার্জ্জিলিঙ্গের শৈত্য কিয়ৎ পরিমাণে ভোগ করেন। একবার মনে হয় না, আচ্ছা দার্জ্জিলিঙ্গের শৈত্যের বিষয় শুনিয়া কি হইবে, আমি কেন একবার ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দার্জ্জিলিং যাই না। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ এক শ্রেণীর মানুষ আছেন। তাঁহারা কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্বদাই সপ্তম স্বর্গে উঠিতেছেন; সকল প্রকার কার্য্য, শ্রম, ও সাধনোপায় বর্জ্জন করিয়া স্বীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বসিয়া প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে প্রতিদিন সপ্তম স্বর্গে যাইতেছেন। এই শ্রেণীর সাধক ও সাধনপদ্ধতি বহুকাল হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। এই কল্পনাপরতাকে ভয় করিতে হইবে, কারণ ইহা সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের বিরোধী।

তৃতীয়, ভয় করিতে হইবে ভাবুকতাকে। আর এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাঁহাদের প্রকৃতিতে ভাবের মাত্রা কিছু বেশী। একটা কথা শুনিতে না শুনিতে, একটা অবস্থা আসিতে না আসিতে, তাঁহাদের ভাব উছলিয়া উঠে। তাঁহারা যেন না পাইয়াও পেয়েছি পেয়েছি বলিয়া ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়েন। "এই ত হৃদয়ে রে" এই সঙ্গীত যেই উঠিয়াছে, অমনি তাঁহাদের বোধ হইতেছে যেন সত্য সত্যই ঈশ্বরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। চিত্তের এই ভাবপ্রবণতার দুই বিপদ আছে, প্রথমে ইহাতে একপ্রকার ভ্রান্ত আত্মতৃপ্তি উৎপন্ন করে। চিত্ত ভাবেই পরিতৃপ্ত হইয়া মনে করে, ঈশ্বর সম্বন্ধে

ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা তাহা করিয়াছি; তাঁহারা ভাবের পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া জীবনদান জীবনরূপ অমৃতময় ফলের প্রতি উদাসীন। ভাবের মিষ্টতাই যখন তাহার প্রধান লক্ষ্য হয়, তখন সে তাহাই অন্বেষণ করে, ও তাহাতে পরিতৃপ্ত থাকে। ইহাকে ভাবুকতা বলে। যে ভাবের মিষ্টতাই চায়, ঈশ্বরের জন্য, তাঁহার আদেশ পালনের জন্য, তাঁহাতে প্রকৃত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপনের জন্য সেরূপ ব্যগ্র নহে, সেই ভাবুক। যেমন অনেক সুরাপায়ী সুরাজনিত নেশা টুকুই চায়, সুরা নামক পদার্থের প্রতি বিশেষ নির্ভর নাই, সুরা দ্বারা যে নেশা হয়, ইথর, বা ওডিকলোং খাওয়াইয়া যদি সেই নেশাটুকু করিয়া দিতে পায়, তবে ইথর বা ওডিকলোংই ভাল, সুরাতে প্রয়োজন কি? তেমনি এই শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এই—ঈশ্বরের নামে ভাবের যে মিষ্টতা হই-তেছে, যদি সাকার পূজাতে তাহা হয় বা তদপেক্ষা অধিক হয়, তবে ঈশ্বরকে লইয়া মারামারি করাতে কাজ কি? সুতরাং ইহাদের পক্ষে নিরাকার হইতে সাকারে বা সাকার হইতে নিরাকারে গড়াইয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ভাবুকতা যে কেবল ধর্ম্মজীবনের আদর্শ সদ্‌গুণ লাভের পক্ষেই ব্যাঘাত করে তাহা নহে, দোষ পরিহার বিষয়েও সমূহ ব্যাঘাত করে। অপরের চরিত্রে যে দোষ দেখিয়া তীব্র ভাবের উদয় হয়, আপন চরিত্রে যে তাহা আছে, তাহার প্রতি অন্ধ রাখে। ধর্ম্মানুরাগের ন্যায় অধর্ম্ম নিবারণ ও ভাবোচ্ছ্বাসেই পর্য্য-বসিত হইয়া যায়। আমরা নিজ নিজ জীবনে ভাবুকতার এই অনিষ্ট ফল লক্ষ্য করিতে পারিয়াছি বলিয়াই এতটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি-য়েছি।

ভাবুকতার আর একটী অনিষ্ট ফল আছে যে, ইহা মানুষকে এক বিষয়ে এক সাধন পথে বহুকাল লগ্ন হইয়া থাকিতে দেয় না। মানব-চরিত্রের গূঢ় রহস্য যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন যে, পুত্তিকারা যেমন শনৈঃ শনৈঃ বল্মীক নির্ম্মাণ করে, তেমনি শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মকে সঞ্চয় করিতে হয়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে ও বহু আয়াসে এক একটা অভ্যস্ত দোষকে সংশোধন করিতে হয় ও এক একটি সদ্‌গুণ উপার্জ্জন করিতে হয়। এ কার্য্যে যে পরিশ্রান্ত, নিরাশ, বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, চরিত্রগঠন, বা ধর্ম্মসাধন তাহার কর্ম্ম নহে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে, কোনও সাধনপথ

অবলম্বন করিলে, বহুকাল ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক সে পথে চলিতে হয়। শুভ সঙ্কল্প করিয়া কোনও ভাল কাজে হাত দিলে, বহুদিন তাহাতে লাগিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু যাহার প্রকৃতিতে ভাবুকতা আছে, সেই ভাবুকতা তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দেয় না। একটা কার্য্যে সফলতা লাভ করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ের ভাবের আবেগ কার্য্যান্তরে লইয়া ফেলে। একটা কাজে হাত দিয়াছি, কিছু-দিন করিতেছি, সেটা পুরাতন হইয়াছে বটে, কিন্তু সফল হয় নাই, এমন সময় আর একটা প্রস্তাব সম্মুখে উপস্থিত, তাহা কল্পনাকে অধিকার করিল, তাহা দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হইবে মনে হইল, অমনি ভাবের আবেগ উপস্থিত, অমনি আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, আর চোকে কাণে দেখিতে দিল না; পশ্চাতে ফিরিয়া পুরাতন কাজটার প্রতি চাহিবার সময় পাইলাম না, নূতন কাজটার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। ভাবুক প্রকৃতির কি বিপদ! অথচ একটা মহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধরিয়া দীর্ঘকাল তদুপরি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে সফলতা প্রাপ্ত করিতে পারিলে, মানবচরিত্রে যে সারবত্তা জন্মে, অপর কোনও উপায়ে তাহা হয় কি না সন্দেহ। এই জন্য বলি, সার-বান ধর্ম্মজীবন যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহাদিগকে ভাবুকতাকে ভয় করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, ভয় করিতে হইবে ধর্ম্মশাস্ত্রকে। একথাতে সকলে কিছু আশ্চ-র্য্যান্বিত হইতে পারেন। সাধুরা ধর্ম্মজীবনের সহায়তার জন্য বার বার যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন,আমি তাহাকে ভয় করিতে বলিতেছি। ইহার কারণ কি? কারণ এই অনেক লোক অনেক সময় ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞানকে ধর্ম্ম মনে করে। ধার্ম্মিকদিগের উক্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে মানুষ ধর্ম্মের অনেক কথা জানিতে পারে, সেগুলি বলিতে পারিলেই যে মানুষ ধার্ম্মিক হইল, তাহা নহে। একজন কলিকাতা হইতে এক পা না নড়িয়া এখানে বসিয়া বসিয়া, পাঁচখানি পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত প্রণীত বর্ণনা-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে সংবাদ সংকলন পূর্ব্বক, একটা বর্ণনা-পুস্তক প্রকাশ করিতে পারে; অমুক স্থানে দ্রষ্টব্য পদার্থ এই এই আছে, অমুক স্থানে যাইতে বাহন এই প্রকার, ব্যয় এত, ইত্যাদি সমুদয় প্রয়োজনীয় সংবাদ ও বিবরণ দিতে পারে, তাহা দিতে পারা ও স্বয়ং দেশ ভ্রমণ করা, দুই কি একই

কথা? তেমনি ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উক্তি সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব ঘোষণা করা ও নিজে ধর্ম্মজীবন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা, দুই এক কথা নয়। কিন্তু অনেকে দুইকে এক কথা মনে করেন, অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের মনে এক প্রকার অহমিকার সঞ্চার হয়, তাহা সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে সুমহৎ বিঘ্ন উৎপাদন করে।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পথে পঞ্চম বিঘ্ন মেধা। মেধাকেও জয় করিতে হইবে। মেধা শব্দে প্রখরা বুদ্ধি। এই প্রখরা বুদ্ধি দুই প্রকারে কার্য্য করে। প্রথম ইহার গুণে মানুষ ত্বরিত একটা জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তাহাকে ধারণা শক্তি বলা যায়। মেধাশালী লোকদিগের ধারণা শক্তি প্রবল। কিন্তু অনেক মেধাবান লোকের ধারণা শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অসহিষ্ণুতা থাকে। তাঁহারা একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ দূর প্রবেশ করিয়াই, তাহার ভাবটা এক প্রকার সংগ্রহ করিয়া লন। তখন আর অধিক গভীর স্থানে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত ধৈর্য্য থাকে না। দুই একটা তত্ত্ব জানিয়াই উপরে উঠিয়া পড়েন,ও বাহিরে তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মেধার এই এক অনিষ্ট ফল, যাহাতে সারবান ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে দেয় না

মেধার দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল এই,—মেধাশালী লোকেরা সচরাচর কৃতী, কার্য্যকুশল, বাগ্মী, সুলেখক প্রভৃতি হইয়া থাকেন। জগতের লোকে তাঁহাদের কৃতিত্ব, বাগ্মিতা, প্রভৃতি দেখিয়া ভুলিয়া যায়, তাঁহারাও নিজে লোকের চক্ষে আপনাদিগকে দেখিতে দেখিতে, আত্ম-প্রতারিত হইয়া পড়েন, আপনাদের কৃতিত্ব ও বাগ্মিতা প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহারা নিজের জালে নিজে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এই ভ্রান্তি হইতে আপনাকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। যে সমাজে সারবান ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা মেধার অর্থাৎ কৃতিত্বের বা বাগ্মিতার আদর অধিক, সে সমাজ সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের অনুকূল নহে। এ কথা আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের শেষ বিঘ্ন কার্য্যবহুলতা। ধর্ম্মজীবনের দুই পিঠ আছে; আত্ম-চিন্তা ও আত্ম-পরীক্ষার দিক এবং বাহিরের কর্ত্তব্যসাধন ও নরসেবার দিক। যে জীবনে কেবল বাহিরের কাজ আছে, নানা কার্য্যে

ব্যস্ততা আছে, নরসেবা আছে, কিন্তু নির্জ্জনতা নাই, আত্ম-চিন্তার সময় নাই, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের গাঢ়তা ও গম্ভীরতা হয় না। এজন্য ধর্ম্মসাধনাকাঙ্ক্ষী মাত্রেরই জীবনে নির্জ্জন ও সজন দুইএর সমাবেশ চাই। ব্রাহ্মের পক্ষে কাজ এরূপ বাড়ান কর্ত্তব্য নয়, যে পাঠ ও আত্ম-চিন্তার সময় থাকে না। মানুষ এ জগতে কাজ করিবার কল নয়, যে তাহার সমুদয় শক্তি ও সমুদয় সময় কাজেই যাইবে। কল খানারও বিশ্রামের প্রয়োজন, যখন তাহার চাকাতে তৈল দিতে হয়, ভাঙ্গা অংশ মেরামৎ করিতে হয়। মনুষ্যের চাকাতে কি তৈল দেওয়ার প্রয়োজন নাই? দিবসের মধ্যে কিয়ৎকাল নির্জ্জন বাস সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, তদ্ভিন্ন মানুষ গড়ে না। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত এরূপ হওয়া আবশ্যক যে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর পক্ষে কাজের সময়ে কাজ, পাঠের সময়ে পাঠ ও চিন্তা অবাধে হইতে পারে। জ্ঞানালোচনা ও আত্ম-চিন্তাবিহীন ধর্ম্মজীবনে কখনই সারবত্তা থাকে না।

সারবান ধর্ম্মজীবন লাভের পথে যে বিঘ্নগুলির উল্লেখ করা গেল, সকল-গুলিই ধর্ম্মজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, অথচ সকল গুলিরই পথে বিপদ আছে। সেই বিপদ আমাদিগকে পরিহার করিতে হইবে। ঈশ্বর করুন যেন আমরা তাহা করিতে সমর্থ হই।

বিচ্ছেদের ধর্ম্ম ও মিলনের ধর্ম্ম।

বিচ্ছেদের ধর্ম্ম ও মিলনের ধর্ম্ম; ধর্ম্ম দুই প্রকারের আছে। জগতের প্রচ-লিত প্রাচীন ধর্ম্ম সকলের অধিকাংশকে বিচ্ছেদের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা বিচ্ছেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরে মানবে বিচ্ছেদ, মানবে মানবে বিচ্ছেদ, দেহ আত্মাতে বিচ্ছেদ, ইহার কোনও না কোনটী তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

যে সকল ধর্ম্ম সাকারবাদ বা অবতারবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা প্রকারান্তরে ঈশ্বরে মানবে বিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছে ও মানবের প্রকৃত আধ্যা-ত্মিক উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। কারণ যাহা কিছু ঈশ্বরকে মান-

বাত্মা হইতে দূরে লইয়া যায়,এবং তাঁহাকে মানব-বিবেকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত করে, তাঁহাকে অন্তরের অন্তরে স্থান না দিয়া, দূরে স্থাপন করে,তাহাতে মানবাত্মার প্রকৃত উন্নতির পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাকারবাদ ও অবতারবাদ উভয়েরই সেই দিকে গতি। সাকারবাদ বলে তোমার ইষ্ট দেবতা ঐ বাহিরে, তোমার আত্মার ভিতরে নয়, ঐ সম্মুখে, এবং তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে ধূপ,দীপ, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিতে হয়। তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য কিছু হইতে হয় না, কিন্তু কিছু দিতে হয়, হৃদয়-মনের পবিত্রতা, ব্যবহার ও আচরণের বিশুদ্ধতা, এ সকল তত প্রয়োজনীয় নহে, যত ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদির প্রয়োজন। সকলেই ইহা অনুভব করিতে পারেন যে,এরূপ বহির্ম্মুখীন সাধনের গতি মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে, মানবের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের রাজ্য হইতে, বিযুক্ত করার দিকে। যে ধর্ম্মে এই বহির্ম্মুখীন সাধন প্রবল হয়, তাহা ক্রিয়াবহুল হইয়া পড়ে; এবং অচির-কালের মধ্যে কতকগুলি অসার, প্রাণহীন, নিয়ম পালনে দাঁড়ায়। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন, যে সর্ব্বদেশেই মধ্যে মধ্যে এরূপ মহাজন অভ্যুদিত হইয়াছেন, যাঁহারা এই বিচ্ছেদের ধর্ম্মের গতি দেখিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এরূপ মহাত্মগণ দেখা দিয়াছেন। বৈদিক কালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, যিনি বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন,—

যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

"হে গার্গি, এই অবিনাশী পুরুষকে (যিনি মানবাত্মাতে সন্নিহিত, এবং যিনি সকলকে চালাইতেছেন) না জানিয়া, এক জন মানুষ যদি সহস্র বৎসর, হোম, যাগ, তপস্যা করে,সে সমুদয় বিফল হয়।"

বৈদিক সময়ের পরেও গীতাকার বলিয়াছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি,
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া,
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

অর্থ—হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। কায়িকর

যেমন যন্ত্রারূঢ় পদার্থ সকলকে স্বেচ্ছাক্রমে ঘুরাইয়া থাকে, তেমনি তিনি এই বিশ্বসংসারকে আপনার মায়াশক্তির দ্বারা ঘুরাইতেছেন; তুমি সমগ্র হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হও।

ঈশ্বর হৃদয়ে, এ কথা বলিলেই মানবের দৃষ্টিকে বাহির হইতে ভিতরে আনিয়া দেওয়া হয়; আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যদিও পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণ তাহা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। দেশের অধিকাংশ লোক,সাকারবাদের মধ্যে পড়িয়া, ইষ্ট-দেবতাকে বাহিরে ও দূরে দেখিয়া দেখিয়া অসার ও ক্রিয়াবহুল ধর্ম্মের পাশের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিয়াছে।

সাকারবাদের ন্যায় অবতারবাদেরও গতি ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে দূরে লইয়া যাইবার দিকে। কি কারণে অবতারবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আলো-চনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার ফল যাহা হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। অবতারবাদ বলে যে করুণাময় ঈশ্বর কৃপাপরবশ হইয়া ভূভার হরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কিন্তু এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর যেরূপ পাপ তাপ দেখিয়া ভগবান কোনও অতীত কালে, কোনও দেশ বা জাতি বিশেষের মধ্যে, অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেরূপ পাপ তাপ কি মানবকুলের মধ্যে এখন বিদ্যমান নাই? পৃথিবী কি পাপ-ভারে এখনও ক্রন্দন করিতেছে না? এখনও রাজাদের অত্যাচারে প্রজারা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইয়া দলে দলে মরিতেছে; এখনও ধনীর অত্যাচারে দরিদ্র, পুরু-ষের অত্যাচারে নারী ক্রন্দন করিতেছে; এখনও সবলজাতিগণ দুর্ব্বল জাতি-সকলের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে ধনে প্রাণে সারা করিতেছে; এখনও নর-রুধিরে মেদিনী প্লাবিত হইয়া যাইতেছে; এখনও সভ্যতাভিমানী জাতিরা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি সকলকে মৃগয়ালব্ধ পশুযূথের ন্যায় হত্যা করিতেছে; এখনও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পাপস্রোত বর্ষার স্রোতের ন্যায় কল কল রবে বহিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর পাপভারের জন্য ভগবানের বিশেষ ভাবে অবতীর্ণ হইবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে প্রয়োজন সর্ব্বদাই রহিয়াছে। একবার পৃথিবীর এক কোণে অবতীর্ণ হইয়া কি হইল? বা বহুযুগ পরে আবার অবতীর্ণ হইবেন জানিয়াই বা কি হইল? এই অবতার-

বাদ শোকার্ত্ত, তাপার্ত্ত, পাপ-ভীত মানবহৃদয়ের পক্ষে কি নৈরাশ্যপূর্ণ সংবাদ দিতেছে তাহা অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখেন না। মানবাত্মা পাপতাপে অস্থির হইয়া কাঁদিতেছে, সেণ্টপলের ন্যায় মস্তকের কেশ ছিন্ন করিয়া বলিতেছে "হায় রে, হায় রে! আমি হতভাগ্য নরাধম, আমাকে এই পাপ-যন্ত্রণা হইতে কে উদ্ধার করিবে?" তাহার উত্তরে অবতারবাদ বলিতেছে "তুমি আশ্বস্ত হও, প্রভু অমুক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন শ্রবণ কর।" ইহা কি শোকার্ত্ত তাপার্ত্ত মানবহৃদয়ের পক্ষে বিদ্রূপ নহে? মুক্তিদাতা ঈশ্বর অমুক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শুনিয়া আমার লাভ কি? আমি যে এখনি মুক্তি চাই, আমি যে আর পাপজ্বালা সহিতে পারিতেছি না, আমি যে আর নিজ বলে উঠিতে পারিতেছি না, আমাকে এখন কে তোলে? পাপীর হৃদয় বলে প্রভু যদি কৃপাপরবশ হইয়া পাপীর উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, তবে এই মুহূর্ত্তে এই হৃদয়ে অবতীর্ণ হউন, নতুবা আমি আর বাঁচি না। ঈশ্বর অমুক দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, বলিলে কি তাঁহাকে মানবহৃদয়ের কাছে আনিয়া দেওয়া হয়? তাহা কি ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে সমান? একজন পল্লীগ্রামের লোকে স্বীয় গ্রামে বসিয়া যদি শোনে যে একবার কলিকাতায় আলিপুরের পশুশালাতে শুক্ল ভল্লুক আসিয়াছিল, তাহা হইলে কি তাহার শুক্ল ভল্লুক দেখা হয়? এই কারণেই বলি, অবতারবাদ মুক্তিদাতা ঈশ্বরকে মানবাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, দূরে লইয়া গিয়াছে।

এই ত গেল মানবে ঈশ্বরে বিচ্ছেদ, আবার অনেক ধর্ম্মে মানবে মানবে বিচ্ছেদ দেখা যায়। এটা প্রায় সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে। আদিমকালে জগতের জাতি সকলের মধ্যে জাতিভেদ অতিশয় প্রবল ছিল। এক জাতি অপর জাতির সহিত সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিত। সুতরাং তাহাদের হৃদয়নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবও সেই জাতিভেদের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত। বেদে দেখি শ্বেতকায় আর্য্যগণ প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে ইন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্ নিঃশেষিত কর।" কৃষ্ণকায়গণ শ্বেতকায়দিগের শত্রু, সুতরাং ইন্দ্রেরও শত্রু। শ্বেতকায়গণ ইন্দ্রের প্রিয়, সুতরাং ইন্দ্র কৃষ্ণকায়দিগকে ক্লেশ দিতে ভাল বাসেন। ইন্দ্র শ্বেতকায়দিগের একচেটিয়া দেবতা। এইরূপ ইজ্রায়েল বংশীয়গণ মনে করিত, জিহোভা ইজরায়েলদিগেরই দেবতা।

ইজরায়েল বিরোধিগণকে তিনি হত্যা করিতে ভাল বাসেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণ মনে করিত, কাফেরদিগের প্রতি আল্লার দয়া মায়া নাই, আল্লার হুকুম এই, তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর, নারীদিগকে বাঁদী কর, বালকবালিকা-দিগকে ক্রীতদাসদাসীরূপে বিক্রয় কর।

এইরূপে প্রাচীন জাতিসকলের জাতীয় বৈরভাব ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। আর্য্য ও অনার্য্য, জু ও জেণ্টাইল, হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, গ্রীক ও বার্ব্বেরিয়ান, ইসলাম ও কাফের প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন বৈরভাব প্রবল রহিয়াছে।

এদেশে হিন্দু ম্লেচ্ছরূপ বিচ্ছেদের ভাব ত আছেই, তদ্ব্যতীত আরও দুই কারণে মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। প্রথম জাতিভেদ নিবন্ধন, দ্বিতীয় অদ্বৈতবাদ নিবন্ধন। জাতিভেদে বলিয়াছে, ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের যে অধিকার আছে, শূদ্রের সে অধিকার নাই। ইহাতে শ্রেণীবিভাগ ও জাতিভেদ ঘটাইয়াছে। তৎপরে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছে,—যদি পরিত্রাণ চাও,

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

"মায়ার রচনা যে এই জনসমাজ ও সামাজিক সমুদয় সম্বন্ধ, এ সকলকে পরিহার করিয়া, ত্বরায় ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর।" অদ্বৈতবাদ এদেশে ধর্ম্মকে সমাজবিরোধী করিয়াছে; মানুষকে মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম মানুষকে জগত হইতে এবং আত্মাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপদেশ দিয়াছে; এক নূতন অর্থে প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইটী শব্দকে ব্যবহার করিয়াছে। যাহা কিছু মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ তাহা যেন ধর্ম্মের বিরোধী এবং যাহা কিছু ধর্ম্মের অনুগত, তাহা যেন মানব প্রকৃতিবিরোধী এই একটা ভাব দাঁড় করাইয়াছে। এই যে মানব-প্রকৃতি ও ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে একটা বিরোধ—ইহা সেণ্ট অগষ্টাইনের সময় হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে আর একটা ভাব আছে। তাহা এই, তাঁহারা ধর্ম্মকে কোনও অতিনৈসর্গিক প্রণালীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত মনে করেন। সেণ্ট অগষ্টাইনপ্রমুখ খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে মানব-প্রকৃতি ধর্ম্ম চায় না, ধর্ম্ম তাহার উপরে চাপাইবার জিনিষ, সেই প্রকৃতিকে নব জীবনদ্বারা পরিবর্ত্তিত

করিয়া তবে তদুপরি আরোপ করিবার জিনিস। ঈশ্বর এক অতিনৈসর্গিক প্রক্রিয়ার দ্বারা মানব-প্রকৃতির উপর ধর্ম্ম চাপাইয়াছেন। ধর্ম্মের এই অতি-নৈসর্গিকতা হইতে নিসর্গ-বিরোধিতা আসিয়াছে, যাহা কিছু মানব-প্রকৃতি চায় সমুদয় যেন ধর্ম্মবিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। এই রূপে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সঙ্গে, এইরূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ সমন্বিত সুন্দর জগতের সঙ্গে, এই ঈশ্বরের সুরম্য ক্রীড়াভূমি, মানবের সম্ভোগের উপযুক্ত আরামকাননের সঙ্গে, একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। মন যদি ঐ সুন্দর ফুলটী দেখিয়া তাহা ঘ্রাণ করিতে যায়, নবোদিত উষার আলোক দেখিয়া আহা আহা করে, ঐ কলকণ্ঠ বিহগের সুস্বর-ধারা কর্ণ ভরিয়া পান করিবার প্রয়াসী হয়, তবে যেন সে প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে হইবে, এবং নিতান্ত বাধা না দেও, মানব-প্রকৃতির অপরিহার্য্য দুর্ব্বলতার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

ঐ সকল ধর্ম্ম-মতে যেমন জগতের সঙ্গে মানবাত্মার একটা বিচ্ছেদের ভাব আছে, দেহের সঙ্গেও আত্মার একটা বিচ্ছেদ ঘোষণা করা হইয়াছে। দেহটা যেন শয়তানের কেল্লা, এবং আত্মাটা ঈশ্বরের কেল্লা,—এই উভয় দুর্গ হইতে গোলাগুলি সর্ব্বদাই চলিতেছে। মানবের যত পাপ, যত বিকৃত বুদ্ধি, যত পতনের কারণ ঐ হতভাগ্য দেহ হইতে। ঈশ্বর যদি আত্মার সঙ্গে এই রক্ত-মাংসময় নটবহরটা না বাঁধিয়া দিতেন, হায়! তাহা হইলে আমরা অবাধে ধর্ম্ম-সাধন করিতে পারিতাম। দেহ ও আত্মার মধ্যে এই বিরোধ সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই দেখা যায়। এই বিশ্বাসের অধীন হইয়া জগতের সাধুগণ এক এক জন স্বীয় স্বীয় দেহকে কিরূপ নির্যাতন করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এদেশে আজিও কত মানুষ উর্দ্ধবাহু হইয়া রহিয়াছে, পঞ্চতপা হইয়া প্রখর গ্রীষ্মের দিনে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে বসিয়া শরীরকে ভাজিতেছে, কত মানুষ গজালের শয্যা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে শয়ন করিয়া থাকিতেছে। উপবাস, উপবাস, উপবাসে শরীরকে শুকাইয়া কাষ্ঠ করিয়া ফেলিতেছে, ঈশ্বর যে আত্মার সঙ্গে শরীরটা দিয়া ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন, যতদূর সম্ভব তাহা সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

খ্রীষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যেও এরূপ আত্ম-নিগ্রহের দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। তাঁহাদের মধ্যে এক সময় দেহকে নিগ্রহ করা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

তাঁহাদের মধ্যে ধার্ম্মিকগণ চর্ম্মের যাতনাপ্রদ অঙ্গরক্ষা পরিধান করিয়া থাকিতেন, উপবাস অনাহারে শরীর শুষ্ক করিতেন, মধ্যে মধ্যে দেহ অনাবৃত করিয়া অপরের দ্বারা তাহাতে বেত্রাঘাত করাইতেন, গিরিগুহায় সামান্য ফলমূল আহার করিয়া বৎসরের পর বৎসর পড়িয়া থাকিতেন, সামান্য একটু স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদয় হইলে, দেহকে গুরুতর শাস্তি দিতেন, যেন দেহ সকল নষ্টের মূল। সাইময়ন ষ্টাইলাইট নামক একজন সাধক একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি বহু বৎসর দণ্ডায়মান অবস্থাতে ছিলেন। এইরূপে তাঁহারা শরীরকে যাতনা দিবার অবধি রাখেন নাই। এখনও তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন ভাবাপন্ন সাধকগণের ভাব এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবে শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভ করিতে হইলে, শরীরকে আত্মার বিরোধী জানিয়া তাহাকে পদে পদে নিগ্রহ করিতে হইবে।

এইত গেল বিচ্ছেদের ধর্ম্ম; কিন্তু বিচ্ছেদের ধর্ম্ম আর চলিতেছে না। এখন জগতে মিলনের ধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া মানব-চিত্তে ও মানব-চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই মিলন ও সন্ধিস্থাপন হইতেছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, এ ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিবার উপায় নাই। ঘনিষ্ঠ একতাসূত্রে সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত। সর্ব্বত্র একই জ্ঞান, একই শৃঙ্খলা, একই শক্তি,—ইহার মধ্যে দুই নাই। বর্ত্তমান সময়ের একজন সর্ব্বাগ্র-শ্রেণীগণ্য দর্শনবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যদি বল ব্রহ্মাণ্ডের উপরে একাধিক দেবতা আছেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাঁহাদের একটী কার্য্যনির্ব্বাহক সভা আছে, এবং কখনও কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ হয় না, এবং যে কিছু কর্ম্ম হয়, এক মতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান, শক্তি ও শৃঙ্খলার এমনি একতা।

একদিকে যেমন খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশ সকল গ্রথিত হইয়া একত্ব সম্পাদন করিতেছে, তেমনি মানবে মানবে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য প্রাচীনকালে যে সকল প্রাচীর উত্থিত করা হইয়াছিল, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যের বিস্তার হইয়া, দেশ পর্য্যটনের সুবিধা হইয়া, জাতিতে জাতিতে আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হইয়া, দিন দিন অনুভব করা যাইতেছে যে, এই বহু বিস্তীর্ণ মানব-পরিবারের এক অংশকে দুঃখে রাখিয়া অপর অংশ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারে না। ভারতে দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ উপস্থিত হইলে, নিউইয়ার্কে রুটীর দাম বাড়িয়া

যায়; দক্ষিণ আফ্রিকাতে যুদ্ধ বাঁধিলে সমগ্র সভ্য জাতি অল্পাধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সকলেরই বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটে। দেখ কেমন একতারে জগতের সকল জাতি বাঁধা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে জাতি সকলের যুদ্ধ-বিগ্রহ-প্রবৃত্তি যতই প্রবল দৃষ্ট হউক না কেন, জগতে সেই দিন আসিতেছে, যখন ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সহিত এক স্বরে সকলে বলিবে—

শান্তি-খড়গঃ করে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং।

শান্তিরূপ খড়্গকে যে ধারণ করিয়াছে, সেই লোকত্রয় জয় করিয়াছে।"

ইহার উপরে আবার বর্ত্তমান শতাব্দীর শেষভাগে নরতত্ত্বের অদ্ভুত আলোচনা হইয়া এবং সকল জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়ে গবেষণা হইয়া, মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্বেতকায় হউক আর কৃষ্ণকায় হউক, বর্ব্বর হউক আর সুসভ্য হউক, মানুষ মানুষ; মানবের উন্নতির ক্রম ও প্রণালী সর্ব্বত্র একই। যেমন ঐ দ্বিপত্রবিশিষ্ট নবাঙ্কুরটী ভাবী প্রকাণ্ড মহীরূহের সূচনা মাত্র, তেমনি ঐ অরণ্যবাসী নগ্নকায় বর্ব্বর মানুষটী ভাবী সুসভ্য মানুষের সূচনামাত্র। ইহাতেই মানুষে মানুষে যে প্রাচীন বিচ্ছেদ ছিল তাহা ঘুচাইয়া দিতেছে। আমরা মনুষ্য পরিবারকে এক পরিবার, মানব প্রকৃতিকে এক প্রকৃতি ও মানব নিয়তিকে এক নিয়তি ভাবিতে শিখিতেছি। সেইরূপ এই বাহ্য জগতের সঙ্গে এবং দেহের সঙ্গে আত্মার যে বিচ্ছেদ ছিল, তাহাও ঘুচিয়া যাইতেছে। দেহকে হীন বোধ করা দূরে থাক, নিগ্রহের উপযুক্ত মনে করা দূরে থাক, সাজা দিবার পাত্র ভাবা দূরে থাক, বরং একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, দেহ দেবতার পূজা বর্ত্তমান সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেহ মহাশয়কে প্রসন্ন করিবার জন্য কত আয়োজন। দেহ মহাশয় রেলগাড়ীতে যাবেন, অতএব বেঞ্চে গদি লাগাও; দেহ মহাশয় গ্রীষ্মের উত্তাপ সহিতে পারেন না, অতএব সেই গাড়ীতে খস্‌খস্ লাগাও; দেহ মহাশয়ের ঝাঁকুনি না লাগে,এইরূপ করিয়া গাড়ি ও চাকা নির্ম্মাণ কর—ইত্যাদি ইত্যাদি, দেহের পরিচর্য্যার অন্ত নাই। বলিতে কি, দেহের প্রতি এমনি মনোযোগ যে পাপ অপেক্ষা রোগকে, হৃদয়ের কঠিনতা অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকে, অধিক ভয় করা হইতেছে। স্বাস্থ্যের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য শত শত বিজ্ঞানবিদের মস্তিষ্ক নিযুক্ত হইয়াছে, শত শত জীবন্ত প্রাণীর দেহ প্রতিদিন কাটিয়া দেখা যাইতেছে। এই যে দেহের ও

স্বাস্থ্যের অতিরিক্ত পূজা, ইহাকে প্রাচীন অতিরিক্ত দেহ-নিগ্রহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দেহের প্রতি যেমন অতিরিক্ত মনোযোগ পড়িয়াছে, তেমনি চির অবজ্ঞাত এই জড় জগতের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞান কোনও রাজ্যে প্রবেশ করিতে বাকি থাকিতেছে না। দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশে উঠিতেছে, অণুবীক্ষণ সাহায্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সর্ব্বত্রই মানুষ দেখিতে পাইতেছে, এ জগত মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের শত্রু নয়,পরম বন্ধু ; এ জগতে জগৎপতি মানবের জন্য জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন, মানবের সুখের নানা উপকরণ সামগ্রী সাজাইয়াছেন। ইহার ফলস্বরূপ দেখিতেছি, esthetics বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিকে অধিক দৃষ্টি পড়িতেছে। শিশুর সুকোমল হাস্যে, পুষ্পের প্রস্ফুটিত শোভাতে, পূর্ণ-চন্দ্রের বিমল জ্যোতিতে, দৃঢ়কায়, মাংসল, সুস্থ,সুন্দর পুরুষের বিশাল বক্ষে ও উজ্জ্বল নেত্রে, রূপলাবণ্য-সম্পন্না কামিনীর প্রস্ফুটিত মুখপদ্মে সর্ব্বত্রই মানুষ ভীম কান্ত ভাব, ও ঈশ্বরের প্রেমমুখ-জ্যোতি দেখিতে শিক্ষা করিতেছে।

তাই বলি, জগতে এমন দিন আসিতেছে, যখন আর বিচ্ছেদের ধর্ম্মে চলিবে না। এখন আর ঈশ্বর মানবাত্মা হইতে দূরে থাকিতেছেন না। দেখ, দেখ তিনি মানব-হৃদয়ের কাছে আসিতেছেন। মানব-হৃদয়ের কাছে কেন, মানবাত্মার সঙ্গে এক আলিঙ্গনে একীভূত হইতে চাহিতেছেন। সকলের সঙ্গে মিল করাইয়া দিয়া নিজে মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছেন। যে শতাব্দী চলিল, তাহার শেষভাগে এই এক মহা তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, জগতে সত্য বস্তু দুই নাই,—একই। একই সত্তা জড়ে চেতনে, একই সত্তা দ্যুলোকে ভূলোকে, একই সত্তা অন্তরে বাহিরে, তবে আমরা যে সৎ, জগৎ যে সৎ, তাহা কেবল তাঁহারই আশ্রয়ে। তিনি আমাদিগকে সত্তা দিয়া নিজ মায়া-শক্তির দ্বারা আপনা হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন বলিয়া আমরা সৎ হইয়াছি। তিনি আপনা হইতে একটু স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না দিলে আমরা কি তাঁহাকে আজ পূজা করিতে পারিতাম? দেখ, আমরা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহাতেই বাস করিতেছি। তাঁহারই শক্তিদ্বারা বিধৃত হইয়া তাঁহারই আলিঙ্গনের মধ্যে রহিয়াছি। আমরা তাঁহা হইতে দূরে নই। জ্ঞান ও প্রেম উভয়ে মিলিয়া

বর্ত্তমান সময়ের এই মহা মিলন সম্পাদন করিতেছে। ঈশ্বর বলিতেছেন আমাকে ভাল বাস, এবং আমার যাহা কিছু আছে সকলকে ভালবাস। তাই আমরা এই প্রেম ও মিলনের ধর্ম্মের মহাভাব পাইয়া জগতকে, মানুষকে, আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইতেছি। দেখ, আমরা কি উদার, কি আধ্যাত্মিক, কি বিশাল ধর্ম্মভাব লইয়া বিংশতি শতাব্দীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। জয়, এই মিলনের ধর্ম্মের জয়। হে অল্পবিশ্বাসি, তুমি কেন ভয় কর, এই মহাধর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ কর।

ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম।

জগতের ভ্রান্তি ও কুসংস্কারসমন্বিত ধর্ম্ম সকলকে সচরাচর উপধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম্ম বলিয়া একটা বস্তু আছে, যাহা তাহাদের সকলের মধ্যে থাকাতেই তাহাদের স্থিতি সম্ভব হইয়াছে, এবং তাহারা এতকাল মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতে পাইতেছে। সেই ধর্ম্ম বস্তুটা কি এবং উপধর্ম্ম সকলকে উপধর্ম্ম কেনই বা বলি, এবং ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার করা অদ্যকার উদ্দেশ্য।

এ জগতে যত পদার্থ আছে তাহাদের স্থিতির কতকগুলি কারণ আছে। তাহাদের অন্তর্নিহিত কতকগুলি গূঢ় শক্তি তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে। সেই অন্তর্নিহিত শক্তি গুলি না থাকিলে তাহারা বিলয় প্রাপ্ত হইত এবং স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে পারিত না। এই শক্তি গুলিকে এবং ঐ সকল শক্তির কার্য্য গুলিকে ঐ সকল পদার্থের ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি, অগ্নির ধর্ম্ম দহন করা, বা জলের ধর্ম্ম শৈত্য ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই, অগ্নির মধ্যে এমন কোনও স্বাভাবিক শক্তি আছে যাহার বলে অগ্নি দহন করিতে পারে, ঐটীই তাহার প্রধান ক্রিয়া, ঐটীই তাহার স্বভাব, এবং ঐ শক্তি থাকাতেই অগ্নি পদার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তদভাবে অগ্নির অগ্নিত্ব

যাইত, অর্থাৎ অগ্নি বিলুপ্ত হইত। জলের শৈত্যগুণ সম্বন্ধেও সেইরূপ, জলে এমন কিছু আছে জল যে জন্য শীতল, এবং শীতলতা দান জলের প্রধান ক্রিয়া, এবং যে কারণের সত্তা নিবন্ধন জল শীতলতা দান করিতে পারে, তাহা বিলুপ্ত হইলে জলের স্থিতিই অসম্ভব, এই কারণেই শৈত্যকে জলের ধর্ম্ম বলে।

মানবের দেহ সম্বন্ধেও ঐরূপ, মানব দেহ যে জগতে দণ্ডায়মান থাকে, নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায় ও কার্য্য করে, তাহার মূলে কতকগুলি অন্তর্নিহিত কারণ বা শক্তি আছে। সেগুলির বিরাম হইলেই দেহের বিলোপ হয়, আমরা তাহাকে মৃত্যু বলি। ঐ সকল অন্তর্নিহিত কারণ বা শক্তি গুলিকে দেহের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, মানবসমাজের স্থিতির মূল কারণ কি? এরূপ কোনও অন্তর্নিহিত কারণ কি আছে, যাহা থাকাতে মানবসমাজের স্থিতি সম্ভব হইতেছে, এবং যাহার অভাবে মানব-সমাজের বিলোপাশঙ্কা? এরূপ কোনও অন্তর্নিহিত কারণ না থাকিলে মানব-সমাজ কিরূপে রহিয়াছে, কিরূপে কার্য্য করিতেছে, কিরূপে বিষয় বাণিজ্য, রাজকার্য্য প্রভৃতি বিস্তার করিতেছে? বরং দেখা যাইতেছে মানব-হৃদয়ে এমন সকল প্রবৃত্তি আছে, যাহারা অন্ধের প্রায় স্বীয় চরিতার্থতাই অন্বেষণ করিতেছে, এমন সকল হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি রহিয়াছে, যাহা মানব-সমাজকে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। ঐ সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যদি অবাধে কাজ করিতে পারে, এবং ঐ সকল হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি যদি অবাধে স্বীয় শক্তিকে বিকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে স্বল্প কালের মধ্যেই মানব-সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব বন্য পশুর দশায় পড়িতে পারে। তবে কে মানব-সমাজকে ধরিয়া রাখিতেছে? কোন্ গূঢ় শক্তি সেই সকল অন্ধ প্রবৃত্তি-সকলকে শৃঙ্খলিত করিয়া, সেই সকল হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতিকে বাধা দিয়া, মানব-সমাজের স্থিতি সম্ভব করিতেছে? আমরা জগতের ইতিবৃত্তে জাতি সকলের উত্থান পতন দেখিয়াছি; কোনও জাতি বা এক সময়ে সভ্যতার উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল, আবার বর্ব্বরতার গভীর গর্ত্তে পতিত হইয়াছে; কোন কোনও জাতির জীবনে এরূপ সকল যুগ দেখিয়াছি যখন তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ পাপ-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল হইয়া তাহাদিগকে পশুর অধম করিয়াছে; ঐ

কালের মধ্যে যাহা গর্হিত, যাহা ব্রীড়াজনক তাহা তাহাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্বজনের আদৃত হইয়াছে, অবাধে আচরিত হইয়াছে, অথচ তাহারা বন্য দশায় পতিত হয় নাই। আবার এমন সময় আসিয়াছে, যখন কোনও অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে এক যুগের পাপ-প্রবৃত্তি আর এক যুগে সংযত হইয়াছে, এক যুগের যথেচ্ছাচার আর এক যুগে নিবারিত হইয়াছে, এক যুগের নরনারী যাহার আচরণে কুণ্ঠিত হয় নাই, আর এক যুগের লোকে তাহার স্মরণে লজ্জিত হইয়াছে। গড়ের উপরে মানব-সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াছে এবং স্বীয় কার্য্য চালাইয়াছে।

কে মানব-সমাজকে এরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে? মানবাত্মাতে নিশ্চয় এমন কিছু আছে যাহার গুণে মানব-সমাজ স্থিতি করিতেছে, যাহার বলে অন্ধ প্রবৃত্তি সকল সংযত হইতেছে, যাহার প্রভাবে হিংসা, বিদ্বেষ, অহঙ্কার, জিগীষা প্রভৃতি নিয়মিত হইয়া যাইতেছে। এই যে মানবাত্মার স্বভাবনিহিত শক্তি, তাহাকে ধর্ম্মশাসন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। একটা জড়বস্তু যেমন ভৌতিক শক্তির দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে, তেমনি মানব-সমাজ এই ধর্ম্ম-শাসন দ্বারা ধৃত হইয়া রহিয়াছে। জড়ের পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, মানবাত্মার পক্ষে এই ধর্ম্মশাসন তেমনি স্বাভাবিক; উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয়, উভয়ই অনিবার্য্য, উভয়ই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত। ইহা পরিষ্কার রূপে জানিয়া রাখা উচিত যে, যে আদি শক্তি বা আদি কারণের দ্বারা জগত চলিতেছে, ধর্ম্মশাসন তাঁহারই অঙ্গীভূত। জগতের মহাজনগণ, সিদ্ধ পুরুষগণ, মানব-প্রকৃতিনিহিত ধর্ম্মশাসনকে লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে বিবিধ নামে আখ্যাত করিলেন। বুদ্ধ ইহাকে বলিলেন ধর্ম্ম, মহম্মদ বলিলেন "আল্লা হো আকবর" মহান প্রভু পরমেশ্বরের ইচ্ছা, যীশু বলিলেন, "আমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা" ভারতের ঋষিরা বলিলেন :—

"স সেতু র্বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায়"

"এক অক্ষর অবিনাশী পুরুষ সেতুস্বরূপ হইয়া এই লোক সকলকে ও মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছেন।" বাহিরে যত প্রভেদ থাকুক না কেন, কথাটা মূলে এক, পাপ পুণ্যের ফলদাতা হইয়া একজন মানবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছেন। স্বীকার কর আর না কর, ইহার হাত অতিক্রম করিবার সাধ্য

নাই। তবে ভারতীয় ঋষিদিগের বিশেষত্ব এই তাঁহারা এই শক্তিকে জড়ে ও চেতনে সমান ভাবে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—

যশ্চায়মস্মিন্ আকাশে তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ,
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

"যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এই আকাশে অন্তর্নিহিত আছেন, যে তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এই আত্মাতে অন্তর্নিহিত হইয়া আছেন, তাঁহাকেই জানিয়া ও লাভ করিয়া মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। মুক্তি লাভের অন্য পথ আর নাই।"

একই শক্তিকে তাঁহারা দেশ ও কাল উভয়ত্র ব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব তাঁহারা এই অনুভব করিলেন, মানবাত্মাতে এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম-শাসন বিদ্যমান, যাহাকে অতিক্রম করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। দ্বিতীয় তত্ত্ব সকলেই এই অনুভব করিয়াছিলেন, ঐ হৃদয়নিহিত ধর্ম্মশাসনের অধীন হওয়াতেই মানবের কল্যাণ ও শান্তি; তাহার অধীন হইতেই হইবে। ইহার পরেই প্রশ্ন উঠিল, কিরূপে মানবকে এই অন্তর্নিহিত শাসনের অধীন হইতে হইবে? বুদ্ধ বলিলেন, যোগের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই, আত্মার প্রবৃত্তি সকলকে বাধা দিয়া, আত্মার হাত পা বাঁধিয়া, তাহাকে এই অন্তর্নিহিত শাসনের অধীন করিতে হইবে। মহম্মদের উপদেশ এই,বাধ্য করিতে হইবে ভয়ের দ্বারা। মহম্মদ যেন বলিতেছেন,আল্লার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ, অসীম ক্রোধ ও জলন্ত নরকাগ্নি তোমার সম্মুখে, তুমি বাধ্য না হইয়া যাবে কোথায়? যীশু বলিলেন, বাধ্য করিতে হইবে প্রেমের দ্বারা; তাঁহার উপদেশের যেন মর্ম্ম এই, হে মানব! যিনি তোমার পিতা, তোমার কল্যাণকৃৎ সুহৃৎ, তুমি কেন তাঁহার অধীন হইবে না? তুমি সমগ্র হৃদয় মন প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভালবাস,দেখিবে তাঁহার বাধ্যতা তোমার পক্ষে সুখকর হইবে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে যীশু এই মূল উপদেশের সহিত স্বর্গ নরকের লোভ এবং ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতীয় ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছিলেন, এই বাধ্যতা আসিবে বিমল জ্ঞান দ্বারা। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন মানুষ অজ্ঞতাবশতঃই অনিত্যকে নিত্য বলিয়া মনে করে ও তাহাতে আসক্ত

হয় ; যে জ্ঞান দ্বারা অনিত্যকে অনিত্য ও নিত্যকে নিত্য বলিয়া জানা যায়, সেই জ্ঞান লাভ করিলে মানুষের আসক্তি-পাশ ছিন্ন হইবে ও মানুষ সহজে এই অবিনাশী পরম পুরুষের সহিত মিলিত হইতে পারিবে।

তবে ধর্ম্মের দুইটী সার মূল তত্ত্ব এই পাওয়া যাইতেছে যে, প্রথম এক ধর্ম্মাবহ পুরুষ মানবাত্মাতে নিহিত থাকিয়া ধর্ম্মশাসনকে প্রবল রাখিতেছেন, দ্বিতীয় সেই শাসনের অধীন হওয়াই মানবের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের উপায়।

জগতের সকল উপধর্ম্মের মধ্যেই এই দুইটী মূলতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকে উপধর্ম্ম বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই মূলতত্ত্বের সহিত অনেক আবর্জ্জনা যুটিয়াছে ; জগৎ ও মানব সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত লিপ্ত হইয়াছে। জগতের উপধর্ম্ম সকলকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—শাস্ত্রনিষ্ঠ ধর্ম্ম ও গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। অর্থাৎ কতকগুলি সম্প্রদায় এক একজন মহাপুরুষ হইতে অভ্যুদিত হইয়া তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ; ইঁহাদিগকে গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অপর কতকগুলির প্রকৃতি সেরূপ নহে, তাঁহারা কোনও এক বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান নহেন, কিন্তু বহুজনের উক্তি ও উপদেশকে আশ্রয় করিয়া আছেন ; তাঁহাদেরই উক্তিকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন ও তাঁহাদেরই প্রদর্শিত আচারকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন ; যেমন হিন্দুধর্ম্ম অথবা প্রাচীন রোম বা গ্রীসের ধর্ম্ম। এই জন্য ইঁহাদিগকে শাস্ত্রনিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, যে ইঁহারা ব্যক্তি বিশেষের নামে পরিচিত নহেন কিন্তু শাস্ত্র অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত। গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্মেও শাস্ত্র-নিষ্ঠতা আছে ; কিন্তু গুরুনিষ্ঠতাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ। শাস্ত্রনিষ্ঠ ধর্ম্মেও গুরুনিষ্ঠতা আছে কিন্তু শাস্ত্র বা আচারনিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষণ। এই উভয়বিধ ধর্ম্মই উপধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে তাহার কারণ এই, উভয়বিধ ধর্ম্মেই দুইটী ভ্রান্তি দেখা গিয়াছে ; প্রথম জগৎ ও মানব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, দ্বিতীয় শাস্ত্র বা গুরুর অভ্রান্ততাবাদ। এই উভয় মূল হইতে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার অভ্যুদিত হইয়াছে। প্রথম উক্ত ধর্ম্ম সকলের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এমন সকল প্রশ্ন ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন যাহা ধর্ম্মের

এলাকাভুক্ত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই পৃথিবী সাতদিনে হইয়াছে, কি সাতলক্ষ বৎসরে ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়; তাহার সহিত মানবাত্মার ভদ্রাভদ্রের সম্বন্ধ নাই। অথচ জগতের অনেক শাস্ত্রনিষ্ঠ ধর্ম্ম তাহাকে ধর্ম্মের এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ যেন মনে করিয়াছিলেন, এই জগৎ সম্বন্ধে মানব-হৃদয়ে যত প্রকার প্রশ্ন উঠিতে পারে সকলের সদুত্তর দেওয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারের কর্ত্তব্য। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফল এই হইয়াছে, ধর্ম্মোপদেশের সহিত জগৎ ও মানব-সম্বন্ধীয় বিবিধ ভ্রান্ত মত সংমিশ্রিত হইয়া আসিয়াছে।

গুরু ও শাস্ত্রের অভ্রান্ততাবাদ হইতেও ঐ প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এক যুগের ভ্রম বহু বহু যুগ মানব-হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছে. ও মানবের চিন্তার প্রসার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু উপধর্ম্ম সকলের এই গতি নির্দ্দেশ করিবার সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই শাস্ত্রনিষ্ঠা ও গুরুনিষ্ঠা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবকে পোষণ করিয়াছে বলিয়াই ঐ সকল ধর্ম্ম এত কাল রাজত্ব করিতেছে এবং মানব-হৃদয়কে শাসন করিতে পারিতেছে। জগদীশ্বর একদিকে যেমন মানবাত্মাতে নিহিত থাকিয়া ধর্ম্মশাসনকে প্রবল রাখিতেছেন, তেমনি আর একদিকে মানব-হৃদয়ে এরূপ একটী স্বাভাবিক বৃত্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা মানব একদিকে তাঁহার সঙ্গে অপরদিকে জগতের বহুকাল-সঞ্চিত অমূল্য জ্ঞান-সম্পত্তির সঙ্গে এবং মানবের ধর্ম্মগুরু মহাজনগণের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। এই স্বাভাবিক বৃত্তিকে ভক্তি নাম দিতেছি। ইহা মানব প্রকৃতির অদ্ভুত উপাদান সামগ্রী; ইহা মানবের অপূর্ব্ব সম্পদ; ইহা মানবের সর্ব্ববিধ মহত্ত্বের মূল। মানব সেই জীব, যে দৃশ্যকে ভুলিয়া অদৃশ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে? অপর জীবেরা যাহা চক্ষে দেখে, যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাকেই ভাল বাসিতে পারে, কিন্তু মানবই কেবল অতীন্দ্রিয় পদার্থকে ভাল বাসিতে পারে। এমন ভাল বাসিতে পারে যে সেজন্য প্রাণ দিতে পারে। যীশু স্বর্গরাজ্যের জন্য প্রাণ দিলেন, কিন্তু এ স্বর্গরাজ্যটী

কি ? তাহা ত তাঁহার ভাষাতেও ব্যক্ত হইল না ; তিনি নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা অভিব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে জিনিসটাকে তাঁহার বিরোধীগণ হাসিয়া উড়াইল, বন্ধুগণ এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া রহিল। অথচ তাহার প্রতি তাঁহার এমনি প্রেম জন্মিল, যে সে জন্য প্রাণটা দেওয়া কিছুই মনে করিলেন না। আবার বলি, এই যে অতীন্দ্রিয় বিষয়কে মানুষ ভাল বাসিতে পারে, অতীন্দ্রিয় বিষয়কে সম্পদ মনে করিতে পারে, ইহাই মানুষের মহত্ব। মানব-হৃদয়ের যে ভাব, যে বৃত্তি, যে শক্তি এই অতীন্দ্রিয় বিষয়কে বুকে ধরে তাহার নাম ভক্তি। এই ভক্তি যখন ভগবানের চরণালিঙ্গন করিয়া স্বর্গীয় বেশে উত্থিত হয় তখন তাহাকে বলি ভগবদ্ভক্তি ; যখন জগতের বহুকাল-সঞ্চিত জ্ঞান-সম্পত্তিকে বুকে ধরে তখন বলি শাস্ত্রনিষ্ঠা ; যখন মহাজনদিগের চরিত্রের আদর্শ দেখিয়া তাঁহাদের চরণে নত হয় তখন বলি সাধুভক্তি। মূলে ইহা একই, প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

এই ভক্তিবৃত্তির বিষয়ে যতই চিন্তা করি ততই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হই। একবার ভাবিয়া দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। জগতের কত বিষয় বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু বহু সহস্র বৎসর পরে তাহাদের ভগ্নাবশেষ সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কোনও স্থানে বা এক মহানগরী ছিল, তাহা ভূমিতলে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, কোনও রাজার কীর্ত্তিস্তম্ভ ছিল তাহা বিদেশীয়েরা অধিকার করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে ; সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্য সকল ছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই ; কত সাহিত্য, কত কাব্য, কত শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ছিল, যাহা মানবের স্মৃতি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এই জাতি সকলের অভ্যুত্থান ও পতনের মধ্যে, সমৃদ্ধি ও অবসাদের মধ্যে, বহুযুগ ব্যাপী ও বহুদূর ব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে, মহাবিনাশ ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি, সাধুজনের উক্তিগুলি, আধ্যাত্মিক জীবনের সম্বলগুলি, সুরক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুদের সকল কীর্ত্তি বিলোপ প্রাপ্ত ; কিন্তু বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনের সহায়ীভূত বস্তুগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন ঘরে আগুন লাগিলে জননী টাকার ও অলঙ্কারের বাক্সটা ফেলিয়া শিশুটাকে বুকে ধরিয়া পলায়ন করেন, তেমনি মানবজাতি প্রলয়ের মধ্যে

ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি বুকে ধরিয়া পলায়ন করিয়াছে। ইহা ভাবিলে কাহার চক্ষে না জল আসে। ইহা হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়? উপদেশ সেই অমূল্য ভক্তি, যাহা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সহিত বাঁধিয়া রাখিতেছে। ভক্তির আতিশয্য হইতেই অভ্রান্তবাদ উঠিয়াছে। মানুষ ভাবিয়াছে, যাঁহাদের পদধূলি পাইয়া পৃথিবী পবিত্র, তাঁহাদের উপরে আবার আমি কি বিচার করিব? তাঁহারা ত ঈশ্বরের অংশ, তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য। মনে কর তুমি একটী বাতি জ্বালিয়া একটী অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতেছ, এমন সময়ে হঠাৎ কোনদিক হইতে একটী তাড়িত আলো জ্বলিয়া উঠিল, সমুদয় ঘর আলোকে ভরিয়া গেল, তখন আর কি তুমি আপনার বাতিটী জ্বালিয়া রাখ, না তাহা নিবাইয়া ফেল? তখন কি তুমি ভাব না আর আমার ক্ষুদ্র বাতিতে প্রয়োজন কি? অমনি তাহাকে নিবাইয়া ফেল। তেমনি যেন ভক্তিতে নত মানুষ সাধু মহাজনদিগের চরণে গিয়া ভাবিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, আমার ভ্রান্তিশীল মতি আর কি বিচার করিবে, এই যে আমার জন্য সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া রহিয়াছে। অতএব আমার বুদ্ধি তুমি নিবিয়া যাও, ইহারাই জ্বলুন। একথা ভাবিলে কি চক্ষে জল আসে না?

[illegible]জের বাতি নিবাইতে যাইতেছে তাহাকে এই মাত্র বলি, ভাই বাতিটা [illegible]ও না, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার হাতে ঐ বাতি দিয়াছেন, তোমার জীবন-পথে [illegible] পক্ষে ঐ তোমার পরম সম্বল। তুমি দেখিবে জীবন-পথে এমন অন্ধকার [illegible]স্তা আসিবে যেখানে ঐ সাধুজীবনের আলোক আর পাইবে না; তখন [illegible] বাতি না থাকিলে অন্ধকার গর্ত্তে পড়িবে; আর একথাও জানিও ঐ [illegible]হৃদয়ের আলোক তোমার বাতিকে নিবাইবার জন্য দেওয়া হয় নাই, [illegible]র আলোককে উজ্জ্বলতর করিবার জন্যই দেওয়া হইয়াছে।

[illegible]আমরা ইহা বিশ্বাস করি, প্রত্যেক ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি প্রত্যেকের হৃদয় [illegible] স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত, শক্তিতে জীবনে ঈশ্বর-দর্শনের [illegible]রে প্রতিষ্ঠিত, শাস্ত্রনিষ্ঠা ও সাধুভক্তি তাহার বিকাশক ও পরিপোষক। [illegible]কের বীজটী ভূমিতে পড়িলেই হয় না, তাহাকে ফুটাইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত [illegible]রিতে সূর্য্যের উত্তাপ চাই, বায়ুর রস চাই, তেমনি ধর্ম্মবীজ মানব-হৃদয়ে থাকিলেই হয় না, তাহাকে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত করিবার জন্য সঙ্গীর

ধর্ম্মভাব, প্রাচীনের জ্ঞান সম্পত্তি ও সাধুজীবনের আদর্শ চাই। এজন্য এ সকলেরই ব্যবস্থা বিধাতা করিয়াছেন। মানুষের ভ্রম এই স্থানে হইয়াছে যে তাহারা সাধুদিগকে ধর্ম্মজীবনের শিক্ষক ও পরিপোষক ভাবে না লইয়া ব্যবস্থাপকরূপে লইয়াছে। তাঁহারা আমাদের চিত্তে আদর্শ ও উদ্দীপনা আনিয়া দেন, এইমাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া মানুষ বলিয়াছে, যে তাঁহারা আমাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই সংস্কারই সর্ব্ববিধ ভ্রমের উৎসস্বরূপ হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের যে মহৎভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি, তাহাতে শাস্ত্রের ও মহাজনদিগের প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছি, সকল উপধর্ম্মের অসার ও অনিত্য ভাব সকলের মধ্যে ধর্ম্মের সার ও নিত্য ভাব লক্ষ্য করিতে পারিতেছি, এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি।

দৃতেঃ পাত্রা দিবোদকং।

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের একটী উপদেশ এইঃ—

ইন্দ্রিয়াণান্ত সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রা দিবোদকং॥

অর্থ—মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয়ের যদি ক্ষরণ হয়, তাহা হইলে চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রের জলের ন্যায় তদ্দ্বারা তাহার সমস্ত হিতাহিত বুদ্ধি ক্ষরিত হইয়া যায়।

যে ঋষি এই বচন রচনা করিয়াছিলেন, তিনি কি দেখিয়া এরূপ [illegible] উপনীত হইয়াছিলেন? একটী চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রে অর্থাৎ ভিস্তীর মশোকে [illegible] একটি মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হয়, তবে তদ্দ্বারা যেমন অজ্ঞাতসারে সমস্ত জল বা[illegible] হইয়া যায়, তেমনি মানব-চরিত্রের একধারে একটী ছিদ্র হইলে তদ্দ্বারা অজ্ঞা[illegible]সারে সমগ্র চরিত্র নষ্ট হইয়া যায়, একথা কি সত্য?

মশোকের ছিদ্রের দৃষ্টান্ত কি সুন্দর! এতদ্দ্বারা আমরা ঋষির হৃদগত ভাবটী কেমন অনুভব করিতে পারিতেছি। এই দৃষ্টান্তটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা কয়েকটী তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রতীতি করিতে পারি।

প্রথম তত্ত্বটী এই, কোনও পাত্রস্থিত জল রাশির মধ্যে যেমন একীভাব আছে, মানব-চরিত্রের মধ্যে তেমনি একীভাব আছে। অর্থাৎ কোনও পাত্রস্থিত জলের এক অংশে কোনও শক্তিকে প্রয়োগ করিলে যেমন সর্ব্বত্র তাহা ব্যাপ্ত হয়, এক অংশে কোনও মলিন পদার্থ মিশ্রিত হইলে, তাহা যেমন সমগ্র জলরাশিকে আবিল করে, তেমনি মানব-চরিত্রের মধ্যে এরূপ একত্ব আছে যে চরিত্রের এক অংশে কোনও শক্তি প্রয়োগ করিলে সমগ্র চরিত্রে তাহা ব্যাপ্ত হয়, এবং এক অংশের সদসদভাব সমস্ত চরিত্রকে কলুষিত বা উন্নত করে। এই সত্যটী আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। আমরা মনে করি, এক অংশের কার্য্য সেই অংশেই আবদ্ধ থাকিবে, এবং তাহার ফল অপর অংশে ব্যাপ্ত হইবে না। মানুষ মিথ্যা কথাটী বলিবার বা প্রবঞ্চনাটী করিবার সময় মনে করে, একটী মিথ্যা কহিলাম বৈত নয়, বা এক বিষয়ে প্রবঞ্চনা করিতেছি বৈত নয়, আর সকল বিষয়ে ত ভাল আছি এবং ভাল থাকিব, তবে আর কি? কিন্তু ত্বরায় দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ চিন্তা কল্পনা মাত্র। মানব-চরিত্রকে ঐরূপ দ্বিখণ্ডিত করিয়া লওয়া যায় না। গৃহস্থের গৃহে যেমন ময়লা কাপড়গুলি লুকাইয়া রাখিবার জন্য একটী ঘর বা একটী থলে থাকে, তেমন যে মানব-চরিত্রের মধ্যে একটী ময়লা কাপড়ের [illegible]য়া কুঠরী রাখা যায়, যাহাতে সমগ্র চরিত্রের পরিচ্ছন্নতা নষ্ট হয় না, [illegible] হয় না। প্রত্যেক কার্য্যের সূক্ষ্ম শক্তি সমগ্র চরিত্রে ব্যাপ্ত হয়।

[illegible]মানব-চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাবার অযৌক্তিকতা জনসমাজে প্রতি-[illegible] প্রতিপন্ন হইতেছে। অনেক স্থলে দেখিতেছি মানুষ মনে করিতেছে [illegible]দ্র সমাজে চলিবার জন্য লোকে যেমন আটপোরে ও পোষাকী দুই [illegible]র বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দুই স্থানের জন্য দুই প্রকার চরিত্র ও দুই [illegible]র আচরণ রাখা যায়। এই ভাবিয়া দুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার আচ-[illegible]াখিয়া দেয়। গৃহে যে স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, পরিবারপীড়ক, সে মনে [illegible]তেছে যে, সে ভদ্রতার আবরণ পরিধান করিয়া বাহিরে ন্যায়কারী, সদ্বি-[illegible]ক ও পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী থাকিবে। ভাবিয়া তদনুরূপ করিতেছে, কিন্তু [illegible]য়ে সে আশা পূর্ণ হইতেছে না। তাহার পরপীড়কতা বাহিরের কাজেও [illegible]প্ত হইয়া পড়িতেছে। একজন লোক কিছু কাল কোনও কারাগারে

কয়েদীদিগের তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে উঠিতে বসিতে নিরুপায়, অসহায়, কয়েদীদিগকে কটুক্তি ও প্রহারাদি করা তাহার অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়া যায়। সে যখন কয়েদীদিগের প্রতি এ প্রকার ব্যবহার করিত তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই বাহিরের কোনও ভদ্রলোকের প্রতি সে কখনও কোনও অভদ্র আচরণ করিবে। সে হয়ত ভাবিয়াছিল দুই স্থান ও দুই অবস্থার জন্য দুই প্রকার আচরণ ও দুই প্রকার চরিত্র রাখিবে। কিন্তু ফল কি হইল? ফল এই দাঁড়াইল যে সে যখন কয়েক বৎসর পরে সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, তখন এমন মেজাজ লইয়া আসিল, যে জন্য ভদ্র লোকে তাহার সঙ্গে মিশিতে ভয় পাইতে লাগিলেন। ভারতবাসী ইংরাজগণ যখন বহুবৎসর পরে এদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন, তখন অনেক স্থলে দেখা যায়, যে সেদেশীয় দাসদাসীগণ তাঁহাদের গৃহে কর্ম্ম লইতে চাহে না। কারণ এদেশে ভৃত্যদিগকে কথায় কথায় "গাধা, শূয়ার, শূয়ারকে বাচ্চা" বলিয়া বলিয়া তাঁহাদের অভ্যাস ও স্বভাব এরূপ দাঁড়ায় যে, দেশে ফিরিয়া ভৃত্যদিগের সহিত গৌজন্যের সহিত কথা কহিতে মনে থাকে না। এজন্য ভারত প্রতিনিবৃত্ত ইংরাজদিগকে যে সে দেশীয় লোক অনেক সময়ে দূরে দূরে পরিহার করে।

ইতিবৃত্তেও মানব-চরিত্রের এই একতার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির পতন হইল কেন? অপরাপর কারণের মধ্যে বোধ হয় একটা কারণ এই যে, প্রাচীন রোমকগণ বহুল পরিমাণে দাসত্ব প্রথাকে প্রশ্রয় দিতেন। তাঁহারা য[illegible] বহির্গত হইতেন, তখন যে সকল দেশ জয় করিতেন, তাহা হইতে [illegible] নরনারীকে বন্দী করিয়া আনিতেন। এই সকল হতভাগ্য [illegible] বাজারে নিলামে বিক্রয় করা হইত। ধনিগণ তাহাদিগকে ক্র[illegible] রোমে এরূপ নিয়ম দাঁড়াইয়াছিল, যাহার যে পরিমাণে অধিক [illegible] দাস দাসী থাকিত তিনি সেই পরিমাণে সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হ[illegible] সকল দাস দাসীর স্বামী বা স্বামিণীগণ সময়ে সময়ে তাহাদিগের [illegible] অত্যাচার করিতেন। অনেক সময়ে অতি সামান্য অপরাধে [illegible] প্রাণদণ্ড করিতেন। একটী দাস যুবতী নিজ স্বামিনীর ভৎর্সনা শুনিয়া উত্তর

করিয়াছিল বলিয়া ঐ উক্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা নিজের মস্তক হইতে হেয়ারপিণ লইয়া তাহার রসনাতে বিদ্ধ করিয়া রসনাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত রোমকের একটী বালক দাস একটী পুষ্পাধার বহন করিয়া আনিতে আনিতে অসাবধানতাবশতঃ ফেলিয়া ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া তাহার প্রভু আদেশ করিলেন যে তাহার হাত পা বাঁধিয়া সমস্ত রাত্রি তাহাকে জলের চৌবাচ্ছার মধ্যে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখা হইবে, মৎস্যগণ তাহার শরীরের মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। এরূপ অত্যাচার প্রতিদিন রোমের গৃহে গৃহে ক্রীত দাসদিগের প্রতি হইত, কাহারও চিত্ত বিশেষ উদ্বুদ্ধ হইত না। কিন্তু ইহার ফল আর এক দিকে গিয়া ফলিল। যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, যে ন্যায়ানুরাগ রোমের প্রধান শক্তি ছিল, এবং রোমকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা জাতীয় চরিত্রে ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল; রোমকগণ অত্যাচার করিয়া করিয়া অত্যাচার বহন করিবার উপযুক্ত হইতে লাগিলেন। জাতীয় চরিত্র হইতে প্রাচীন তেজস্বিতা ও মনুষ্যত্ব চলিয়া গেল। রোম বর্ব্বর জাতিদিগের মুষ্ট্যাঘাত আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

এদেশেও ইহার প্রমাণ আছে। এখানে এরূপ অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন "লোকের কাছে লোকাচার সদ্গুরুর কাছে সদাচার" অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট যখন বসিবে তখন আপনাদের অবলম্বিত মতের মত আচরণ করিবে, কিন্তু লোকসমাজে যখন থাকিবে তখন তৎ তৎ সমাজপ্রসিদ্ধ যে কিছু আচরণ তাহা করিবে। অর্থাৎ [illegible]য় স্বীয় চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া উন্নত ধর্ম্ম ভাব এক অংশে ও লৌকিক [আ]চরণ আর এক অংশে রাখিবে। কালে দেখা গিয়াছে সে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় [কে]বল ভাবুকতা বা বাহ্য ক্রিয়ার আচরণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা-[দে]র আদেশ উপদেশাদি দ্বারা জনসমাজকে কিছুমাত্র উন্নত করিতে পারে [না]ই; বরং সমাজের নানা প্রকার ব্যাধি তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে।

[ই]তিবৃত্তে যাহা দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত জীবনেও তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। [আ]মাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্রবেই এরূপ মানুষ অনেক দেখিয়াছি, যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের প্রথমোদ্যমে আপনাদের চরিত্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভাবিয়াছেন, যে তাঁহারা গৃহে, পরিবারে ও সমাজ মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাকে লইয়া যাইবেন

না, তাহাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ও উপাসনা-মন্দিরে আবদ্ধ রাখিবেন। তাঁহারা যেন পরস্পরকে বলিয়াছেন "দেখ ভাই, অপরদিগের ন্যায় আমরা কাঁচা মাটীতে পা দিব না, ব্রহ্মোপাসনা বড় ভাল জিনিস, ব্রহ্মোপাসনাকে আমরা ধরিয়া থাকিব, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনে যেরূপ চলিয়া আসিতেছি সেইরূপ চলিব। যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত সদনুষ্ঠানে যোগ দিতেছি তাহা দিব।"

কিন্তু কালে দেখা গিয়াছে, তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনার সরসতা নষ্ট হইয়াছে, সদনুষ্ঠানে অনুরাগ চলিয়া গিয়াছে, হৃদয়ের ধর্ম্মভাব কালে বিলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহারা চরমে অপরাপর ব্যক্তিদিগের ন্যায় সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। চরিত্রের এক অংশে একটী দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়া সমগ্র চরিত্রকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছে।

এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন, ক্ষেত্রের জল যেমন আলি দিয়া বাঁধিয়া রাখা যায়, তেমন মানব-চরিত্রকে আলি দিয়া বাঁধা যায় না; এক দিকে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিলে মশোকের জলের ন্যায় সমগ্র জল কালে বাহির হইয়া যায়।

মশোকের দৃষ্টান্ত দিবার আরও একটু তাৎপর্য্য আছে। মশোকের জল যেমন ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া যায়, মানব-চরিত্রের উন্নতি বা অবনতিও সেইরূপ অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। সূচ্যগ্র প্রমাণ ছিদ্র দিয়া অণু অণু পরিমিত জল যখন মশোক হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, তুমি আমি তাহা দেখিতেছি না। যখন বহুল পরিমাণে জল বাহির হইয়া গি[illegible] মশোকটা খালি হইয়া গিয়াছে তখনি হয়ত প্রথম লক্ষ্য করিতেছি[illegible] তেমনি ইন্দ্রিয় বিশেষের ক্ষরণ হইয়া মানব চরিত্র কিরূপে তিল তিল করি[illegible] নামিয়া যাইতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, যে ব্যক্তি[illegible] চরিত্র নামিয়া যাইতেছে তিনিও বোধ হয় লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছেন ন[illegible] তিনি হয়ত মনে করিতেছেন,, কৈ আমার ত বিশেষ অধোগতি দেখিতে[illegible] না, সেই পুরাতন কাজ, সেই পুরাতন উৎসাহ, সেই পুরাতন বন্ধু বা[illegible] সকলিত রহিয়াছে, আমি নামি নাই বরং উঠিতেছি। কিন্তু কয়েক বৎসরে[illegible] পরে দেখা গেল মানুষটী উচ্চভূমি হইতে নামিয়া পড়িয়াছে। মানুষ আছে[illegible]

সে শক্তি নাই; কাজ আছে সে অগ্নি নাই; বন্ধু বান্ধব আছে সকলকে অনুপ্রাণিত করিবার সে ক্ষমতা নাই; একটী ক্ষুদ্র আসক্তি সকলকে খাইয়া দিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র আসক্তির কথা বলিলেই কবীরের কথা স্মরণ হয়। কবীর বলিয়াছেন :—

মোটী মায়া সব কোই ত্যজে, ঝিনী ত্যজীন যা।

পীর প্যাগম্বর আউলিয়া ঝিনী সবকো খা।

অর্থ—"মোটা মোটা আসক্তি সকলেই পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না। পীর, প্যাগম্বর, আউল, সূক্ষ্ম আসক্তিতে সকলকে খাইয়াছে।" এই ক্ষুদ্র আসক্তি সূচ্যগ্রের ন্যায় চরিত্রের মোশকে ছিদ্র করিয়া দেয়, যদ্দ্বারা হৃদয়ের সমুদয় ধর্ম্মভাব ক্রমে বহির্গত হইয়া যায়।

এই মানব-চরিত্রের নামাটা বহুদিনে ঘটে। যে চিন্তা অগ্রে নিঃস্বার্থ বিষয়ের ধ্যান করিতে সুখী হইত ও সেইরূপ পথেই ঘুরিত, তাহা অল্পে অল্পে আসক্তির বিষয়ীভূত পদার্থে ঘুরিতে অভ্যস্ত হয়; যে আকাঙ্ক্ষা অগ্রে মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিতে ভাল বাসিত, তাহা তখন সেই ক্ষুদ্র আসক্তির বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার পথ অন্বেষণ করিতে থাকে; যে কল্পনা এক সময়ে উন্নত অবস্থা ও উন্নত লোক রচনা করিতে সুখী হইত তাহা তখন বিষয়-জাল রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতে ভাল বাসে। এইরূপে মানব-চরিত্র যেন সোপান পরম্পরাতে [illegible] করিতে থাকে। প্রথমে চিন্তার অবনতি হয়; তৎপরে আকাঙ্ক্ষার [illegible] ক্ষুদ্রাশয়তা হইতে চিত্ত ক্ষুদ্র কাজে অবতরণ করে, ক্ষুদ্র [illegible] সুখের কথা বার্ত্তা, আত্মীয়তা বন্ধুতা সমুদয় ক্ষুদ্র হইয়া যায়। [illegible] এক সময়ে বিশ্বাসী ও ব্যাকুল ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করিতে ভাল [illegible] হইয়া সে এখন বিষয়ী লোকদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে ভাল বাসে। অগ্রে সে ভাবিত কিরূপে সৎকার্য্যের সহায় হইবে, এখন ভাবে কিসে একখানা বাড়ার পরে আর একখানা বাড়ী করিবে, একটা ঘুড়ী গাড়ির পরে আর একটা ঘুড়ীগাড়ী হইবে। তাহার সকলি

পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বিষয়াসক্তিরূপ ছিদ্র দিয়া সমুদয় মশোকের জল বাহির হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত বচনে আর একটী তত্ত্ব নিহিত আছে। একটী ইন্দ্রিয়ের ক্ষরণ হইলে তদ্দ্বারা হিতাহিত বুদ্ধি পর্য্যন্ত ক্ষরিত হইয়া যায়। এতক্ষণ যে তত্ত্বের বিচার করিতেছিলাম, তাহাতে এইমাত্র অনুভব করিতেছিলাম যে চরিত্রের এক অংশের ভালমন্দ যাহা কিছু তাহা সমস্ত চরিত্রে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু এই উক্তিতে বলিতেছে যে মানবের চরিত্রের সহিত তাহার হিতাহিত বুদ্ধির এমনি নিগূঢ় সম্বন্ধ যে, ইন্দ্রিয়বিশেষের ক্ষরণ হইলে, ক্রমে হিতাহিত বুদ্ধিরও ব্যতিক্রম ঘটে। কলুষিত হৃদয়ের দ্বারা মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি কতদূর কলুষিত হয় তাহা আমরা অনেকে ভাবিয়া দেখি না। দুশ্চরিত্র মানুষের হিতাহিত বুদ্ধিরও বিলোপ হয়, জ্ঞানের নির্ম্মলতাও চলিয়া যায়। জ্ঞানের যে সত্য, হিতাহিত সম্বন্ধীয় যে কর্ত্তব্য সে অগ্রে উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতে পারিত তখন আর তাহা পারে না, সমুদয় সংশয়াকুল হইয়া যায়। অপবিত্র বাসনা হইতে দূষিত বাষ্পের ন্যায় যে সকল চিন্তা ও যে সকল ভাব উত্থিত হইতে থাকে, তাহাতে তাহার চিত্তকে এমনি আবৃত করে যে সে সম্মুখের পথ আর দেখিতে পায় না; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যায়।

সামান্য জ্ঞানের তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য চিত্তের নির্ম্মলতার, হৃদয় মনের সুস্থতার ও প্রকৃতির স্থিরতার কত প্রয়োজন তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই। এমন কি একজন বিজ্ঞানবিৎ যখন বিজ্ঞানের একটী প্রক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছেন, দুইটী সূক্ষ্মদ্রব্য একত্র সংযোজন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন তাঁহার হস্তখানি যাহাতে বিকম্পিত না হয়, দৃষ্টি যাহাতে স্থির থাকে, চিত্ত যাহাতে একাগ্র থাকে, স্নায়ুমণ্ডল যাহাতে উত্তেজনাহীন থাকে, এজন্য সমগ্র প্রকৃতির সুস্থতা ও চিত্তের নির্ম্মলতার প্রয়োজন। অন্তরে অসুস্থ, উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত, সে কিরূপে দৃষ্টি ও চিত্তকে স্থির রাখিবে?

সামান্য লৌকিক জ্ঞান সম্বন্ধেই যখন এইরূপ, তখন পারমার্থিক [illegible] সম্বন্ধে যে ইহা কতগুণে সত্য তাহা সহজেই ধারণা করিতে পারা যায়। [illegible] যে পরস্পর বিসম্বাদী কর্ত্তব্যের মধ্যে একটীকে নির্ণয় করিবে, নানা প্রবৃত্তি ও নানা স্বার্থের [illegible] মধ্যে কোন্ পথ [illegible]

তত্ত্বের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্য-রত্ন উদ্ধার করিবে, চিত্তের নির্ম্মলতা ও স্থৈর্য্য ভিন্ন কি তাহা করিতে পারে? আমি বলি যাহার হৃদয় সুস্থ, ঈশ্বর মানব ও জগতের সঙ্গে যাহার মিত্রতা, এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অধ্যাত্ম-তত্ত্বের প্রকৃত আলোচনা করিতে পারে না।

ইহার বিপরীত কথাও সত্য। যাহার চিত্ত কলুষিত, হৃদয় অসুস্থ, অন্ত-র্দৃষ্টি মলিন, তাহার হিতাহিত বুদ্ধিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অসৎ লোক চিন্তা-তেও ভুল করে। গুরুতর কর্ত্তব্য অনেক সময়ে তাহার নিকট লঘু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন চিন্তা বা মলিন কার্য্যের মলিনতা তাহার দৃষ্টিকে আবরণ করে, এবং সেরূপ ব্যক্তি কর্ত্তব্যের পথ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় না। অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ হয়, সামান্য সরলমতি বালক বালিকার নিকট যে সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা এই কলুষিত হৃদয় জ্ঞানাভি-মানীদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। এই জন্যই বলি, ঋষিদের কথা সত্য, যাহার ইন্দ্রিয় ক্ষরণ হয় তাহার প্রজ্ঞাও ক্ষরিত হইয়া যায়।

চক্রনাভি ও চক্রনেমি।

সেই পরম পুরুষ কিরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা বুঝাইবার জন্য উপনিষদকার ঋষিগণ একটী উৎকৃষ্ট উপমা দিয়াছেন। তাহা —

> তদ্যথা রথনাভৌচ রথনেমৌচারাঃ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
> এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বেদেবা, সর্ব্বেলোকা,
> সর্ব্বে প্রাণা সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ।

অর্থাৎ যেরূপ রথনাভিতে ও রথনেমিতে অর সকল অর্পিত থাকে, তেমনি পরমাত্মাতে সমুদয় ভূত, সমুদয় দেবতা, সমুদয় লোক, সমুদয় প্রাণ ও আত্মা সমর্পিত রহিয়াছে।

এই বিষয়ে আমি যত উপমা বা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি সকলের মধ্যে এইটীকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে হয়। ইহার নিগূঢ় অর্থের মধ্যে প্রবেশ করিলে এক আশ্চর্য্য

ভাব মনে আসে। রথচক্রের অর সকল যে স্ব স্ব স্থানে বিধৃত হইয়া থাকে, ও স্বীয় স্বীয় কার্য্য করে, তাহার প্রধান কারণ দুইটী শক্তি,—প্রথম, কেন্দ্রস্থ নাভির শক্তি—দ্বিতীয়,পরিধিস্থ নেমির শক্তি। কেন্দ্র হইতে নাভি অর সকলকে ধরিয়া রাখে, পরিধি হইতে নেমি তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র ও পরিধি উভয় স্থানেই এক শক্তি; সেই পরমাত্মা, পরম পুরুষ, পরা-শক্তি যে নামেই তাঁহাকে আখ্যাত কর না কেন,তিনিই কেন্দ্র হইতে জীবন ও শক্তিকে উৎসারিত করিতেছেন, আবার পরিধি হইতে প্রত্যেক পদার্থকে তাঁহার মহা আবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিতেছেন। তিনি দূর হইতে সুদূরে, আবার তিনি নিকট হইতেও নিকটে।

কেন্দ্র হইতে শক্তি কিরূপে পদার্থকে ধারণ করে তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রথম দৃষ্টান্ত সূর্য্য, সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া সৌরজগতকে ধারণ করিয়া আছে। গ্রহ উপগ্রহ সকল সূর্য্যের দ্বারাই বিধৃত হইয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে জীবন ও কার্য্যকে রক্ষা করিতেছে। কেন্দ্র স্থানে সূর্য্য না থাকিলে কি হইত, ব্রহ্মাণ্ডে জীবন থাকিত কি না তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। ভক্তিভাজন আর্য্য ঋষিগণ এই বলিয়া আদিত্যের উপাসনা করিয়াছিলেন, যে আদিত্যই জীবন ও শক্তির উৎস। তাহা মিথ্যা নহে। আদিত্য না থাকিলে উদ্ভিদ ও জীবের জীবন থাকিত না, এই অত্যাশ্চর্য্য জগৎ সৌন্দর্য্যদ্বারা বিভূষিত হইত না।

সূর্য্য যেমন কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলকে ধারণ করিতেছে, উদ্ভিদ ও জীবকে জীবন ও শক্তি দিতেছে, তেমনি আমাদের হৃৎপিণ্ড বা রক্তাধার আমাদের দেহের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া ইহাকে ধারণ করিতেছে; প্রতিনিয়ত রক্তস্রোতকে প্রবাহিত রাখিয়া দেহের ক্রিয়া সকলকে রক্ষা করিতেছে। এখানেও শক্তি কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে যাইতেছে। এই-রূপ কেন্দ্রস্থ মেরুদণ্ড হইতে স্নায়বীয় তরঙ্গ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ধাবিত হইতেছে।

এইরূপে যে গূঢ় শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া জনসমাজ ও মানব-পরিবার সকল বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারও বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে

প্রত্যেক মানব সমষ্টির মধ্যে এক একটী প্রেমের কেন্দ্র আছে; যাহাতে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতেছে। গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিলে দেখিতে পাই যে, পরিবারের মধ্যস্থলে হয় ত একজন নারী রহিয়াছেন, যিনি প্রেমের দশবাহু বিস্তার করিয়া যেন দশদিকে দশজনকে ধরিয়া রাখিতেছেন। তাঁহার সহিত গূঢ় প্রীতিসূত্রে একদিকে পতি বাঁধা, অপর দিকে পুত্র কন্যাগণ বাঁধা, অপর দিকে দাস দাসীগণ, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলে বাঁধা। অব্যক্ত প্রেমের শক্তি যে কত, মানুষ তাহা জানে না! একবার ভাবিয়া দেখে না! সাধারণ মানুষের বুদ্ধি বড় স্থূল, তাহারা স্থূল বস্তুকেই দেখে। ধন সম্পদ, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল শক্তি বাহিরে কাজ করে, তাহাদিগকেই দেখিতে পায়, তাহাদিগকেই শক্তি বলিয়া স্বীকার করে, মনে ভাবে তাদেরই গুণে মানব-সংসার স্থিতি করিতেছে, ও স্বীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে। সকলের পশ্চাতে, সকলের অভ্যন্তরে, সকলের অন্তরালে যে অব্যক্ত প্রেমের শক্তি লুকাইয়া থাকে, তাহা অনেক সময়ে লক্ষ্য করে না। মানবসমাজ কিরূপে থাকিতেছে, কিরূপে কার্য্য করিতেছে, কিরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে, এই সকল চিন্তা করিতে গেলেই স্থূলদর্শী মানুষের মনে বিষয় বাণিজ্য, শিল্প সাহিত্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি কত কি আসে, আসেনা কেবল সেই প্রেমের কথাটা যেটা প্রকৃত প্রস্তাবে মানব-সমাজকে ধারণ করিতেছে। এই যে তুমি আমি, জন সমাজে রহিয়াছি, স্বীয় স্বীয় সুখ দুঃখের বোঝা বহিতে পারিতেছি, ঘটনা ও অবস্থা সকলের ঘাত প্রতিঘাত পাইতেছি, ইহার মূলীভূত কারণ প্রেমের শক্তি। আমরা দশজনে প্রীতিসূত্রে এক একটী কেন্দ্রের সহিত বদ্ধ রহিয়াছি। আমি দশজনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, তুমি দশজনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, আর একজন আর দশজনকে [illegible]য়া রাখিয়াছেন, এইরূপ বাঁধা-বাধির, ধরাধরির মধ্যে আমরা বাস করি-[illegible] যাহার ভাল বাসিবার বা যাহাকে ভাল বাসিবার কেহই নাই, তাহার পক্ষে জন-সমাজও যাহা বিজন অরণ্যও তাহা। প্রেমের বাঁধন আছে বলিয়াই শত দুঃখের কষাঘাত, শত শত্রুতার তীব্রতা সহ্য করিয়াও মানবসমাজে থাকিতে পারি। এই প্রেমের শক্তিই মানব-সমাজের স্থিতি ও উন্নতির প্রধান কারণ। এই শক্তি নারী হৃদয়ে অধিক পরিমাণে

আছে বলিয়া, গৃহ পরিবার ও সমাজ সমুদয় নারীর উপরে প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এখন বলি সূর্য্য যেমন সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া সৌরজগতকে ধারণ করিতেছে, হৃৎপিণ্ড বা মেরুদণ্ড যেমন মানব-দেহের কেন্দ্র স্থানে থাকিয়া দেহের সমুদয় গতি ও কার্য্যকে রক্ষা করিতেছে, নারী-হৃদয় যেমন গৃহ, পরিবার সমাজ সকলের কেন্দ্র স্থলে থাকিয়া সকলকে রক্ষা করিতেছে, তেমনি সেই জ্ঞানময় ও প্রেমময় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র স্থলে থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন। রথনাভি যেমন অর সকলকে ধরিয়া রাখে, তেমনি তিনিই সমুদয় চরাচরকে ধরিয়া রাখিতেছেন। কিন্তু চক্রনাভি যেমন অর সকলকে ধরিয়া রাখে তেমনি নেমিও তাহাদিগকে ধারণ করে। ব্রহ্মাণ্ড-চক্রের স্থলে এই মাত্র প্রভেদ যে যিনি চক্রনাভি তিনিই চক্রনেমি। তিনিই ভিতর হইতে জীবন ও শক্তিকে উৎসারিত করিতেছেন, তিনিই বাহির হইতে সমুদয়কে ধারণ করিতেছেন। আমরা বাহির দিয়া যখন দেখিতেছি, তখন বিবিধ শক্তির ক্রীড়া দেখিতেছি, বিবিধ রূপ, বিবিধ বর্ণ, বিবিধ ঘটনা লক্ষ্য করিতেছি। অর সকল যেমন নাভিতে একত্র বদ্ধ থাকিয়াও নেমিতে পরস্পর হইতে দূরে, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরের ঘটনা সকল মূলে এক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াও আমাদের চক্ষে পরস্পর হইতে বিভিন্ন দেখাইতেছে। আমরা তাহাদের আদি অন্ত কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, তাহাদের ভিতরের তত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। যাহারা অভিনয় দেখে তাহারা যেমন দূরে বসিয়া নটগণের গতিবিধি লক্ষ্য করে, সাজঘরের সংবাদ জানে না, আমরাও যেন তেমনি বাহিরে বসিয়া ব্রহ্মাণ্ডশক্তির বাহিরের ক্রীড়া লক্ষ্য করিতেছি, ভিতরের কথা আমাদের নিকটে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঋষিগণ যোগবলে দেখিয়াছিলেন, ভিতরে বাহিরে একই শক্তি, রথনাভি ও রথনেমি উভয়স্থলে একই জ্ঞান, একই প্রেম।

কেন্দ্র ও পরিধি উভয় স্থানেই থাকিয়া কিরূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মূলে এক শক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় শক্তি নাই, অথচ বাহিরে শক্তিতে শক্তিতে সংঘর্ষ দেখিতেছি। কি প্রকৃতি রাজ্যে, কি জীব জগতে, কি মানব-সমাজে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি

যে সকল শক্তির ক্রোড়ে আমরা আশ্রিত আছি, তাহারা কখনও কখনও রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমুদয় ভগ্ন করিতে চাহিতেছে! বহু বহু সহস্র বৎসরে যে ভূস্তর বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, এক দিনের ভূমিকম্পে তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল; ধরাগর্ভস্থ অগ্নিরাশি শমনের লোল জিহ্বার ন্যায় উদ্গীরিত হইয়া বহু বহু যোজন ব্যাপিয়া ধরাপৃষ্ঠকে ধাতুদ্রবে নিমগ্ন করিল; যে সকল স্থান শ্যামল শস্যে, জীব মানবের আবাস গৃহে, বা সুখ সমৃদ্ধিপূর্ণ মহানগরে পূর্ণ ছিল, তাহা মৃত্যুর ঘন অন্ধকারে চিরমগ্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইল। কোথাও বা বহুজনপদপূর্ণ ভূভাগ বিষয় বাণিজ্যের কোলাহলে পূর্ণ রহিয়াছিল, একদিন মহা ঝটিকার মহা আঘাতে সাগর বারি নৃত্য করিয়া সেই ভূভাগে ধাবিত হইল, বহু শতাব্দীর সুখ সমৃদ্ধি একদিনে ডুবাইয়া দিল। এইরূপে জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি যাহাদিগকে মানব-জীবনের বন্ধু, ও মানব-জীবনের রক্ষক ও প্রতিপালক বলি, তাহারাই এক এক সময়ে দুর্জ্জয় বিক্রম প্রকাশ করিয়া মানবকে ত্রস্ত ও বিকম্পিত করিতেছে। বহুকালের গঠিত বিষয় সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কেবল কি জড় ও জড়ীয় শক্তির মধ্যে এইরূপ রুদ্ররূপ দেখিতেছি তাহা নহে। আমরা সচরাচর বলি, মানব মানবকে চায়, এই জন্যই জনসমাজের অভ্যুদয়। কিন্তু অপর দিকে দেখিতেছি, সামান্য স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষকে বিনাশ করিতেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধ ঘটিয়া সহস্র সহস্র মানুষ নিধন প্রাপ্ত হইতেছে, বহু বহু শতাব্দীর সুখ সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইতেছে। এই সকল দেখিয়া আমরা এক এক সময়ে চিন্তা করিতে বসি, ব্রহ্মাণ্ডশক্তি কি গড়িতে চায়, না ভাঙ্গিতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকারীর হৃদয়ের অবস্থার উপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাঁহারা তিক্ত ও বিষাক্ত চক্ষে জগতের দিকে চান তাঁহারা দেখেন ভাঙ্গাই গূঢ় ব্রহ্মাণ্ডশক্তির প্রধান কাজ। তাঁহারা বলেন, জগতের মূলে যিনিই থাকুন, ভাঙ্গিতে, মারিতে ও যাতনা দিতে তাঁহার দয়া মায়া নাই। মারিবার সময়ে তিনি আপনার পর বিচার করেন না। যে শরণাপন্ন হইয়া কাঁদিতেছে, তাহাকেও অতল সাগর জলে বা ভূকম্পভগ্ন মৃত্তিকারাশির মধ্যে সমাহিত করেন। আবার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম ও প্রাণে মিষ্টতা আছে, তাঁহারা জগতের সৌন্দর্য্য ও জীবের সুখের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, দেখ

জগতের পিতা মাতা কিরূপ দয়ালু। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে না পারিলেও আমরা গড়ের উপরে একথা বলিতে পারি যে তিনি কেন্দ্র ও পরিধি উভয় দিক হইতে মানব-জীবনকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি সকল ও মানব-হৃদয়ের ভাব সকল সময়ে সময়ে যতই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করুক না কেন, তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য মানব-জীবন হইতে দূরে নহেন।

কেবল যে বাহিরে আমরা তাঁহার প্রসন্নরূপ ও রুদ্ররূপ দুই রূপ দেখিতেছি তাহা নহে, আত্মার গভীর অভ্যন্তরেও উক্ত উভয় রূপ লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের হৃদয় কখনও বা প্রেমের সুকোমলতা, পুণ্যের স্নিগ্ধতা অনুভব করিতেছে, আবার কখনও বা প্রবৃত্তিকুলের ঘাত প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছে, কখনও বা সাধু সঙ্গে বসিয়া তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিতেছি আবার কখনও বা পাপ বিকারে অন্ধ প্রায় হইয়া তাঁহাকে হারাইয়া ফেলি-তেছি। তখন তাঁহার সেই প্রেমমুখ আমাদের নিকটে উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ানক বোধ হইতেছে। তখন যেন দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া পাপী বলিতেছে,

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তদ্দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।

এখানেও প্রসন্নতা ও রুদ্রতা উভয়ের মধ্যে একই জন, দুই জন নাই। একই জন প্রেমে সকলকে ধারণ করিতেছেন।

আমরা যদি একবার পরিষ্কার করিয়া বুঝি যে চক্রনাভি ও চক্রনেমির ন্যায় তিনিই ভিতর বাহিরে আমাদের জীবনকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে ধৰ্ম্ম কত স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে কত আশা ও আনন্দ বৰ্দ্ধিত হয়,হৃদয় মনে কত শক্তি ও সাহস আসে! জগদীশ্বরের এরূপ বিধি নয় যে মানবাত্মা প্রাচীন বৃক্ষের ন্যায় জীর্ণ ও শুষ্ক হইয়া যাইবে। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে নিরুদ্যম ও শক্তিহীন হইয়া সংসারে অবসন্ন দশায় থাকিবে। তিনি যেন আমাদিগকে বলিতেছেন, "ভয় কি ভয় কি, ধৰ্ম্মকে আশ্রয় করিতে কেন ভয় পাও, আমি যে তোমাদের ভিতর বাহিরে ধরিয়া রহিয়াছি।" ইহাতে কোনও ভুল নাই, যে ধৰ্ম্মে আপনাকে দিলে তাঁহার ক্রোড়েই আপ-

মাকে দেওয়া হয়, অথচ অকপটে ধর্ম্মে আপনাকে দিতে আমরা কত ভয় পাই। এই যে বর্ষ শেষ ও শতাব্দীর শেষ হইতে যাইতেছে, আমরা কি আশাপূর্ণ নয়নে নব বর্ষ ও নব শতাব্দীর দিকে চাহিতে পারিতেছি? তিনি ভিতর বাহিরে জীবনকে ধরিয়া আছেন জানিয়া উৎসাহিত চিত্তে কি ভবিষ্যতে প্রবেশ করিতে পারিতেছি? আজ একবার বিশ্বাসে হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া উত্থিত হই। যিনি ভিতরে বাহিরে জীবনকে ধরিয়া আছেন তাঁহার ক্রোড়ে আপনাদিগকে নিক্ষেপ করি। তিনি শক্তিরূপে হৃদয়ে বাস করুন, আলোকরূপে চক্ষে থাকুন, আমরা আশা ও আনন্দের সহিত তাঁহার পথে অগ্রসর হই।

এ সমুদায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন সে আর মাতার উপরে নির্ভর করে না; তখন নিজ বলের পরিচয় পাইয়া তাহার মন যৌবন-মদে উন্মত্ত প্রায় হয়; তখন তাহার গর্জ্জনে অরণ্যবাসী প্রণী সকল কাঁপিতে থাকে; তখন সে নিজে অপর প্রাণিদিগকে হত্যা করিতে আনন্দ পায়; এবং বলদর্পে স্ফীত হইয়া অপর প্রাণিদিগের উপর লম্ফ দিয়া পড়ে, এবং দন্ত ও নখের আঘাতে তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকে। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহ বলিলে এই বল-জনিত দর্পের ভাবই আমাদের অন্তরে আসে।

এ জগতে মানুষও অনেক সময়ে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় নিজ বল-দর্পে দর্পিত হইয়া থাকে। ধন বল, জন বল, জ্ঞান বল, ধর্ম্ম বল প্রভৃতি অনেক প্রকার বল আছে। এই সকল প্রকার বলের দর্পেই মানুষকে স্ফীত দেখিতে পাওয়া যায়। ধনিদিগের ধনের দর্প, রাজাদিগের রাজ-শক্তির দর্প, সকলেরই সুপরিচিত, বিশেষ ভাবে তাহার উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান সময়েও দেখিতেছি সভ্যতাভিমানী পরাক্রমশালী জাতি সকল যেখানেই কৃষ্ণবর্ণ দুর্ব্বল জাতিদিগের সংস্রবে আসিতেছেন, সেখানেই তাহাদিগকে পশুযূথের ন্যায় হত্যা করিতেছেন। ইহা আপনাদের পরাক্রম ও শক্তির জ্ঞান জনিত দর্পেরই কাজ। জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও পরের প্রতি উৎপীড়ন আছে তাহার মূলে বল-জ্ঞান-জনিত দর্প বিদ্যমান।

এই বল-জ্ঞান-জনিত দম্ভ যে কেবল ধনবান বা পরাক্রমশালী ব্যক্তি-দিগেরই হয়, তাহা নহে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম জনিত দম্ভও আছে। একজন কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোচনা করিয়াছেন, হয় ত দর্শন শাস্ত্রের কতিপয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া-ছেন, তিনি অপরের সহিত আপনার তুলনা করিয়া দেখিতেছেন যে, পাদপ-হীন দেশে যেমন এরণ্ড বৃক্ষের মস্তক উন্নত দেখায়, তেমনি অজ্ঞ সমাজের মধ্যে তাঁহার মস্তক উন্নত দেখাইতেছে, অতএব তিনি এই ভাবিয়া মনে মনে দম্ভ করিতেছেন যে, আমার ন্যায় জ্ঞানী, গুণী ও ধার্ম্মিক আর নাই। যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের ন্যায় এই সকল ব্যক্তি প্রধানতঃ আপনাদেরই উপরে নির্ভর করিয়া থাকেন; সুতরাং প্রকৃত উৎকৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মজীবন লাভে ইঁহারা বঞ্চিত হন।

এই দম্ভের ন্যায় ধর্ম্মজীবনের শত্রু আর নাই। এই কারণেই ভক্তি-পথাবলম্বিগণ দীনতাকে ভক্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ করিয়াছেন। তোমার সমক্ষে যদি একটি দশ হস্ত উচ্চ মৃত্তিকার স্তূপ থাকে, তাহাতে যেমন হিমালয়কেও তোমার দৃষ্টি হইতে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে, তেমনি একটু দম্ভ তোমার দৃষ্টি হইতে অপরের পর্ব্বত প্রমাণ সাধুতাকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে। তুমি উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে যে দিকে চাহিতে যাও সেই দিকেই একটা স্তূপ তোমার দৃষ্টিকে রোধ করে,সেটা তোমার নিজের মস্তক, তবে আর তুমি সাধু জনের সাধুতা বা কি দেখিবে এবং ঈশ্বরের মহত্ত্বই বা কি বুঝিবে! যে রূপবতী নারীর নিজের রূপের জ্ঞান আছে এবং প্রতি পদ-বিক্ষেপে সেই রূপের জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাঁহাকে যেমন কদর্য্য দেখায়, তেমনি যাঁহার মনে জ্ঞান-জনিত বা ধর্ম্ম-জনিত দম্ভ আছে, তাঁহাকেও কদর্য্য দেখায়। তবে দেখিতেছি ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন আত্মপরীক্ষা দ্বারা সর্ব্ববিধ দম্ভ হইতে আপনাকে রক্ষা করা। তৎপরে ঈশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অন্বেষণ করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরা-ন্বেষণ কাহাকে বলে? এবং ঈশ্বরান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইলে কি প্রকার মন লইয়া প্রবৃত্ত হইতে হয়? তাহা নির্দ্দেশ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত বচনে বলা হইয়াছে—"যাহারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করে" এরূপ বলা হয় নাই—"যাহারা পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করে।" যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে ও যাহারা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, এ উভয়ে যে অনেক প্রভেদ তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। কেবলমাত্র নির্ভর বলিলে সকল কথা বলা হয় না। কারণ নিতান্ত স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত ব্যক্তিও ইষ্ট-দেবতার প্রতি নির্ভর করিতে পারে। এরূপ কথিত আছে, ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালী পূজা করে; কারণ তাহারা আশা করে যে, কালীর সাহায্যে স্বার্থ সাধন করিতে সমর্থ হইবে; কালীর সাহায্যের প্রতি তাহাদের নির্ভর থাকে। এই নির্ভরের মূলে কি ভাব? তাহারা তদ্দারা কি কালীকে অন্বেষণ করে? অথবা আপনাদিগকেই অন্বেষণ করে? সকলেই বলিবেন—তাহারা আপনাদিগকেই প্রধানতঃ

অন্বেষণ করে ; স্বার্থ সাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য, কালী তাহার সহায় ও উপায় মাত্র। তেমনি মানুষ অনেক স্থলে যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাহার মূলে এই ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে—হে ঈশ্বর আমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, তোমার দ্বারা। ইহা ত ঈশ্বরান্বেষণ নহে, ইহা নিজেরই অন্বেষণ। প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী ব্যক্তির প্রার্থনা এই—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক আমার দ্বারা।" ঈশ্বরান্বেষণের মূলে আত্মবিস্মৃতি ; যেখানে আত্মবিস্মৃতি নাই, সেখানে ঈশ্বরান্বেষণও নাই।

এই আত্ম-বিস্মৃতি হইতেই অকৃত্রিম বৈরাগ্যের উদয় হয়। একটী বালকের একটী পায়রা উড়িয়া যাইতেছে, সে সেই পায়রাটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিমগ্নচিত্তে দৌড়িতেছে, ও দিকে তাহার স্কন্ধের চাদর কাদায় লুটাইতেছে, সে তাহা জানিতেও পারিতেছে না, পথের লোক চীৎকার করিয়া বলিতেছে, ওরে তোর চাদর গেল !" তেমনি যে সাধু একাগ্রচিত্তে, ঈশ্বরান্বেষণ করেন, তাঁহার স্বার্থের বসন খসিয়া যায়, তিনি তাহা জানিতেও পারেন না, জগতের লোক হয় ত বলাবলি করে, "দেখ দেখ লোকটার স্বার্থ একেবারে খসিয়া গেল ?" ইহাকেই বলে আত্ম-বিস্মৃতি-জনিত প্রকৃত বৈরাগ্য।

অতএব প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণের প্রথম ও মূলগত ভাব আত্ম-বিস্মৃতি। যেখানে আত্ম বিস্মৃতি সেই খানেই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা ! যিনি প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তাঁহার ঈশ্বরান্বেষণ ভিন্ন অন্য অভিসন্ধি নাই। যে মনে অভিসন্ধি নাই, তাহাই নির্ম্মল মন। এরূপ নির্ম্মল মনেই ঈশ্বরের মুখজ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ বিষয়ে সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সাধুগণের একবাক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদ বলেন—"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তি পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ হইলে, সেই নিষ্কল পুরুষকে দেখিতে পান। বাইবেল গ্রন্থে আছে—"Blessed are the pure in heart for they shall see God" অর্থাৎ যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র তাঁহারাই ধন্য ; কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন। ইহা একই উপদেশ। নির্ম্মল মন না হইলে ঈশ্বরের সন্দর্শন লাভ

করা যায় না। কিন্তু নির্ম্মল মন লাভ করার ন্যায় কঠিন সাধনাও আর নাই। আমরা নিরন্তর অনুভব করিতেছি যে দিবানিশি সজাগ থাকিয়াও অনেক সময়ে আপনাদের হৃদয়কে ক্ষুদ্র অভিসন্ধি হইতে রক্ষা করিতে পারি না। এমন কি ক্ষুদ্র অভিসন্ধি অনেক সময়ে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আসে। তখন আমাদের আর উপায় থাকে না। আপনাদের এই দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে একটী প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর কথা স্মরণ হয়। সে কাহিনী এই, ক্রূরমতি মহীরাবণ রাত্রিযোগে রাম লক্ষ্মণকে হরণ করিবার চেষ্টাতে আছে। বিভীষণ হনুমানকে দ্বারে রাখিয়া বলিয়া গেলেন স্বয়ং কৌশল্যা আসিলেও দ্বার ছাড়িবে না। হনু তথাস্তু বলিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহীরাবণ নানারূপ ধারণ করিয়া আসিতে লাগিল। কখনও ভরত হইয়া, কখনও জনক হইয়া, কখনও কৌশল্যা সাজিয়া আসিল, হনু কিছুতেই দ্বার ছাড়িলেন না। অবশেষে মহীরাবণ বিভীষণের আকার ধারণ করিয়া আসিল। তখন হনুর সতর্কতাতে আর কুলাইল না। যে বিভীষণ তাঁহাকে দ্বাররক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শত্রু যখন তাঁহার আকারে আসিল, তখন হনু পরাস্ত হইয়া গেলেন, তেমনি যে ধর্ম্মবুদ্ধি আমাদিগকে দ্বাররক্ষাতে নিযুক্ত করিয়াছে, ক্ষুদ্র অভিসন্ধি যখন সেই ধর্ম্মবুদ্ধির আকার ধারণ করিয়া আসে তখন আমরা আর আত্মরক্ষা করিতে পারি না। এই জন্যই বলিয়াছি সকল প্রকার ক্ষুদ্র অভিসন্ধি হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করার ন্যায় কঠিন সাধন আর নাই। অথচ ইহাই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ইহা না হইলে প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষণই হয় না।

তৃতীয়তঃ যে সাধু প্রকৃত ঈশ্বরান্বেষী তিনি ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইবার জন্য প্রস্তুত। তুমি যদি ঈশ্বরকে এ কথা বলিতে না পার—তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার যাহা করা প্রয়োজন তাহা করিব, যাহা ছাড়া প্রয়োজন তাহা ছাড়িব, তবে তুমি কিরূপ ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছ? ইহাকে যদি তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ মনে না কর, তবে কি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ইহার অন্বেষণ করিতে পার? আমার পাইলেও হয়, না পাইলেও ক্ষতি নাই, এরূপ মনের ভাব লইয়া কি কেহ নিমগ্ন চিত্তে কোনও বিষয়ের অন্বেষণ করিতে পারে? অতএব ঈশ্বরকে

লাভ করিতে গিয়া যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্—এরূপ চিত্ত ভিন্ন তাঁহার অন্বেষণ হয় না। এরূপ ভাবের মূলে আনুগত্য—অর্থাৎ আমি সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত হইতে প্রস্তুত এই ভাব। এটীও ঈশ্বরান্বেষণের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই ভাব হইতেই ধর্ম্মজীবের বীরত্বের উদয় হয়। এরূপ ব্যক্তি অকুতোভয়ে সত্যের অনুসরণ করেন, এবং ক্ষতিলাভের চিন্তা বিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন।

পূর্ব্বোক্ত বচনের সর্ব্বশেষ উক্তি—ঈশ্বরান্বেষীর কোনও উৎকৃষ্ট বিষয়ের অভাব হইবে না। ইহা আমরা দুই ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ ধর্ম্মজীবনের ন্যায় উৎকৃষ্ট বিষয় আর নাই, অতএব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ যে কোনও বিষয়ের প্রয়োজন তাহারও অভাব হইবে না। তোমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে ধর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যদি তোমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়, অর্থ পাইবে, মানুষের প্রয়োজন হয়, মানুষ পাইবে সে জন্য ভাবিও না, কেবল এই দেখ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতেছ কি না? সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে ধর্ম্মজীবনের অভাব হইবে না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত কিন্তু ধর্ম্মজীবনের উন্নতির উপাদান স্বরূপ ধন জনেরও অভাব হইবে না, তাহা হয় ত অনেকে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। অথচ জগতের ইতিবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যেখানেই মানব নিঃস্বার্থ ও অকপট ভাবে ঈশ্বরান্বেষণ করিতেছে, অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া তাঁহার কার্য্যে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতেছে, সেই খানেই ধন জনের অপ্রতুল থাকিতেছে না। অপর দিকে যৌবন-প্রাপ্ত সিংহের নিজের অভাব নিবারণের কারণ ও আয়োজন সত্ত্বেও সে যেমন কখন কখনও ক্ষুধায় মরে তেমনি ধনে জনে বলবান ব্যক্তিরাও হয় ত কৃতকার্য্যতা লাভে অসমর্থ হইতেছেন, কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসী ও বিনয়ী সাধু ঈশ্বরের প্রচুর কৃপা লাভ করিয়া তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতেছেন।

ধর্ম্মজীবনের উপাদান। *

আমরা ধর্ম্মজগতে তিন প্রকার বিভিন্ন ভাবাপন্ন তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইতেছি। প্রথম শ্রেণীর সাধকগণ মতের বিশুদ্ধতাকেই ধর্ম্ম-জীবনের সর্ব্ব প্রধান উপাদান বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অবলম্বিত ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ মতকে সত্য মত ও ধর্ম্ম-জীবনের ভিত্তি স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। যদি কেহ সেই মতগুলিকে অবলম্বন না করে, তবে তাঁহারা সেরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম্মজীবন হইতে বিচ্যুত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি উপস্থিত হয়। এই বিদ্বেষ-বুদ্ধির মূলে প্রবেশ করিলে আর একটী ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকের এই বিশ্বাস আছে যে, বিকৃত-হৃদয় না হইলে কেহ সত্যকে বিকৃত ভাবে দর্শন করে না। আমরা যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিতেছি তাহাই সত্য, সুতরাং যাহারা তাহাকে বিকৃত ভাবে দর্শন করিতেছে তাহাদের হৃদয় নিশ্চয় বিকৃত। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ সামান্য মত ভেদের জন্য বিরুদ্ধমতা-বলম্বীদিগকে দস্যু তস্করের ন্যায় শাস্তি দিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বদেশে বিদেশে ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে ভূরি পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের পরস্পরের সহিত বিবাদ, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ও পর-স্পরকে নিগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি বঙ্গবাসিদিগের সুবিদিত; সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দক্ষিণাত্যে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে এরূপ বিরোধ ঘটনা হইয়াছে যে, দ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণগণ অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ-দিগের জল গ্রহণ করেন না; অদ্বৈতবাদিগণ দ্বৈতবাদীদিগের জল গ্রহণ করেন না। এক জাতীয় লোক হইয়াও তাঁহারা পরস্পরকে বিভিন্ন জাতীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ত গেল বর্ত্তমান সময়ে;

* ১৮৯৬ সাল, ১৯শে, জুলাই রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এ দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তেও এই মত-বিভেদ-জনিত বিদ্বেষের প্রচুর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দেশে এক কালে হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধকদিগের মধ্যে যে বিবাদ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সমুদায় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু এই মত-বিরোধ-নিবন্ধন যে পরস্পরকে অনেক নিগ্রহ করা হইত তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল যে এতদ্দেশেই এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে; অপরাপর দেশেও এই ভাবাপন্ন লোকদিগের কার্য্যের অনেক নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কথাতে প্রয়োজন কি, প্রাচীন গ্রীকগণ যে খ্যাতনামা সক্রেটিসকে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা হত্যা করিয়াছিল, তাহার কারণ কি? তিনি কোন্ অপরাধে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন? কোন্ গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছিলেন? তিনি কি দস্যু বা তস্করের স্থায় পরস্বাপহরণ করিয়াছিলেন? অথবা দুষ্ক্রিয়াম্বিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-বিহীন লোকের ন্যায় ধর্ম্ম-শৃঙ্খলকে ভগ্ন করিয়াছিলেন? তবে কোন্ অপরাধে তাঁহার প্রতি এই গুরুতর দণ্ডের বিধান হইল? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশের দ্বারা শত শত যুবকের মনে ঈশ্বর-পরায়ণতা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তিনি কোন্ অপরাধে নরহন্তা দস্যুর ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন? ইহার উত্তর এই—সক্রেটিস এমন কোনও কোনও মত প্রচার করিয়াছিলেন যাহা প্রচলিত মতের বিরোধী। সুতরাং প্রাচীন মতের বিশুদ্ধতাবাদিগণ তাঁহাকে চোরের অধম বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। তৎপরে যদি আমরা মহাত্মা যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? তিনি কোন্ অপরাধে চোরের শাস্তি পাইলেন? তিনি কি দুষ্ক্রিয়াম্বিত লোক ছিলেন? যাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা জগতের কোটি কোটি নরনারী ধর্ম্মজীবন পাইয়াছে তিনি কি এক জন দস্যুর শাস্তি ভোগ করিবার উপযুক্ত? অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাইলেট যখন য়িহুদীদিগকে বলিলেন,—"বিশেষ উৎসবের দিনে একজন কয়েদীকে নিষ্কৃতি দিতে চাই,—তোমরা কি বল? এই যীশুকে কি নিষ্কৃতি দিব?" তখন য়িহুদীগণ বলিল,—"না বরং বারাবাস নামক চোরকে নিষ্কৃতি দিন, কিন্তু যীশুকে হত্যা করুন।" একজন দুষ্ক্রিয়াম্বিত লোক নিষ্কৃতি পাইয়া তাহাদের সমাজে প্রবেশ করে, ইহা তাহাদের পক্ষে শ্রেয় বোধ হইল; কিন্তু যীশুর প্রাণ রক্ষা

শ্রের বোধ হইল না। তিনি চোরেরও অধম বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ইহার কারণ কি ?, কারণ মতের বিশুদ্ধতার প্রতি য়িহুদীদিগের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাহারা মতের বিশুদ্ধতার দ্বারাই মানুষের বিচার করিত। সর্ব্বত্রই মতের বিশুদ্ধতাবাদীদিগের অল্পাধিক পরিমাণে এই ভাব।

এই মতের বিশুদ্ধতাবাদীগণ যেমন এক দিকে মতের বিশুদ্ধতার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্মজীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের যদি মতের বিশুদ্ধতা থাকে কিন্তু ধর্ম্মজীবনের অপরাপর লক্ষণ কিছুই না থাকে, তথাপি তাঁহারা সে ব্যক্তিকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। মনে কর একজন ব্রাহ্ম আছেন, যিনি দিনের পর দিন ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করেন না ; ভুলিয়াও একদিন সাপ্তাহিক উপাসনা মন্দিরে আসেন না ; সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে হয় ত গৃহে বসিয়া বন্ধুদিগের সহিত তাস খেলিয়া কাটান ; তাঁহার গৃহে কোনও প্রকার গার্হস্থ্য বা সামাজিক অনুষ্ঠান দেখা যায় না ; কিন্তু তাঁহার মতগুলি অতি বিশুদ্ধ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুমোদিত। মতের বিশুদ্ধতা দ্বারা প্রধানতঃ যাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করেন, তাঁহাদের নিকট ইনি একজন ধার্ম্মিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার মতের বিশুদ্ধতার দ্বারা যেন সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে !

এইরূপ ধর্ম্ম জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ভাবুকতাকেই ধর্ম্মজীবনের প্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। উৎসাহের সহিত দশজনে সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলে, অথবা প্রাণায়াম সহকারে একাগ্রতার সহিত মন্ত্রবিশেষ জপ করিলে যে ভাবোদয়-জনিত একপ্রকার অন্তঃস্ফূর্ত্ত সুখের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকেই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সুতরাং তদ্দ্বারাই তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের বিচার করিয়া থাকেন। সেই অন্তঃস্ফূর্ত্ত সুখ লইয়াই তাঁহারা চরিতার্থ ; অপর সকল বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন। মানুষের মত অথবা নীতি বিশুদ্ধ হউক বা না হউক সে দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই। একজন সাকারবাদীই হউক অথবা নিরাকারবাদীই হউক, বাক্যে ও ব্যবহারে সত্যনিষ্ঠই হউক বা কপটচারীই হউক, তাহাতে আসে যায় না ; এই বিশেষ ভাবের সাধনে যিনি যত

অগ্রসর তিনি এই শ্রেণীর লোকের চক্ষে তত অধিক সাধক নামের উপযুক্ত।

তৃতীয়, আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়ার আচরণ ও বাহিরের বিধি ব্যবস্থা পালনকেই ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান উপাদান মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্মসাধন ইহাদের চক্ষে কতকগুলি বাহিরের নিয়ম পালন মাত্র; এবং যিনি যে পরিমাণে সেই সকল নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, তিনিই ইহাদের চক্ষে সেই পরিমাণে ধার্ম্মিক। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এই বাহ্য নিয়ম পালনের তুলনায় ধর্ম্মজীবনের অপরাপর অঙ্গের প্রতি উদাসীন। একজনের মত বিশুদ্ধ বা অবিশুদ্ধ হউক, তাহার হৃদয়ে প্রেম থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে আসে যায় না, সে যদি শাস্ত্রোক্ত বা কুলক্রমাগত নিয়ম সকল মানিয়া চলে, তবেই এই শ্রেণীর লোক সন্তুষ্ট। আমরা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবস্থা দেখিতেছি। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদ্বয় অগ্রে যাহাই থাকুক এক্ষণে কেবল বাহ্য নিয়ম পালনে দাঁড়াইয়াছে। তোমার মত ওভাব যেরূপই হউক না কেন, তুমি বাহিরের নিয়মগুলি পালন করিলেই তাহাদের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

অগ্রে ধর্ম্মজীবনের যে তিন প্রকার উপাদানের উল্লেখ করা গেল, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার কোনওটীকেই অবহেলা করেন না। এই তিনটীই ধর্ম্মজীবনের উপাদান, এবং ধর্ম্মজীবন গঠনে তিনটীরই প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই তিনটীকে প্রধান উপাদান বলিয়াও সন্তুষ্ট নহেন; আরও কতকগুলি উপাদান আছে, যাহা প্রধান না হইলেও এগুলির পরিপোষকও সহায়। সেগুলির অভাবে এগুলি সুন্দর, সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণরূপ কার্য্যকারী হয় না। সেগুলিকে নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীরের পাদরক্ষক ভিত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই পাদরক্ষক ভিত্তিকে এতদ্দেশে পোস্তগাঁথা বলে। ইহা অনেকেরই বিদিত আছে, যে নদীতীরে প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে অনেক দূর হইতে পোস্ত গাঁথিয়া তুলিতে হয়। ইহা অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। পোস্ত যেমন প্রাচীর নহে, কিন্তু প্রাচীরের দৃঢ়তাবিধান ও রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি এই উপাদানগুলি মুখ্য না হইলেও ধর্ম্মজীবনের দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্যের জন্য অত্যাবশ্যক। সেগুলিকে

আর একপ্রকার পদার্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, যাহারা কোনও পদার্থে কোনও প্রকার রং ধরাইতে চায়, তাহারা সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার রংএর অস্তর দিয়া থাকে। অস্তর না দিলে তাহাতে রং ভাল করিয়া ফলে না, অর্থাৎ সুন্দর দেখায় না। আমি ধর্ম্ম-জীবনের যে উপাদানগুলির উল্লেখ করিব তাহারা যেন ধর্ম্মসাধনের অস্তর-স্বরূপ। সেগুলি না থাকিলে ধর্ম্মসাধনের ফল সমুচিতরূপ ফলে না।

সেই গৌণ উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম জ্ঞানালোচনা। জ্ঞানালোচনার অভ্যাস ও সাধন ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রকৃত-রূপে সাধিত হইতে পারে না। জ্ঞানালোচনা বলিতে কেবলমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানের আলোচনা বুঝিতে হইবে না। সামান্ত লৌকিক জ্ঞানের আলো-চনাও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিপুষ্ট ও সুন্দর করিয়া থাকে। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, অঙ্ক, জ্যোতিষ, তর্কশাস্ত্র, অর্থনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি কোনও জ্ঞানই ফেলিবার জিনিস নহে। ধর্ম্মজীবন গঠনে সকলেরই উপ-যোগিতা আছে। যাহাতে চিন্তাশীলতাকে বর্দ্ধিত করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগ-রুক করে, চিন্তার উপকরণ সামগ্রী সকলকে মনের মধ্যে সংগৃহীত করে, চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত করে, মনের দৃষ্টিকে প্রসারিত ও হৃদয়কে উদার করে, সে সমুদায় কি ধর্ম্মজীবন গঠনের উপযোগী নহে? অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তায় উদার ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-দিগের পক্ষে জ্ঞানালোচনা কখনই উপেক্ষণীয় বস্তু নহে। ব্রাহ্মপরিবার সকলের এ বিষয়ে মনোযোগ থাকা অতীব আবশ্যক। এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মমাত্রেই জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। এখন অনেক ব্রাহ্মপরিবারের অবস্থা এরূপ দেখা যায় যে তাঁহাদের সমগ্র ভবন অনুসন্ধান করিলে দশখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ মিলা দুষ্কর। অনেকের পাঠাগার প্রাচীরে সংলগ্ন একটী শেলফে পর্য্যবসিত; তাহাও ব্যবহারের অভাবে কীটাকুলিত। এরূপ অবস্থা অতীব শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, ইহাকে ধর্ম্ম জীবনের একটী প্রধান উপাদান বলাই কর্ত্তব্য। অথচ ইহা ছোট বড় সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। আমাদের সকলকেই সংসারে বাস করিতে হয়, গৃহধর্ম্ম করিতে হয়, সকলেরই কিছু

না কিছু কাজ আছে। আমাদের মধ্যে কে এমন আছে, যাহার কোনও কর্ত্তব্য নাই? যদি আমরা প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্যকে অতি পবিত্র জ্ঞানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করি,তদ্দ্বারা আমাদের চরিত্রের এরূপ শিক্ষা হয় ও ধর্ম্মবুদ্ধির এরূপ বিকাশ হয়, যে আমাদের ধর্ম্মজীবন গঠনের বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইয়া থাকে। আমরা কখন কখনও এক প্রকার ধর্ম্মসাধন দেখিতে পাই, যাহা আমাদের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আমরা এক প্রকার ভাবুক লোক দেখিতে পাই, যাঁহারা ধর্ম্মের কথা বলিতে ও শুনিতে ভাল বাসেন; সেইরূপ আলাপে ঘন্টার পর ঘন্টা যাপন করিতে প্রস্তুত; উপাসনাদিতে বেশ অনুরাগ, ভাবের উচ্ছ্বাস ও বেশ আছে; ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিতে তাঁহারা ভাল বাসেন; কিন্তু কর্ত্তব্য-সাধনে মনোযোগ নাই। তাঁহাদের প্রতি কোনও কার্য্যের ভার দিয়া নির্ভর করিতে পারা যায় না, যে তাহা যথাসময়েও সমুচিত রূপে সম্পাদিত হইবে। একটু সামান্য কারণ উপস্থিত হইলেই তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া বিষয়ান্তরে প্রস্থান করেন। মনে কর ব্রাহ্মসমাজের খাতা পত্র রাখিবার ভার একজনের প্রতি আছে, যেই অদূরে খোলের শব্দ উঠিয়াছে, বা একজন কথা কহিবার লোক জুটিয়াছে, অমনি খাতা পত্র পড়িয়া রহিল, তিনি সেখানে গিয়া জুটিলেন। স্পষ্ট বলিতে কি আমি এরূপ চরিত্রের লোককে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করি না। কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ব্রাহ্মের ধর্ম্ম-জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ।

তৃতীয় উপাদান নরহিতৈষণা। আমাদের সমুদায় প্রীতি ও সমুদায় সেবা অল্প সংখ্যক সমবিশ্বাসী ও সমভাবাপন্ন লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে হইবে না। আমাদের প্রেমকে সমগ্র জগতে বিতরণ করিতে হইবে, ও আমাদের সেবাকে সমগ্র জগতের পরিচর্য্যাতে নিয়োগ করিতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, এরূপ উদারভাব ভাষাতে ব্যক্ত করিতে ভাল এবং শুনিতেও ভাল, কিন্তু কার্য্যে করা দুষ্কর। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার হৃদয় কিরূপ বিশাল ও প্রীতি কিরূপ উদার ছিল

তাহা সকলে একবার চিন্তা করুন। স্পেনদেশে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী স্থাপিত হইলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্ত কলিকাতায় টাউনহল-গৃহে ইউরোপীয়দিগকে ভোজ দিয়াছিলেন। ইটালীদেশবাসিগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতায় পৌছিলে, তিনি এক দিন শয্যাশায়ী ছিলেন; নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। এ কিরূপ হৃদয়ের বিশালতা ও কিরূপ প্রেম! তাঁহার সমগ্র চেষ্টা নরহিতৈষণার দ্বারা অণুপ্রাণিত ছিল। বল দেখি রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে ভাল ব্রাহ্ম ছিলেন কি আমাদের স্থায় সংকীর্ণ ও অনুদারচেতা লোক ভাল ব্রাহ্ম? তাই বলি যখন জ্ঞানালোচনা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নরহিতৈষণা এই তিনটী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মজীবনের ত্রিবিধ উপাদানের সহিত সম্মিলিত হয়, তখনি পুষ্কল ধর্ম্মজীবন গঠিত হইয়া থাকে।

জীবনের উচ্চ আদর্শ। *

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত !
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহং ॥

ভগবদ্গীতা।

অর্থ—কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যে প্রকার কর্ম্মের আচরণ করে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোক-সংগ্রহ করিবার মানসে, সেইরূপ আচরণ করিবেন।

ভগবদ্গীতাতে পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। গীতাগ্রন্থ যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, যে গীতাতে সর্ব্বত্রই দুই শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; এক শ্রেণী অজ্ঞ ও কর্ম্মে আসক্ত, অপর শ্রেণী জ্ঞানী ও কর্ম্মে অনাসক্ত। গীতার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ এই, জ্ঞানিগণও অজ্ঞদিগের ন্যায় কর্ম্মের আচরণ করিবেন; প্রভেদ এই মাত্র থাকিবে যে, জ্ঞানিগণ কর্ম্মের আচরণ করিয়াও তাহাতে অনাসক্ত থাকিবেন।

আমরা জানি গীতার এই উপদেশ অনেকের মনঃপূত নহে। আপাততঃ বোধ হইতে পারে, গীতা জ্ঞানিগণকে কপটাচরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন; যাহাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন না, যাহাকে তাঁহারা অজ্ঞ-জনোচিত মনে করেন, যাহার আচরণে তাঁহাদিগকে অসত্যের বা অন্যায়ের আচরণ করিতে হয়, গীতা জ্ঞানীদিগকে কেবল মাত্র লোক-সংগ্রহের মানসে এমন কর্ম্মেরও আচরণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় গীতার অভিপ্রায় তাহা নহে। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই গীতার সৃষ্টি। এতদ্দেশে এক শ্রেণীর জ্ঞানী দেখা দিয়া-

---

* ১৮৯৬ সাল, ২৬শে, জুলাই রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

ছিলেন, যাঁহারা সন্ন্যাসকে অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগকে ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। এখনও এই শ্রেণীর সন্ন্যাসিগণ এদেশে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা কর্ম্মের ও আশ্রম-ধর্ম্মের সমুদায় চিহ্ন ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সাধকগণ যে অসত্য, অন্যায়, বা অধর্ম্ম বোধে কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছেন তাহা নহে, জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন এই বোধেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গীতা এই শ্রেণীর সাধককে বলিতেছেন ;—কর্ম্ম তোমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও সাধারণ লোকদিগকে সন্মার্গ প্রদর্শনের জন্য ইহার আচরণ কর। এই ভাব যে ধর্ম্মজগতে সম্পূর্ণ নূতন, অথবা গীতাতেই কেবল ইহা দৃষ্ট হয়, তাহা নহে ; অন্যান্য অনেক স্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশীয় বৈষ্ণবগণের একটী বচন প্রচলিত আছে,—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" মহাত্মা চৈতন্যের সম্বন্ধে তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। চৈতন্যকে তাঁহারা পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অবতার বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে স্বয়ং ভগবানের পক্ষে ধর্ম্মসাধনের বাহিরের নিয়ম সকল পালন করা প্রয়োজনীয় না হইলেও লোক-শিক্ষার জন্য তিনি ঐ সকল নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়গণও এই প্রকার বলিয়া থাকেন যে, স্বয়ং ভগবান জগতকে পুত্রত্বের ও বাধ্যতার শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য পুত্ররূপী হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লোক-সংগ্রহই তাঁহার অবতারত্ব স্বীকারের প্রধান উদ্দেশ্য। লোক-সংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মের আচরণ, এই ভাব অপরাপর স্থলে এবং অপরাপর ভাবেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডে এরূপ অনেক ভদ্রলোক আছেন যাঁহারা লোক-সংগ্রহের উদ্দেশেই, অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই, সম্পূর্ণরূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ কোনও দিন পরিমিত পরিমাণে একটু সুরাপান করিলেই যে মহাপাতক হয়, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। অথচ এইজন্য সম্পূর্ণরূপে সুরাপান বর্জ্জন করিয়াছেন যে, তাঁহারা একটু পান করিবার রীতি রাখিলে, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে সুরাপায়ী হইয়া অতিরিক্ত মাত্রাতে গমন করে। এ যুক্তি যে সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর তাহাও বলিতে পারা যায় না।

সে যাহা হউক, আমরা গীতার পূর্ব্বোক্ত রচনটী হইতে আর এক প্রকার উপদেশ লাভ করিতে পারি। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতেছি—অজ্ঞ এবং জ্ঞানী। এই উভয় শ্রেণীর ভাব পরস্পর হইতে বিভিন্ন। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যখন যে কর্ম্মের আচরণ করে, তখন সেই কর্ম্মের অতিরিক্ত আর কিছু জানে না; তাহাদের দৃষ্টি সেই কর্ম্মরূপ প্রাচীরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে যায় না; তাহারা সেই কর্ম্মকেই পরমার্থ মনে করে; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত থাকে। জ্ঞানিগণের ভাব অন্য প্রকার; তাঁহাদের দৃষ্টি কর্ম্মের বাহিরে জ্ঞানরাজ্যে অনেক দূর প্রসারিত; তাঁহারা কর্ম্মের আচরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু কর্ম্মকে সামান্য বলিয়াই জানেন; তাঁহারা কর্ম্মকেই পরমার্থ বলিয়া মনে করেন না; তাহাতেই আবদ্ধ ও তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মে বাস করিয়াও কর্ম্মের অতীত সুদূর প্রসারিত জ্ঞানরাজ্যে বাস করিতেছেন। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্মের আচরণে অনেক প্রভেদ আছে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই উভয় প্রকার ভাবের প্রভেদ কিয়ৎ পরিমাণে বিশদ করা যাইতে পারে। মনে কর কোনও গৃহস্থের কুলবধূ কোনও পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতাতে স্বীয় পতির নিকটে থাকিবার জন্য আসিতেছেন। এক দিন রজনীযোগে তাঁহাকে সহরের বাড়ীতে আনা হইল; তিনি নৈশ অন্ধকারে সহরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এমন কি যে ভবনে আসিলেন, তাহাও ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না; পর দিন প্রাতে উঠিয়া নিজ বাস ভবনটী দেখিয়া বলিলেন—"ও বাবা! এ যে দেখি প্রকাণ্ড পাকা কোঠা বাড়ী, এ যে দেখি গ্রামের অমুক বাবুর বাড়ীর মত?" তিনি গ্রামে পর্ণ-কুটীরে বাস করিতেন এবং জন্মের মধ্যে গ্রামের একঘর ধনীর ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন ভিন্ন আর ইষ্টক-নির্ম্মিত ভবন দেখেন নাই; সুতরাং সহরের স্বীয় বাস ভবনটী দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, সেই ভবনটী সহরের একটী প্রধান ভবন ও সেই পাড়াটী সহরের একটী প্রধান স্থান। তিনি যে ভবনটীতে বাস করিতেছেন তাহা হইতে বাহিরের কিছু দেখিবার যো নাই, সুতরাং তাঁহার এই ভ্রান্তিও ঘুচিবার উপায় নাই। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক দিন তাঁহার পতি বলিলেন,—"চল তোমাকে সহর

দেখাইয়া আনি।" এই বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত দিন ঘুরিয়া সহর দেখাইয়া আনিলেন। বধূটী সহর দেখিয়া সায়ংকালে গৃহে আসিয়া বলিলেন,—"মাগো সহর এত বড়! ওমা সহরের কি ওঁচা জায়গাতে আছি, ও কি ছোট বাড়ীতেই আছি!" জিজ্ঞাসা করি, এই রমণীর পূর্ব্বভাব ও বর্ত্তমানভাবে প্রভেদ কি হইল? তিনি পূর্ব্বে যে গৃহে বাস করিতেছিলেন এখনও সেই গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে যে গৃহকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেছিলেন. এখনও তাহাই করিতে লাগিলেন, তবে প্রভেদ কোথায় রহিল? প্রভেদ রহিল জ্ঞানে; পূর্ব্বে জানিতেন তাঁহাদের ভবনটী সহরের মধ্যে একটী প্রধান ভবন, এখন জানিলেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র। পূর্ব্বে স্বীয় ভবনটীকে মহৎ জানিয়া হৃদয়ে একটু অহঙ্কার ছিল, এখন তাহাকে ক্ষুদ্র জানিয়া হৃদয়ে একটু বিনয় আসিল:—এইমাত্র প্রভেদ। গীতোক্ত অজ্ঞ ও জ্ঞানীর মধ্যে কর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ প্রভেদ। উভয়ে একই কর্ম্মের মধ্যে বাস করিতে পারেন, অথচ উভয়ের ভাব বিভিন্ন।

ভগবদ্গীতা কর্ম্মের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা সাধারণ মানবজীবন সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারি। আমরা মানবকে বলিতে পারি,—"হে মানব! তুমি এই জীবনের মধ্যে বাস কর. কিন্তু চিত্তকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রাখিও না; জীবনের মহৎ ও উচ্চ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীবনের দৈনিক সীমাকে ক্ষুদ্র জানিয়া, ইহার মধ্যে বাস কর। এই জীবনটার আদর্শ আমাদের যাঁহার মনে যে প্রকার তিনি সেই ভাবেই এ জীবনে বাস করিয়া থাকেন। অনেক মানবের মনে আহার, নিদ্রা বংশরক্ষা, সন্তান-পালন, অর্থোপার্জ্জন ও অর্থসঞ্চয় ইহার অতিরিক্ত জীবনের উচ্চতর আদর্শ নাই। ব্রাহ্মের পক্ষেও কি তাহাই? ব্রাহ্ম! তোমার মনে জীবনের যে ভাব আছে তাহা কি ইহাতেই পর্য্যবসিত? তুমি যদি খাইয়া ও ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া যাও, তাহা হইলেই কি মনে করিবে যে তোমার জীবনের সার্থকতা হইয়াছে"?

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সমক্ষে এক মহৎ ও উচ্চ আদর্শ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আমরা এই জগতের জীবনকে আমাদের জীবনের শৈশবাবস্থা

মনে করি। এ জগৎ আমাদের কর্ম্মফল ভোগের জন্ত কারাগার নয়, আন্দামান দ্বীপ নয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি; আমাদের করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা আমাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিবার জন্ত এখানে রাখিয়াছেন। তিনি এই জগতকে ও মানবজীবনকে আমাদের শিক্ষা ও উন্নতির উপযোগী এবং আমাদিগকে জগতের উপযোগী করিয়াছেন। এ জগতে থাকিয়া আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও ধর্ম্মে উন্নত হইব. এবং এ জগত হইতে যাহা পাইবার তাহা পাওয়া যখন শেষ হইবে, তখন অপর জগতে আহূত হইব ;—ইহাই আমাদের জীবনের নিয়তি। এ সম্বন্ধে জন্মের সহিত মৃত্যুর যেন সাদৃশ্ত দেখা যায়। শিশু যখন মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আমরা কি দেখি? দেখিতে পাই, মাতৃগর্ভের যাহা দিবার ছিল, তাহা যখন দেওয়া হইল, তখন যেন মাতৃগর্ভ শিশুকে বলিল,—"হে ভ্রূণ-দেহ! আমার যাহা দিবার ছিল দিয়াছি, এখন তুমি আলোকময় রাজ্যের উপযুক্ত হইয়াছ অতএব সেথানে গমন কর।" ইহারই নাম জন্ম। ঈশ্বর-ভক্ত সাধুর মৃত্যু সময়েও যেন তাহাই ঘটে। এ জগত যেন বলে—"হে সাধো! আমার যে কিছু শিক্ষা দিবার ছিল, তাহা তোমাকে দিয়াছি, এখন তুমি অপর জগতের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব সেথানে গমন কর।"

এখানে বাস করিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করাই যদি মানব-জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে খাইয়া ঘুমাইয়া, কয়েকটী সন্তান ও কয়েক হাজার টাকা রাখিয়া গেলেই তাহা সংসিদ্ধ হয় না। এ জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। জ্ঞানালোচনা দ্বারা মনকে উন্নত করা, প্রীতির দ্বারা হৃদয়কে প্রসারিত করা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধিকে সবল করা, ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ভক্তিকে উজ্জ্বল করা আমাদের অবশ্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। তাহার অকরণে আমরা প্রত্যবায়ভাগী।

জীবনের এই মহৎ ভাব যদি আমরা হৃদয়ে ধারণ না করি, তাহা হইলে অনিবার্য্য রূপে ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি। মানবাত্মার প্রকৃতি যেন মৎস্তের প্রকৃতির ন্তায়। মৎস্তকে যত প্রসারিত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দিবে, ততই

তাহার আকৃতি, বল ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইবে ; আর যতই তাহাকে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য, ও বল-বিক্রম নিঃশেষ হইয়া যাইবে। একই দিনে, একই সময়ে, একই ধীবরের নিকট হইতে একই জাতীয় মৎস্যের শিশু লইয়া দুই স্থানে ছাড়িয়া দেও—কতকগুলিকে প্রকাণ্ড জলাশয়ের প্রশস্ত জলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ কর, অপরগুলিকে একটী অল্লায়তন উদপানের মধ্যে ছাড়িয়া দেও ; তৎপরে দুই বৎসর পরে একই দিনে উক্ত উভয় স্থান হইতে মৎস্য ধর, দেখিবে উভয়ে কত প্রভেদ ! জল-কলসের মধ্যে মৎস্য জিয়ান থাকিলে যেমন কদাকার হয়, তেমনি ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তাতে, ক্ষুদ্র আদর্শের মধ্যে রাখিলে, মানবাত্মাও ক্ষুদ্রাশয় হইয়া যায়। তখন তাহার চিন্তা ক্ষুদ্র, আলাপ ক্ষুদ্র, আমোদ ক্ষুদ্র, আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, সমুদায় ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

আমাদের দৈনিক জীবনটা যে, সমগ্র জীবন নয়, তাহা স্মরণ রাখিয়া এই জীবনের মধ্যে বাস করিলে, আমরা ইহার মধ্যে অনাসক্ত ভাবে বাস করিতে পারি। মহত্তের জ্ঞান ও মহত্তের ধ্যান হৃদয়ে রাখিয়া জীবনের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বাস করিলেও মন ক্ষুদ্রতার দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না। তুমি যতক্ষণ ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিতেছ, এবং তদপেক্ষা কোনও মহত্তর বিষয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, ততক্ষণ কখনই তুমি সেই ক্ষুদ্রে আসক্ত হইতে পার না। অনাসক্ত ভাবে এ জীবনে বাস করিবার সঙ্কেত এই। জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিলে যে কেবল অনাসক্ত ভাবে জীবনে বাস করা যায় তাহা নহে জীবন-পথের অনেক পাপ প্রলোভন হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। মনকে সর্ব্বদা মহৎ ও পবিত্র বিষয়ে রত রাখাই জীবনকে পবিত্র রাখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। অতএব জীবনের উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও সাধন করা, ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন-প্রণালীর একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে।

অপরা বিদ্যা।*

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।

উপনিষদ।

অর্থ—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ, এ সকলের বিদ্যা অপরা বিদ্যা—আর সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা যদ্দারা সেই অবিনাশী পুরুষকে জানিতে পারা যায়।

যে উপনিষদ গ্রন্থ সকল এদেশে শ্রুতির মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে শ্রুতির হীনতা-বাচক পূর্ব্বোক্ত বচনটী প্রাপ্ত হওয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। ভিতরকার কথা এই, এতদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে উপনিষদ গ্রন্থগুলির একটা বিশেষ স্থান আছে। সে সময়ের সাধারণ লোকে যে সকল অসার যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিমগ্ন হইয়া পরমার্থতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহাদের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিমল ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশেই ঐ সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বিদেহাধিপতি জনক এই উপনিষদকার ঋষিগণের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। বেদোক্ত লৌকিক ক্রিয়া কলাপের অসারতা প্রতিপাদন করিবার জন্য এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল; সুতরাং এই জ্ঞানকাণ্ডীয় উপনিষদের অনেক স্থলেই ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ নামক অংশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি গার্গীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে
তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ-সহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

---

* ১৮৯৬ সাল, ১৬ই আগষ্ট রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

অর্থ—হে গার্গি! কোনও ব্যক্তি যদি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া বহু সহস্র বৎসর হোম যাগ তপস্যা প্রভৃতি করে তাহার সে সকল বিফল হয়।

উপনিষদকার ঋষিগণ সময়ে সময়ে যেমন ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন যাগ যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান-বিহীন বেদজ্ঞতার হীনতাও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা সম্বন্ধীয় বচনটী তাহার নিদর্শন স্বরূপ। কেবল যে উপনিষদেই বেদ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা-সূচক বচন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নহে, অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপ বচন পাওয়া যায়। ভগবদগীতাতে আছে :—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে,
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।

অর্থ—সমগ্র দেশ জলপ্লাবনে প্লাবিত হইলে মানুষের সামান্য উদপানে যতটুকু প্রয়োজন থাকে, তেমনি ব্রহ্মকে যিনি জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষেও সমুদায় বেদে ততটুকু প্রয়োজন।

এখানেও ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তুলনায় বেদবেদাঙ্গ-বিদ্যার নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু অপরা বিদ্যা বলিতে কেবল বেদ বেদাঙ্গের বিদ্যা বুঝিতে হইবে না। দেহতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, তর্ক প্রভৃতি সকল বিদ্যাই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। এই অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা হীন হইলেও কি ইহার প্রয়োজনীয়তা নাই? হীন বোধে কি এ সকল উপেক্ষণীয়? আমরা জানি এ দেশীয় ধর্ম্ম-সাধকদিগের অনেকে মনে করিয়া থাকেন ঈশ্বরের শ্রবণ মনন, ও তাঁহার সেবাই মানবাত্মার মুক্তির সোপান, লৌকিক জ্ঞান লাভের চেষ্টার প্রয়োজন কি? ইহাদিগকে বলা আবশ্যক যে, অপরা বিদ্যা পরা বিদ্যা হইতে নিকৃষ্ট হইলেও মানব-জীবনে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সে প্রয়োজনীয়তা কোনও লৌকিক প্রয়োজনীয়তা নহে। আমরা সকলেই জানি যে মানুষ নানা প্রকার পার্থিব ইষ্ট-সিদ্ধির বাসনাতে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকে। প্রথমতঃ অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা ধন-লাভ হইয়া থাকে; এজন্য অনেকে অপরা বিদ্যার সেবা করে। কিন্তু ইহা বিদ্যার আলোচনার

অতি নিকৃষ্ট ভাব। এভাবে যাহারা অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন, তাঁহারা সচরাচর ধন লাভের উপায় হইবামাত্র সে বিদ্যার চর্চ্চা পরিত্যাগ করেন। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমান শিক্ষিত দলের মধ্যে শত শত দেখিতে পাইতেছি। তৎপরে অপরা বিদ্যা আর এক ভাবে অনুশীলিত হইতে পারে ;—তাহা যশোলাভের জন্য। ধনাগমস্পৃহা অপেক্ষা যশঃস্পৃহা কিঞ্চিৎ উন্নত। বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিবার জন্য মানুষকে গভীররূপে জ্ঞানালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়, বিদ্যানুশীলনে ঐকান্তিক ভাবে মনোনিবেশ করিতে হয়, অনলস হইয়া সাহিত্য চর্চ্চাতে কালযাপন করিতে হয়, এবং এ শ্রমের আর অবসান হয় না। ইহাও মানবাত্মার পক্ষে ভাল। তৃতীয়তঃ মানুষ সুখের জন্য অপরা বিদ্যার চর্চ্চা করিতে পারে। সে সুখ দুই প্রকার, প্রথম কৌতুহল বৃত্তির চরিতার্থতা জনিত সুখ, দ্বিতীয় মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। এ জগতে অনেক ব্যক্তি কেবলমাত্র কৌতুহল বৃত্তির চরিতার্থতার জন্য বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন। নূতন নূতন বিষয় জানিলে, মনে চমৎকারিত্ব-প্রসূত এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হয়, অনেক বিদ্বান ব্যক্তি সেই আনন্দের লোভেই অপরা বিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয়ে ইহার অধিক আর কোনও উচ্চতর ভাব নাই। কিন্তু এই ভাব অপর দুই ভাব হইতে উৎকৃষ্টতর হইলেও ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে।

বিদ্যার অনুশীলনে আর এক প্রকার সুখ আছে, মানসিক বৃত্তি ও শক্তি নিচয়ের চালনা-জনিত সুখ। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন, তাহাদিগের চালনা করিলেই আমাদের চিত্তে এক প্রকার সুখোদয় হইয়া থাকে। তাহাদের রক্ষা ও বিকাশের জন্য চালনার প্রয়োজন, এই জন্য বোধ হয় মঙ্গলময় বিধাতা তাহাদের চালনার সঙ্গে সুখের যোগ করিয়া দিয়াছেন। শীত কালের প্রাতঃকালে অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, কুক্কুরগণ অকারণ দৌড়িতেছে। দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও অপর পশুর পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছে, বা কোনও আসন্ন বিপদ ভয়ে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু তাহা নহে, তাহারা দৌড়িবার জন্যই দৌড়িতেছে। ইহার কারণ এই, দ্রুতবেগে ধাবিত হইলে

তাহাদের অঙ্গ সকলের চালনা জনিত যে সুখ হয়, সেই সুখের লোভেই তাহারা ঐ প্রকার করিয়া থাকে। অঙ্গ সকলের চালনাতেই এক প্রকার সুখ আছে। তুমি যদি দশদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিমল বায়ুতে সঞ্চরণ কর, একাদশ দিবসে তোমার চিত্ত স্বতঃই সেই সুখ ভোগ করিতে চাহিবে। আমাদের প্রকৃতির গূঢ় সুখ-প্রিয়তা এই প্রকার! ইহার আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদের আর বিশ্রাম নাই। হস্তপদগুলি নিরন্তর চলিতেছে। যদি বাধা দেও, যদি ক্ষণকালের জন্য তাহাদের গতিরোধ কর, তখনি দেখিবে শিশুগুলি ক্রন্দন করিয়া উঠিবে। ক্রন্দন করে কেন? সুখের ব্যাঘাত না হইলে কি ক্রন্দন করে? তাহাদের সেই হস্ত পদের সঞ্চালন এতই সুখজনক যে তাহার অভাবে মহাক্লেশ উপস্থিত হয়। এইরূপ মানসিক বৃত্তি নিচয়ের চালনাতেও এক প্রকার সুখ আছে। সেই সুখটুকুর লোভেই অনেকে অপরা বিদ্যার আলোচনাতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

আমি অপরা বিদ্যার যে প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছি তাহা এ প্রকার নহে। পরা বিদ্যার পোষকতা করিবার জন্যই অপরা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। যেমন শাখানদী সকল মহানদীতে পতিত হইয়া তাহার কলেবর বৃদ্ধি করে, এবং মহানদীর সহিত একীভূত হইয়া মহাসমুদ্রে গমন করে, তেমনি অপরা বিদ্যা সকল পরাবিদ্যাতে সম্মিলিত হইয়া তাহার আয়তন ও বল বৃদ্ধি করে, এবং চরমে মানবকে সেই পূর্ণ পরাৎপর পরম পুরুষের চরণে উপনীত করে। তাঁহাকে লাভ করাই যখন মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, তখন তাহাকে লাভ করা মানবের সকল বিদ্যারও উদ্দেশ্য। অপরা বিদ্যাতেও আমাদের ধর্ম্মজীবনের ও ব্রহ্মসাধনের কিরূপ সহায়তা করিতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময়ে বিস্মৃত হইয়া যাই। কিন্তু নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অপরা বিদ্যার প্রকৃত অনুশীলন দ্বারা মানব-চরিত্র ব্রাহ্মসাধন ও ব্রহ্মলাভের উপযোগী হয়।

প্রথমতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা অনেক সময়ে মানব-চরিত্রে অনাসক্তি উৎপাদন করে। একাগ্রচিত্তে জ্ঞানের উপকরণীভূত বিবিধ বিষয়ে মনোনিবেশ

করিতে হইলেই মানুষকে দৈনিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ হইতে একটু দূরে দাঁড়াইতে ও তাহাদের একটু উপরে উঠিতে হয়। মহাতত্ত্ব সকলের আলোচনাতে মন নিযুক্ত থাকিলে, মন আর ক্ষুদ্র বিষয়ে আবদ্ধ হয় না। এই জন্যই দেখা যায় যে জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ অনেক ক্ষুদ্র বিষয়ের অতীত। তাঁহারা সে সকলের মধ্যে বাস করিয়া ও তাহাতে বাস করেন না।

দ্বিতীয়তঃ—অপরা বিদ্যাতে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে, প্রবৃত্তি সকলকে সংযত করিতে হয়। উদ্দাম প্রবৃত্তিকুলকে অসংযত রাখিয়া কেহই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। গভীর তত্ত্বান্বেষণের পক্ষে চিত্তের স্থিরতার নিতান্ত প্রয়োজন। এমন কি পদার্থ বিদ্যাতে যে সকল পরীক্ষা ও প্রক্রিয়ার বিধি আছে, তাহা সমুচিতরূপে সম্পাদন করিতে হইলে চিত্তের স্থিরতা, দৃষ্টির স্থিরতা ও স্নায়ুমণ্ডলের স্থিরতা একান্ত প্রয়োজনীয়। অসংযত ও প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র ব্যক্তি কি কখনও সেই স্থিরতা লাভ করিতে পারে? অতএব একাগ্রচিত্তে অপরা বিদ্যা অনুশীলন করিতে গেলেও ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ—অপরা বিদ্যার অনুশীলনের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে, মানুষের চিন্তা-শক্তির উন্মেষ হয় ও আত্ম-দৃষ্টি জাগে। চিন্তাশক্তির উন্মেষ একবার হইলে, সে শক্তি আর কেবলমাত্র বাহিরের পার্থিব বিষয়ে আবদ্ধ থাকে না; আধ্যাত্মিক রাজ্যেও প্রসারিত হয়। সেই চিন্তাশক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তনে এবং জগত ও আত্মার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচারে নিযুক্ত হয়।

চতুর্থতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা হৃদয় মনের প্রশস্ততা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জগতের কিছু না জানিলে মানুষ স্বভাবতঃই আপনার যাহা আছে, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে থাকে। যতই জগতের সহিত পরিচয় বৃদ্ধি হয়, ইতিবৃত্ত আলোচনা দ্বারা মানবসমাজের উন্নতি ও অবনতির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতে থাকে, ততই মানুষের মন উদার হইতে থাকে; ততই মানুষ মনে করে আমি আজ যেরূপ ভাবিতেছি এরূপ আর কত শত শত ব্যক্তি ভাবিয়াছে, আমি যাহাকে অকস্মাৎ উৎপন্ন মনে করিতেছি

তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই জন্মিয়াছে, আমি যে তত্ত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছি শত শত ব্যক্তি সেই তত্ত্বকে ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, এই তুলনার বিচার দ্বারা মানব-চিত্ত উদারতা লাভ করিয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ—প্রকৃত ভাবে অপরা বিদ্যার আলোচনা করিলে মানব-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিনয়ের সঞ্চার হয়। বিদ্যার সহিত বিনয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। সংস্কৃত নীতি শাস্ত্রে বলিয়াছে—"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—বিদ্যা বিনয়কে দান করে। যদিও অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে অপরা বিদ্যা বিনয়কে প্রসব না করিয়া অহমিকাকেই প্রসব করিতেছে, তথাপি বিদ্যার সহিত বিনয়ের যে গূঢ়যোগ আছে, তাহা সুনিশ্চিত। প্রকৃত বিদ্যা যেখানে আছে, সুগভীর তত্ত্বান্বেষণ যেখানে আছে, সেই খানেই মানবের নিজের অজ্ঞতা-জ্ঞান সমুজ্জ্বল। কি পদার্থতত্ত্ব কি অধ্যাত্মতত্ত্ব যে রাজ্যেই মানব মন গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে, সেই বিভাগেই দুরবগাহ সমস্যা সকলের মধ্যে পতিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, যে এ ব্রহ্মাণ্ডে মানব ঘোর অজ্ঞতাতে জড়িত। মানব এজগতে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় যবনিকার অন্তরালে বসিয়া আছে। সেই যবনিকা ভেদ করিয়া যে দুই এক রশ্মি আলোক আসিতেছে, তাহাতেই আপনাকে ও আপনার পিঞ্জরকে কিঞ্চিন্মাত্র দেখিতে পাইতেছে, এইমাত্র। এরূপ অবস্থাতে মানব-মনে বিনয়ই শোভা পায়।

ষষ্ঠতঃ—অপরা বিদ্যার আলোচনা দ্বারা আমাদের চিত্তে ঈশ্বরের মহিমার জ্ঞান উদ্দীপ্ত হয়। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও বিভাগে আমরা দৃষ্টিপাত করিনা কেন, সকল বিভাগেই সেই জ্ঞানময় পুরুষের অপার জ্ঞানের লীলা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং অপরা বিদ্যা যে বিভাগেই গমন করুক না কেন, বিনীত ও প্রেমিক ব্যক্তির চক্ষে সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

অতএব আমরা দেখিতেছি, অপরা বিদ্যা অনাসক্তিকে উৎপন্ন করে, ইন্দ্রিয়সংযমে অভ্যস্ত করে, চিন্তাশক্তির উন্মেষ করে, আত্মদৃষ্টিকে জাগরূক করে, দীনতাকে উৎপন্ন করে, ও চিত্তে ঈশ্বরের মহিমা জ্ঞানকে উদ্দীপ্ত

করিয়া দেয়। জিজ্ঞাসা করি, এ সকল কি আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায় নহে? অপরা বিদ্যার আলোচনাকে ধর্ম্মসাধনের অঙ্গ-স্বরূপ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং। *

ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং।

অর্থ—ধর্ম্মই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকে।

উপরোক্ত উক্তিটী আমাদের দেশে সুপ্রচলিত। ক্ষুদ্র ও মহৎ, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও রমণী প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়,—"একজন ধর্ম্ম আছেন ত, তিনিই রক্ষা করেন।" কিন্তু এ কথার প্রকৃত অর্থ কি?

চীন দেশীয় মহাপুরুষ কংফুচকে একবার তথাকার কোনও এক রাজা প্রশ্ন করিলেন,—"হে সুধী-শ্রেষ্ঠ! রাজকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য ও প্রজা মণ্ডলীকে সুশাসনে রক্ষা করিবার জন্য সময়ে সময়ে দুষ্ট প্রজাদিগকে অথবা রাজ্যের শত্রুদিগকে হত্যা করা কি আবশ্যক নয়?" মহামতি কংফুচ উত্তর করিলেন,—"হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মের এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন হইয়া ন্যায়পরায়ণতার সহিত স্বীয় রাজকার্য্য সম্পাদন করুন, তাহা হইলে রাজ্য সুশাসনে রাখিবার জন্য আপনাকে কাহাকেও হত্যা করিতে হইবে না এবং দেখিবেন বায়ু প্রবাহিত হইলে ক্ষেত্রের শস্য সকল যেমন তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে, তদ্রূপ আপনার প্রজাগণও আপনার সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে। কংফুচের বক্তব্য এই ছিল যে মানব-হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্মের শাসনাধীন। মানব-হৃদয়কে শাসনে রাখিবার জন্য ধর্ম্মাস্ত্রের ন্যায় অস্ত্র আর নাই। যে অকপটচিত্তে এজগতে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া চলিতে পারে সে নিরাপদ। ইতিবৃত্তে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরাজ ও স্পেনীয় প্রভৃতি ইউরোপবাসী শ্বেতকায় খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ যখন সর্ব্বপ্রথমে দেশে গিয়া নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেন, সে সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই? এই সকল জাতি

* ১৮৯৬ সাল, ১৬ইআগষ্ট রবিবার, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

সেখানে গিয়াই শারীরিক বলের দ্বারা, অত্যাচার ও উৎপীড়নের দ্বারা, তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; রণে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগের ভূ-সম্পত্তি সকল হরণ করিলেন এবং পশুযূথের ন্যায় দলে দলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তখন সেই সকল অত্যাচরিত অধিবাসীগণ কি করিল? তাহারা স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া বনে বনে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঐ সকল শ্বেতকায় জেতাদের প্রতি বিবিধ প্রকারে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিল। সুযোগ পাইলেই কোনও না কোনও প্রকারে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের রমণীদিগকে পথে ঘাটে পাইলে, হরণ করিয়া লইয়া যাইত; অথবা দস্যুতা করিয়া ইহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ঐ সকল বিজিত লোকের উপদ্রবে ইহাঁরা সুস্থির হইয়া বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু উইলিয়ম পেন নামক সুবিখ্যাত কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী পুরুষ যখন সেখানে গিয়া সৌজন্য সদ্ভাব ও ন্যায়পরতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন তখন সেই সকল আদিম অধিবাসীই তাঁহার বশীভূত হইল। এমন কি পেনকে তাহারা দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের সহিত যে সন্ধিপত্র করিয়াছিলেন তাহা তাহারা কখনও ভঙ্গ করে নাই। তরবার যাহা করিতে পারে নাই, ধর্ম্ম ও সাধুতা তাহা করিয়াছিল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি কংফুচের কথা অতীব সত্য,—"বায়ুর গতির অগ্রে যেমন ক্ষেত্রের শস্য মস্তক অবনত করে, ধার্ম্মিক রাজার সম্মুখে সেইরূপ প্রজা সকল ও মস্তক অবনত করে।" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা এই উক্তিকে আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। তাহা এই। এজগতে আমরা দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহারা পার্থিব ও পাশব বলের উপরে অধিক নির্ভর করে; তাহারা ধন বল, জন বল ও বুদ্ধিবলের উপরে নির্ভর করিয়া জগতে চলিতে চায়; তাহাদের দৃষ্টি ধনের উপরে, সহায় সম্বলের উপরে এবং আপনাদের বুদ্ধির উপরে। কাহারও সহিত যদি বিবাদ আরম্ভ হয় তখন তাহারা মনে করে,—"আমার এত টাকা আছে, আমি এত বড় ধনী, অমুক ব্যক্তি আমার

সহিত বিবাদ করিয়া বাঁচিবে? আবার কেহ বা আপনার প্রখর মেধার উপরে নির্ভর করিয়া তাহার বিপক্ষ ব্যক্তিকে শাসাইয়া বলে,—"কি হে বাপু! আমার সহিত শত্রুতা করিয়া তুমি তিষ্ঠিবে? আমার বুদ্ধির সম্মুখে, আমার চক্রান্তের নিকটে তুমি দাঁড়াইবে?" কোনও দেশেই কোনও সমাজই এই লোকের অপ্রতুল নাই। এই সকল লোক মূর্খের শেষ; ইহারাই প্রকৃত ছোট লোক। ধর্ম্মের উপরে বিশ্বাস রাখিবার শক্তি ইহাদের হয় না।

যাঁহারা বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে যীশুর মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্য ষ্টিফেন যখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন য়িহুদীগণ ইষ্টক ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তাহারা পাশব বলের দ্বারা ধার্ম্মিকের ধর্ম্মবিশ্বাসকে নষ্ট করিতে চাহিল। কিন্তু কালে ষ্টিফেনেরই মত জগতে প্রবল হইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন তখন তিনি 'ব্রহ্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। তখন ইহার সভ্য সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কলিকাতার ধনিগণ সকলে একত্র হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভাকে বিনাশ করিবার জন্য 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ ধনী এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা চাঁদা করিয়া প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই সভা হইতে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল রাম-মোহন রায়ের কুৎসা এবং নিন্দা বাহির হইত। আমি রাজার সম-সাময়িক কোনও এক জন বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে এই ধর্ম্ম সভার অধিবেশনের দিন এক মাইল রাস্তা ব্যাপিয়া ইহাদের গাড়ী দাঁড়াইত এবং সভা ভঙ্গ হইলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সকলে বলাবলি করিতেন, "স্ত্রীলোকেরা যেমন অঙ্গুলির দ্বারা চাপ দিয়া পুঁটিমাছের পোঁটা বাহির করে, আমরাও সেইরূপ করিয়া রামমোহন রায়ের সভার পোঁটা বাহির করিব।" আপনাদের ধন বল; জন বলের প্রতি তাঁহাদের প্রধান নির্ভর ছিল কিন্তু পরিণামে কি হইল? তিনি ত তাঁহার সভাকে তদবস্থায় রাখিয়া বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার সভা ত এক প্রকার

উঠিয়াই গিয়াছিল! কিন্তু এখন কি দাঁড়াইয়াছে? এখন সেই পুঁটি মাছের পেঁটাতে কাঁটা জন্মিয়া লোকের হৃদয়ে বিদ্ধ হইতেছে। মূর্খেরা মনে করে, পার্থিব ও পাশব বলের দ্বারা, কুৎসা ও গ্লানি রটনা দ্বারা ধর্ম্মকে নষ্ট করা যায়। জগতের ইতিবৃত্তে সত্যের পরাজয় কি কখনও হইয়াছে? বিষ প্রয়োগে সক্রেটিসের প্রাণ গেল; কিন্তু সক্রেটিসের কি মৃত্যু হইয়াছে? তিনি "Father of Eastern Philosophy" হইয়া চিরদিনই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নিষ্ঠুর আচরণে লোক যীশুর প্রাণবধ করিল, কিন্তু তিনি চিরদিনই অমর হইয়া জগতে বাস করিতেছেন। আজ রুশিয়ার সম্রাটের মস্তক "প্রভু, প্রভু" বলিয়া সেই সূত্রধর তনয়ের চরণে লুণ্ঠিত হইতেছে। জগতের মূর্খ ব্যক্তিরা ধন, মান, পাশব অত্যাচার, নিপীড়ন এই সকলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা, সাধুরা ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করেন। তাঁহারা তুলাদণ্ডের এক দিকে বিন্দু পরিমাণ সত্যকে এবং অপর দিকে জগতের প্রভূত পার্থিব সম্পদ রাখিয়া দেখিয়াছেন, ধর্ম্মই ভারী হইয়াছে। একটী সর্ষপ পরিমাণ ধর্ম্মের তুলনায় হিমালয় সমান পার্থিব সম্পদকে তাঁহারা অতি সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোনও প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থের অভাব হয় না। এপৃথিবীতে বাস করিবার জন্য মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকল তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। মানুষ আপনা হইতেই সে সকল সাধুদিগকে প্রদান করে। ধর্ম্মের যে পোষাকটা, তাহার যে খোসাটা, তাহার যে নকলটা, তাহারই জগতে কত আদর! কত সম্মান! প্রকৃত ধর্ম্ম ও প্রকৃত ধার্ম্মিক পাইলে ত, কথাই নাই। আমার সহিত চল, উভয়ে গৈরিক বসন পরিধানে বাহির হই, একটী পয়সা সঙ্গে লইতে হইবে না, অথচ সমুদয় ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিব। উত্তম আহার করিবে, উত্তম স্থানে বাস করিবে, অবশেষে হৃষ্ট পুষ্ট দেহ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ধর্ম্মের পরিচ্ছদেরও এত আদর! এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী অতি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। একবার একজন নবাব মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, যদি কোনও সাঁচ্চা অর্থাৎ আসল ফকির পান, তবে তাহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন। এমন

ফকির দেখিয়া বিবাহ দিবেন যাহার আর জগতে কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই এবং এক কপর্দ্দক সম্বল নাই। তখন নবাব খাঁটি ফকির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদি শুনিতে পান যে, তাঁহার রাজ্যের নিকটে কোনও ফকির আসিয়াছে, অমনি তাঁহার নিকটে নানাপ্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। যাহার কিঞ্চিৎ লালসা দেখেন তাহাকেই নকল ফকির বলিয়া পরিত্যাগ করেন। এইরূপে অনেক দিন গেল, মনের মত ফকির পাইলেন না। অবশেষে অপর কোনও দেশের নবাবের এক পুত্র কোনও প্রকারে সেই কন্যার গুণের কথা শুনিয়া বা রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "যেরূপে পারি, এই কন্যাকেই বিবাহ করিতে হইবে।" এক দিন সেই যুবক নবাবের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আমি অমুক নবাবের পুত্র; আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া যদি উঁহাকে আমার সহিত বিবাহ দেন, তবে আমি পরম উপকৃত হই।" তখন নবাব উত্তর করিলেন, "আমি সাঁচ্চা ফকির দেখিয়া আমার কন্যার বিবাহ দিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।" তখন সেই যুবক নিরাশ অন্তরে গৃহে ফিরিয়া গেল এবং ফকি-রের বেশ পরিধান করিয়া ফকির সাজিল। এক বৎসর অতীত হইলে ফকির বেশধারী সেই যুবক আসিয়া নবাবের রাজ্যের সন্নিকটে একস্থানে বাস করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া নবাবকে সংবাদ দিল যে আর একজন ফকির আসিয়াছে। নবাব প্রথমতঃ তাহার নিকটে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। ফকির দূতকে বলিলেন, "সে কি? আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার উপঢৌকনের প্রয়োজন কি?" এই বলিয়া তাহা ফিরা-ইয়া দিলেন। পুনরায় নবাব তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজভবনে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ফকির বলিলেন, "এ প্রস্তাব ত মন্দ নয়? কত লোক আমার নিকট নিত্য আসিতেছে, আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার রাজভবনে গিয়া বসিয়া থাকি। নবাব সাহেবের প্রয়োজন হয় ত এখানে আসুন। আমার যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া নবাব ভাবিলেন এইবারে যথার্থ সাঁচ্চা ফকির পাইয়াছি, ইহারই সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ওদিকে সেই ফকিরের হৃদয়ে ঘোর

পরিবর্ত্তন উপস্থিত। তিনি ভাবিলেন,—"যে জিনিসের পোষাকের এত মূল্য, যাহার ছালের দাম এত, তাহার ভিতরটার না জানি কেমন! আমি ধর্ম্মের নামে কপটতা করিতেছি, তাহাতেই লোকে আমাকে এত সম্মান করিতেছে, আসল ধর্ম্ম তবে না জানি কেমন! আমাকে সেই আসল বস্তু লাভ করিতে হইবে।" তৎপরে যখন নবাব স্বয়ং ফকিরের কুটীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে সাধো! আপনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন।" তখন ফকির বলিলেন,—"মহা-রাজ! আমি অমুক দেশের নবাবের পুত্র। এক বৎসর পূর্ব্বে আমিই আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, তখন আপনি বলিয়াছিলেন যে, সাঁচ্চা ফকির পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন। আপনার কন্যাকে লাভ করিবার জন্যই আমি এই সকল প্রতারণা করি-য়াছি। এক্ষণে আমার অন্তরে এই প্রতিজ্ঞার উদয় হইয়াছে, "যাহার নকলের এত সম্মান, তাহার আসল কি প্রকার তাহা আমি দেখিব। আর আপনার কন্যাকে পাইবার ইচ্ছা নাই।" এই বলিয়া ফকির চলিয়া গেলেন। বাস্তবিক ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্মান সর্ব্বত্র, সে ব্যক্তির কোনও প্রকার পদার্থের অভাব হয় না। যীশু বলিয়াছেন,—"শৃগাল কুকুরের শয়ন করিবার গর্ত্ত আছে; আকাশের পক্ষিগণের থাকিবার স্থান আছে; আমার মাথা রাখিবার স্থান নাই।" অথচ তিনি ইচ্ছামাত্র অনায়াসে দুই হাজার লোককে আহার করাইতে পারিতেন। এ দেশে একটী কথা প্রচলিত আছে, "সাধু সাপের ন্যায়; ইঁদুর গর্ত্ত করে, সাপ তাহাতে বাস করে; তেমনি বিষয়ী লোক বিষয় করে, সাধুরা তাহা ভোগ করেন।"

চতুর্থতঃ এই উক্তির আর এক ভাব এই যে, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহাকে যতই উৎপীড়ন করুক না কেন, তিনি তদ্দারা আপনার হৃদয়কে কলুষিত হইতে দেন না। তিনি দৃঢ়রূপে ধর্ম্মের পথে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ত্তব্য সকল পালন করেন। অবশ্য একথা সত্য যে তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, এবং লোকে তাঁহাকে নির্যাতন করে; কিন্তু তিনি নিজে বিদ্বেষ-বুদ্ধির অতীত হইয়া বাস করেন।

লোকের উৎপীড়নে, লোকের বিদ্বেষে তিনি প্রতিহিংসা-পরবশ হন না। তাঁহার মন ঠিক জলের ন্যায়; জলে যেমন যতই আঘাত কর, তাহাতে দাগ পড়ে না, তাঁহার মনেও সেইরূপ লোকের হিংসা বিদ্বেষের দাগ পড়ে না। বরং তিনি তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করেন।

পঞ্চমতঃ এই উক্তির সর্ব্ব শেষ ভাব এই যে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি চাতুরীর হস্ত হইতে রক্ষা পান। লোকে তাঁহার বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, তিনি তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য কোনও প্রকার অসাধু উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন না। তিনি বাঁকা পথ ভুলিয়া গিয়া সরলভাবে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন। অসাধু লোক মিথ্যার উপরে মিথ্যা, তদুপরি মিথ্যা এইরূপে ক্রমাগত মিথ্যার জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে গুটি-পোকার ন্যায়, মিথ্যার জালে জড়াইয়া মারা পড়ে; সাধু ব্যক্তি সত্যপথ ধরিয়া চলিয়া অনায়াসে আপন কার্য্য উদ্ধার করিয়া লন।"

এইরূপে চিন্তা করিলে এই উক্তির আরও অনেক প্রকার ভাব বাহির করা যায়। আমাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। আমাদিগকে বিদ্বেষ, হিংসা, চতুরতা, কপটতা এ সকলের অতীত হইয়া বাস করিতে হইবে। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে স্থির থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিব, তাহার জন্য নিন্দা প্রশংসা, সম্পদ, বিপদ সকলই অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ঈশ্বরের আদেশের নিকটে অপর সকলই উপেক্ষা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগকে এই ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। যখন কেহ একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করে, তখন সে ব্যক্তি কি করে? সে ব্যক্তি হয় ত আট মাস কি দশ মাস ধরিয়া দিবানিশি চিন্তা করিয়া একটী পরামর্শ স্থির করিল এবং তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিল। যখন তাঁহার বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, তখন কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"এ ঘরটা এখানে না হইলে ভাল হইত। কেহ বলিল,—"প্রাঙ্গণটা এখানে না করিয়া একটু দূরে করিলে ভাল হইত।" আবার কেহ বা বলিল,—"না, না, ঠিক হইতেছে।" এইরূপে কত লোকে কত কথাই বলিতে লাগিল; কিন্তু ছয় মাস পরে যখন সম্পূর্ণ বাড়ীটা প্রস্তুত হইল, তখন লোকে বলিতে লাগিল,—ওঃ আপনার মনে এই পরামর্শটা ছিল, এত বেশ হইয়াছে।"

তখন লোকে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। আমাদিগকেও এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে হইবে। এখন আমাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময়। এক্ষণে লোকের নিন্দা ও প্রশংসা উভয়কেই উপেক্ষাবুদ্ধির সহিত দেখিতে হইবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা এই ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর। তোমরা লোকের মুখের প্রতি তাকাইও না। প্রভু পরমেশ্বরের মহান্ আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। তাহাতে যে প্রশংসা করে করুক, যে নিন্দা করে করুক। যে যায় যাক্, যে থাকে থাক; শুনে চলি তোমারি ডাক” এইটী ব্রাহ্মদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। এইটী ব্রাহ্মদের কবচ। হে ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা এই ধর্ম্মকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিতে পার, তবেই তোমরা জীবনের স্থিরভূমি প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বর করুন, যেন আমরা এই ভাবে তাঁহার মহান্ ধর্ম্ম পালন করিতে পারি।